লোকপ্রশাসন সাময়িকী

প্রথম বর্ষ ১ম সংখ্যা কার্তিক ১৩৯৭

সম্পাদনা পর্ষদ

সদস্যঃ

মুহম্মদ আব্দুস সালাম

আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া

ডঃ মোহাম্মদ তারেক

সৈয়দ নকীব মুসলিম

কংকা জামিল খান

সম্পাদকঃ

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

সহযোগী সম্পাদক ঃ

মোঃ ইমামুল হক

সম্পাদকীয়

'লোক প্রশাসন সাময়িকী' (কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক মুখপত্র) প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হোল। লোক প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে প্রবন্ধ আলোচনা, মতামত, বিতর্ক ও সংবাদ—সাময়িকীতে উপস্থাপিত হবে। সংশ্লিষ্ট সকল মহলের কাছ থেকে লেখা আহবান করা হচ্ছে। নবীন প্রবীন সকলের লেখা সমাদৃত হবে। কাগজের এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত লেখা সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।

সাময়িকীর প্রথম সংখ্যার আত্মপ্রকাশের প্রাক্কালে আমাদের আশা—হয়তো এই সাময়িকী দেশে গণমুখী প্রশাসন বিনির্মাণের মাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠবে।

— **সম্পাদক**

লোক প্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক মুখপত্র

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৯৭ বাংলা

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোক প্রশাসন সাময়িকী, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন–কার্তিক, ১৩৯৭
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
© ১৩৯৭ বাং

পিএটিসিঃ প্রকা– ৩০/বাজা–৪/৯০
বিপিএটিসি গ্রন্থাগারঃ ৩৫১·০০০৫

প্রকাশনায়ঃ
মোঃ ইমামুল হক
প্রকাশনা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
সাভার, ঢাকা।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

মুদ্রণেঃ
ভূইয়া গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
১৯২, ফকিরাপুল, ঢাকা–১০০০।

বিনিময়ঃ
পনর টাকা

সূচীপত্র

ডঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান
সবার জন্য প্রশিক্ষণ ৫
ডঃ ইকরামুল আহসান
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম ১৭
কব্দকা জামিল খান
উন্নয়ন প্রশাসনের লক্ষ্য ও পন্থা ৩০
এস, এম, আলী আক্কাস
বাংলাদেশের কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসে বাণিজ্যনীতির ভূমিকা ৪৫
ডঃ মোহাম্মদ তারেক
অর্থনীতি, উৎপাদন ও জাতীয় আয় ৫৮
হীরালাল বালা
অফিস ব্যবস্থাপনাঃ পত্রাদি লেখার পদ্ধতি ৮২
সৈয়দ শামসুল আলম
বংলাদেশের মৎস্য সম্পদ ৯৭
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
ক্রমবর্ধমান প্রশিক্ষণ চাহিদার প্রেক্ষাপটে
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমিকা ১২৪
আ, ক, ম মাহবুবুজ্জামান
বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণা ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের সমস্যা ১৩৭
এ, জেড, এম, শফিকুল আলম, মোহাম্মদ আলী, ডঃ মোহাম্মদ তারেক, ডঃ এম এ, জলিল, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মীর ওবায়দুর রহমান, মোঃ মোজাম্মেল হক, মোহাম্মদ হোসেন, আব্দুস সালাম
কেন্দ্র পরিক্রমা–১ ১৪৫

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
এস, এম, আলী আক্কাস
কেন্দ্র পরিক্রমা –২ ১৮৯

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

সবার জন্য প্রশিক্ষণ

—ডঃ মোহাম্মাদ আনিসুজ্জামান

প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাঃ

প্রশিক্ষণকে সাধারণতঃ সংকীর্ণ অর্থে এবং শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ হচ্ছে অল্প সময়ে কোন কাজ সম্মন্ধে মোটামুটি জ্ঞান/দক্ষতা অর্জন ও তার পরপরই উক্ত জ্ঞান/দক্ষতাকে কাজে লাগানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা। পক্ষান্তরে—শিক্ষা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডিগ্রী নির্ভর ও ক্ষেত্রবিশেষে জীবনব্যাপী সাধনা। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার বর্তমান কাজে আরো একটু বেশী দক্ষ করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধারণতঃ ছাত্র–ছাত্রীদের কর্মময় জীবনের জন্য উপযোগী করে তুলতে সহায়তা করা। অতএব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মূলতঃ একই মুদ্রার এপিঠ—ওপিঠ। পার্থক্য শুধু সময়ের, পদ্ধতির ও গুরুত্বের। শিক্ষার কেন্দ্র মূলতঃ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রশিক্ষণের কেন্দ্র সাধারণতঃ বিশেষ ধরণের ইনষ্টিটিউট, একাডেমী, সেন্টার। শিক্ষাকেন্দ্রগুলি নির্দিষ্ট বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরীক্ষা পাশের ভিত্তিতে ডিগ্রী প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি নির্দিষ্ট মাস/সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ছোটখাট পরীক্ষা অথবা পরীক্ষা ব্যতিরেকে সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমা প্রদান করেন। শিক্ষা মূলতঃ কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বে দেওয়া হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মজীবনে প্রবেশ করার পরে এবং কর্মরত অবস্থায় বিভিন্ন সময়ে দেওয়া হয়। সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সমান্তরালভাবে চলে। শিক্ষা/প্রশিক্ষণ ছাড়া সাধারণতঃ কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয় না। এ অবস্থার ভিত্তি বোধকরি আধুনিক বিজ্ঞান/ প্রযুক্তির যুগে যে কোন কর্মসম্পাদনে কর্মসংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের অপরিহার্যতা। বিশ্বব্যাপী এই ব্যবস্থাই চলছে। এর ব্যতিক্রম চোখে পড়ে না।

বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারী পর্যায়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উভয় সেবাই প্রদান করা হচ্ছে। প্রথমটি ছাত্র ছাত্রীদের কর্মজীবনের জন্য তৈরী করতে লাগছে। দ্বিতীয়টি সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। সাথে সাথে বেসরকারী খাতেও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে। তবে বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যে হারে সরকারীকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে বেসরকারী খাতে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু থাকবে বলে মনে হয় না। এতে সরকারের শিক্ষা/প্রশিক্ষণের

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

দায়-দায়িত্ব আরো বাড়ছে। সরকারের সকল প্রচেষ্টা স্বত্বেও আমরা শিক্ষিতের হার পাচ্ছি বর্তমানে ৩৩%। সরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো শতচেষ্টা করেও সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দিতে পারছেন না।

এ প্রসংগে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)-এর কথা প্রাসংগিকভাবে এসে পড়ে। বিপিএটিসি ও অন্যান্য সরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পার্থক্য মূলতঃ চারিত্রিক। বিপিএটিসি প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে অর্থাৎ বিসিএস ক্যাডারের সকলকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দান করেন। যে দায়িত্ব অন্যান্য প্রশিক্ষন কেন্দ্রের নাই। এ ছাড়াও বিপিএটিসি মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এই তিনটি প্রধান প্রশিক্ষণ কার্য ছাড়াও বিপিএটিসি মাঠ পর্যায়, স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ও বেসরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তবে শেষোক্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা প্রথম তিন শ্রেণীর তুলনায় বেশ কম। মুলতঃ বিপিএটিসি অফিসার পর্যায়ে ও আরপিএটিসি গুলি (বিভাগীয় পর্যায়ে ৪টি আরপিএটিসি) কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দান করে আসছে। ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পিএটিসি ৬০২৫ জন সরকারী কর্মকর্তা ও আরপিএটিসিগুলি ১৮,৬৪৯ জন সরকারী কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দান করছে। বাংলাদেশে সরকারী কর্মকর্তা ১,১৮,৫১৭ জন ও কর্মচারী ১১,০৭,২৬৭ জন। মোট সংখ্যা ১২,২৫,৭৮৪ জন। অতএব এইভাবে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দিতে বিপিএটিসি/ আরপিএটিসির সময় লাগবে প্রায় ৩০০ বৎসর। তবু শেষ হবে না, কারণ ততদিনে কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা আরও বাড়বে। যেমন বাড়বে জনসংখ্যা ও অন্যান্য সমস্যা এবং তার ফলে সরকারের দায়-দায়িত্ব ও কর্মসূচী। তাই এখন সময় এসেছে প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে মৌলিকভাবে চিন্তা করার। সকল সরকারী কর্মকর্তা ও সকল সরকারী কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দিতে হলে বিপিএটিসি/ আরপিএটিসির ভূমিকা কি হওয়া উচিৎ? দ্বিতীয়তঃ, যদি প্রশিক্ষণকে শুধুমাত্র সরকারী কর্মকর্তা/সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সীমিত না রেখে জনগণের মধ্যে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তা হলে দেশের সর্ব্বোচ্চ সরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে বিপিএটিসি/ আরপিএটিসির ভূমিকা কি হওয়া উচিত? মূলতঃ এই দুই প্রশ্নের বিভিন্ন দিক এখানে আলোচনা করব।

প্রশিক্ষণ ও বিপিএটিসিঃ

সকল সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ যদি মূলতঃ বিপিএটিসি / আরপিএটিসির দিতে হয় তাহলে বিপিএটিসির বর্তমান লক্ষ্য, পন্থা চরিত্র পাল্টাতে হবে।

অর্থাৎ শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নয়; সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এ জন্য বিপিএটিসির বর্তমান অর্ডিন্যান্স (অর্ডিন্যান্স নং- ২৬/১৯৮৪) মৌলিকভাবে পরিবর্তন করতে হবে। নীতি হিসাবে এটাই কাম্য। কারণ সরকারের জন্য সকল কমকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণই কাম্য হবে। অন্যথায় পক্ষপাতিত্ব অথবা অবহেলার কথা উঠবে। পক্ষান্তরে কোন কোন শ্রেণী প্রশিক্ষিত এবং অধিকাংশ কর্মকর্তা/কর্মচারী অপ্রশিক্ষিত থেকে যাবেন। প্রশিক্ষণ পন্থাও উপযুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ স্বল্প সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রয়োজনের তাগিদে সপ্তাহব্যাপী হতে হবে। এমনিতেই বর্তমানে ফেলে রাখা বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ নয়মাস/ছয়মাসের ক্ষেত্রে এখন দুই মাসে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। সময়সীমা কমে গেলে উৎকর্ষের তারতম্য হতে পারে। এই সমস্যা মোকবিলার জন্য চিন্তাভাবনা করতে হবে। হয়ত শ্রেণীকক্ষ-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কমিয়ে মাঠপর্যায়ে ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। প্রশিক্ষকদেরও কেন্দ্র থেকে বিকেন্দ্রে, মাঠ-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে ক্ষেত-খামারে জনগণের সাথে হাতে-হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। প্রশাসনের লক্ষ্য যদি জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা হয়- যা হওয়া উচিৎ- তা হলে জনগণের কাছে থেকে তাঁদের সাথে একযোগে কাজ করে তাঁদের সমস্যা লাঘব করার চেষ্টা করা উচিৎ। সরকারী কর্মকর্তাদের চাকুরী জীবনের শুরুতেই এ ধরনের প্রশিক্ষণ দিতে পারলে পরবর্তী কর্মজীবনে জনবিমুখতা আসতে পারবে না। এ ভাবে প্রশিক্ষণের চরিত্র আমূল রদ-বদল হয়ে যাবে।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ঃ

তা হলে দেখা যাচ্ছে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যকে সামনে রাখলে প্রশিক্ষণের কাজ সঠিক পথে চলতে পারে। আমার বক্তব্য, আমরা প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য থেকে সরে যাচ্ছি। যার ফলে প্রশিক্ষণ বর্তমানে শুধুমাত্র কতগুলি পুস্তক মুখস্ত করা, কতগুলি নিয়মকানুন কণ্ঠস্থ করা এবং ক্ষমতার নামে জনস্বার্থের পরিপন্থী কাজ করায় পর্যবসিত হচ্ছে। জনগণ যথাসময়ে বিচার চাচ্ছেন, বিচার পাচ্ছেন না। কোর্ট- কাচারীতে কেসের পাহাড় জমে উঠেছে। উকিল- মোক্তার, ফড়িয়া-টাউটরা সকল মানুষকে প্রতারিত করছেন। জনগণ সরকারী কর্মকর্তাদের পত্র দিয়ে যথাসময়ে উত্তর পাচ্ছেন না। দেখা করতে গেলে দেখা পাচ্ছেন না। অভিযোগ করলেও কোন কাজ হচ্ছে না। হাসপাতালে ডাক্তার কোন সময় আছেন, কোন সময় নাই। থাকলে ঔষধ নাই। এক্সরে মেশিন আছে অথচ এক্সরে প্লেট/ফিল্ম নাই। জনগণ চিকিৎসা পাচ্ছেন না। সরকারী বীজ, সার, পানি, কীটনাশক

ঔষধ, যন্ত্রপাতি তদারকী/উপদেশ—জনগণের পাওয়ার কথা কিন্তু—কার্যতঃ পাচ্ছেন না। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী অনুদান সরকারী অফিস থেকে সহজ পথে আনতে পাচ্ছেন না। যা পাচ্ছেন, লিখতে হচ্ছে অন্য-রকম। উন্নয়নের অর্থ যথা সময়ে না পাওয়ায় সময়সীমার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে না। হলেও জেড়াতালি দিতে হচ্ছে। এক কথায় প্রশাসনের মূল লক্ষ্য এই সব সমস্যার তড়িৎ সমাধানে জনগণের পাশে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দাঁড়াতে পারছেন না। যদি এই চিত্র মোটামুটিভাবে বস্তুনিষ্ঠ বলে ধরে নেয়া যায়, তা হলে এতদিনের প্রশিক্ষণ কোন কাজে লাগছে?

এ গেল বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের কথা। এবারে আসুন মধ্য-পর্যায়ে প্রশিক্ষণের কথায়। এরাঁ ১০/১২ বা তার চেয়ে বেশী বৎসরের অভিজ্ঞ অফিসার। এঁদের প্রশিক্ষণ অত প্রয়োজন না যতটা নতুন চাকুরীপ্রাপ্ত অফিসারদের দরকার। অথচ, মোটামুটি এক ধরনের প্রশিক্ষণ এ পর্যায়েও দেওয়া হচ্ছে। তারপর আসুন উচ্চ পর্যায়ে সিনিয়র অফিসারদের কথায়। এঁরা বেশ, বয়স্ক ও অভিজ্ঞ। চাকুরী জীবনের অপরাহ্নে এদেঁর ঐ একই ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। আমার মনে হয় এঁদের প্রশিক্ষণ না দিয়ে এঁদের প্রশিক্ষক হিসাবে নবীন প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে হাজির করা দরকার। এঁরা তাঁদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরে নবীনদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। অথচ প্রশিক্ষণের নামে সিণ্ডকেট রিপোর্ট তৈরী করেন যা মূলতঃ কালক্ষেপন। বিদেশ যাত্রার সুযোগ, বাজার করার সুযোগ ও আর্থিক সুযোগ না থাকলে হয়ত অনেকে এই ধরনের প্রশিক্ষণে আসতেন না। তাই আমি মনে করি বিপিএটিসি/আরপিএটিসি শুধুমাত্র সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরীতে প্রবেশ করার পূর্বে বুনিয়াদী পর্যায়েই সীমাবদ্ধ রাখলে প্রশিক্ষণ অধিক অর্থবহ হতে পারে। তাছাড়া নবীন প্রশিক্ষণার্থীদের সরকারী কর্মে যোগ্য করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণই প্রয়োজন। ১০/১৫ বৎসর চাকুরী করার পরে তাঁদের মনমানসিকতার যে বিকাশ লাভ হয়, সিনিয়র পর্যায়ে তার পরিবর্তন অসাধ্য না হলেও দুরূহ বটে। বুনিয়াদী পর্যায়ে তাত্ত্বিক বিষয় বস্তু ও ব্যাবহারিক দক্ষতা ও মাঠপর্যায়ে জনগণের সাথে কাজ করার জন্য নিম্নলিখিত ফর্মুলা বিবেচনা করা যেতে পারেঃ-

তাত্ত্বিক বিষয়বস্তু ৩০%

ব্যাবহারিক দক্ষতা ৩০%

জনগণের সাথে কাজ ৩০%

প্রশিক্ষকদের মুল্যায়ন ১০%

এ ধরনের প্রশিক্ষণের জন্য ৩ থেকে ৪মাস সময় লাগতে পারে। প্রয়োজনবোধে এই সময়সীমা কমবেশী করা যায়। এই পদ্ধতির একটি বড় গুণ হলো তরুণ প্রশাসক তৈরীতে বিপিএটিসির বিশেষ ভূমিকা। আর এক বড় দুর্বলতা হোল এ ভাবে প্রশিক্ষণ চললে কোনদিনই প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র প্রশাসকগণই প্রশিক্ষণ লাভ করছেন। তাঁদের সংগে জনসাধারণ প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন না।

সবার জন্য প্রশিক্ষণঃ

অতএব আমাদের এখন এমন একটি ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে হবে যার মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র প্রশাসকদেরই প্রশিক্ষণ দিব না। জনগণকেও প্রশিক্ষণ দেব। কিভাবে একাজ সম্ভব? প্রশাসককে আমরা চিহ্নিত করেছি জনগণের প্রয়োজনীয় সেবক হিসাবে। আর প্রশিক্ষণকে চিহ্নিত করেছি সেই সেবা প্রদানের উদ্দোগ হিসেবে। এর আগেই বলেছি– প্রশিক্ষণ এমন একটি মুদ্রা যার একপিঠে আছেন প্রশাসকগণ অপর পিঠে আছেন জনগণ। আমরা যদি শুধু প্রশাসকদেরই প্রশিক্ষণ দেই তাহলে অপর পিঠ অর্থাৎ জনগণ পিছিয়ে যাবেন। জনগণকে প্রশাসকদের সমপর্যায়ে তুলে আনতে হবে। এটাই প্রশাসনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কিভাবে আমরা জনগণকে প্রশাসকদের সমপর্যায়ে তুলে আনতে পারি? শিক্ষায়, সুযোগে, যোগ্যতায়, প্রশাসকগণ অগ্রসর, জনগণ অনগ্রসর। তাই এই প্রস্তাবিত সবার জন্য প্রশিক্ষণে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে প্রশাসকদেরই। তাঁদের দায়িত্ব জনগণকে প্রশিক্ষিত করে তোলা। মনে করুন, একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। জনগণের কাল্যাণেই এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তা হলে জনগণের বা তাঁদের যে কয়জন আগ্রহী ও সময় দিতে রাজি– তাঁদের ঐ প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে যথা– প্রাথমিক আলাপ–আলোচনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনা মূল্যায়ন প্রভৃতি স্তরে প্রশাসকগণ জনগণের বিভিন্ন অংশকে বেছে নিয়ে কিভাবে এক সাথে কাজ করতে হয় তা শিক্ষা দেবেন, ভুল ধরিয়ে দেবেন। প্রয়োজনে হাত বাড়াবেন–তাতে জনগণ কিছুদিনের মধ্যে প্রশাসনের খুটি–নাটি যেমন পরিকল্পনাকরণ, হিসাব রক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে পাকাপোক্ত হয়ে উঠবেন। এভাবে কিছুদিন হাতে–কলমে প্রশিক্ষণ চললে জনগণই ঐ ধরণের প্রকল্প পরবর্তীতে নিজেরাই করতে পারবেন। নীতি হিসাবে প্রতি বৎসর একজন প্রশাসক যদি দশ জন জনগণকে প্রশিক্ষণ দেন, তাহলে বৎসরে ১২,২৫,৭৮৪ জন প্রশাসক ১,২২,৫৭,৮৪০ প্রশিক্ষিত জনগণ গড়ে তুলতে পারবেন। এভাবে দশ বৎসরে এগারকোটি প্রশিক্ষিত জনগণ লাভ করা যাবে।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

শুধু প্রকল্প কর্মেই নয়, শিক্ষা বিস্তারে, গ্রাম্য শান্তি বজায় রাখতে, খাজনা আদায়ে জনগণ এবং সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে এক সংগে কাজ করতে দেওয়া উচিত। তাতে জনগণ সরকারী কর্মকাণ্ডের জ্ঞানই অর্জন করবেন না, সরকারী কর্মের বিভিন্ন অসুবিধা উপলব্ধি করবেন যাতে তাঁদের সমালোচনা বাস্তব-ভিত্তিক হয়ে উঠবে। পক্ষান্তরে, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ জনগণের সংগে এক সংগে কাজ করার ফলে জনগণের অভাব অভিযোগ/ দুরাবস্থার মোকাবিলা করতে পারেন। উভয়েরই রূপান্তর হবে, এভাবে গ্রাম থেকে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী কর্মকাণ্ডের সাথে জনগণের বিভিন্ন অংশের সরাসরি ও নিয়মিত যোগাযোগ ও এই সংগে প্রশাসন পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় আইন পাশ ও সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে সমর্থন প্রয়োজন এবং এই প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম/সিলেবাস জনগণের /ভুক্তভোগীদের অসুবিধা ও দূর্ভোগ থেকে চয়ন করতে হবে। অর্থাৎ জনগণের কি প্রয়োজন তা জনগণের সাথে এক সংগে কাজ করে জানতে হবে ও জনগণকে প্রশাসকের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

বিপিএটিসি-র ভূমিকাঃ

যদি সরকারী সমর্থনে এ ধরণের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং জনগণের জন্য একটি সহ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে বিপিএটিসির ভূমিকা কি হবে? শুধু একটি মাত্র কেন্দ্র বা চারটি উপকেন্দ্র থেকে এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব নয়। সাভার- ভিত্তিক বিপিএটিসি মূল চালিকা শক্তি, মৌলিক চিন্তা, পরিকল্পনা ও দিক নির্দেশনা দান করবে। এ কাজ ছড়িয়ে পড়বে সারা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে, মাঠ-প্রান্তরে, অফিস-আদালতে, স্কুলে কলেজে—সর্বস্তরে। এ জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে ছাড়াও প্রতি জেলায় একটি, প্রতি উপ-জেলায় একটি, প্রতি ইউনিয়নে একটি অর্থাৎ ৩০৪৪ টি পিএটিসি বা তার শাখা গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনবোধে ৬৮,০০০হাজার গ্রামে ৬৮,০০০ হাজার পিএটিসি কাজের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করবে। এর অর্থ এ নয় যে, এখনই প্রতিটি গ্রামে সুদৃশ্য ইমারত, গাড়ী, যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রশিক্ষণের নামে প্রচুর ব্যয় সরকারের করতে হবে। না ঠিক তার উল্টো। আমার প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণ-ইমারত, গাড়ী ও যন্ত্রপাতি ভিত্তিক নয়, আমার প্রশিক্ষণ মানুষের মনে, ব্যবহারে, চরিত্রে যা ধীরে ধীরে রূপ লাভ করে। নিয়মিত অনুশীলনে, ত্যাগে, তিতীক্ষায় সহমর্মিতায়, খোলা মাঠে অফিসার ও জনগণ এক সাথে রাত্রি জাগরণে, মাটি কাটায়, বৃক্ষরোপণে রোগীর, পরিচর্যায়, রাস্তা-কার্লভাট নির্মাণে, খাজনা আদায়ে, হিসাব নিকাশ রক্ষায়, প্রকৃতিক

দুর্যোগে বিপন্ন জনগণের সেবায়, শিক্ষার আলো বিতরণে, দুষ্টের দমনে আর শিষ্টের লালনে। এ জন্য গভীর নিষ্ঠা ও অনুশীলন যতটা প্রয়োজন, ভৌত কাঠামো ততটা নয়। প্রয়োজনে এগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে প্রধান উপজীব্য নয়, বর্জনীয় উপকরণ মাত্র। এ গুলি ছাড়াও প্রশিক্ষণ হতে পারে এবং অর্থপূর্ণ ভাবে হতে পারে। এ জন্য বিদেশী সাহায্য, বিশ্বব্যাংক, বিদেশী উপদেষ্টা ইত্যাদির প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন দেশীয় জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কর্মক্ষম গোষ্ঠীতে চিহ্নিত করা এবং চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রশাসকদের মাধ্যমে পিএটিসির নেতৃত্ব শুরু করা এবং পরবর্তীতে দেশের সর্বত্র এই প্রশিক্ষণের দর্শন ছড়িয়ে দেওয়া। তবে এজন্য বিপিএটিসির নেতৃত্বের কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়বে। তেমনি প্রয়োজন হবে নতুন ধরনের পাঠ্যক্রমের (সারনী-১ দ্রষ্টব্য)।

অর্থাৎ এ ধরনের প্রশিক্ষণের খুব সামান্যই শ্রেণীকক্ষে দেওয়া সম্ভব। অধিকাংশই হাতে-কলমে কর্মস্থলে দিতে হবে। বিপিএটিসির প্রশিক্ষকগণ যে ব্যবহার, তাত্ত্বিক দিকে শ্রেণীকক্ষে ব্যাখ্যা করবেন তার বাস্তব প্রতিফলন তাঁদেরই পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যখন তাঁদের প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং জনগণ এক সাথে সমস্যা সমাধানে মাঠে-অফিসে নিয়োজিত হতে পারেন। এভাবে কথায় ও কাজে সমন্বয় সাধনে প্রশিক্ষণ তার ভূমিকা/ অবদান রাখতে পারে।

আর একটি ভূমিকা পিএটিসি পালন করতে পারন। বিপিএটিসির গবেষণা শাখা বাংলাদেশের প্রশাসনের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করতে পারেন। এ জন্য একটি গণ-তথ্য ব্যাংক গড়ে তোলা দরকার যেখানে মাঠ পর্যায়ে বা অফিস পর্যায়ে যে কোন সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় তথ্য চাওয়া মাত্র সরবরাহ করা যায়। এ ক্ষেত্রে কম্পিউটার কাজে লাগতে পারে।

এ ভাবে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা উভয়েই উপকৃত হবে। এবং এর বাস্তব ব্যবহারে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সমৃদ্ধ হবে। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক, এ কর্মে বিপিএটিসি, জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, পরিকল্পনা কমিশন, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের সংগে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে একটি গবেষণা সেল সার্বক্ষণিকভাবে উন্মুক্ত রাখতে পারেন। বিপিএটিসির গবেষকগণ তাঁদের গবেষণা লব্ধ সামগ্রী কাগজের পৃষ্ঠায় বন্দী না রেখে জনগণের কষ্ট দূরীকরণের কাজে নিয়োজিত করতে পারেন। গবেষণার বিষয়বস্তু জনগণের অভিজ্ঞতালব্ধ নিত্যনৈমিত্তিক অসুবিধা ও বিড়ম্বনা প্রসূত হতে হবে।

এত বড় কাজের দায়িত্ব যাঁদের উপর বর্তাবে, তাঁদের দায়িত্বশীলতা সেভাবেই বড় হতে হবে। বর্তমানে বিপিএটিসির কাজ দেখাশুনা করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের বোর্ড

অব গভর্ণরস আছেন। তাঁদের সংখ্যা ১২। এখানে একজন মন্ত্রী ছাড়া বাদবাকী অধিকাংশই সরকারী কর্মকর্তা। জনগণ বা তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সাধারণ জনসাধারণ (মাঠ, গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে) অনুপস্থিত। সরকারের কি কর্তব্য, জনগণের কি চাহিদা ও কিভাবে সে চাহিদার মোকাবিলা সম্ভব এজন্য প্রয়োজন আরও সাধারণ ভিত্তিক জনপ্রতিনিধি/ উপদেষ্টা পরিষদ গঠন। জনগণ কি চান সে কথাটি বলার লোক বেশ কয়েকজন থাকা চাই। তাহলে বিপিএটিসির জনসচেতনতা আরও বাড়বে।

আমাদের সরকার বিশেষ করে মহামান্য প্রেসিডেন্ট একটা কথা প্রায়ই বলেন, ঔপনিবেশিক আমলের শাসন ব্যবস্থা দিয়ে স্বাধীন দেশের প্রশাসন চলতে পারে না। খুব দামী কথা। কিন্তু কার্যতঃ ঔপনিবেশিক আমলের কাঠামোই বজায় আছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশাসকদের মনমানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। প্রশাসনকে জনগণের দোর গোড়ায় নিতে হবে ইত্যাদি। এ সব মহৎ বাক্যগুলিকে যদি বাস্তবে রূপান্তর করতে হয় তবে সবার জন্য প্রশিক্ষণ একটি ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। কারণ এই প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় প্রশাসনকে জনগণের কাজ হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং জনগণের কাজে জনগণ ও প্রশাসক যারা প্রশাসনের দুপিঠ তাঁরা এক সাথে মিলেমিশে কাজ করে ভাল মন্দে দায়দায়িত্ব গ্রহণ করবে, একে অপরকে গালমন্দ করবে না। প্রশাসনকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার নামই ঔপনিবেশিকতা। আর জনগণকে প্রশাসক রূপে গড়ে তোলাই স্বাধীনতা। স্বাধীন দেশের নাগরিক স্ব-শাসিত। বাইরে থেকে কেউএসে তাঁর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না, অন্যের উপর নির্ভরশীলতা অতিক্রম করেই জনগণ প্রশাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। এই দর্শনের বিকাশ পথে বিপিএটিসি প্রশাসনকে এবং প্রশিক্ষণকে নতুন আংগিক দান করতে পারেন। তাহলেই প্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও জনগণ- এই তিন মুর্ছনা একই সুরে বেজে উঠবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

"সবার জন্য প্রশিক্ষণ"—প্রশাসক, প্রশিক্ষক", প্রশাসন, অর্থ-প্রশাসক ও জনগণের এক সাথে কাজের ধারণা সমূহ -এ ধরনের চিন্তার মৌলিকত্ব কোন একক ব্যক্তির নয়। বিভিন্ন মনীষীর চিন্তা, কার্য ও অভিজ্ঞতায় এ ধরনের প্রচেষ্টা বিধৃত। নানাভাবে বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের চিন্তা আমাকে আকৃষ্ট করেছে। যেগুলি সাজিয়ে বক্ষমান প্রবন্ধে উপস্থাপিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য সুধীজনের সমালোচনায় এ ধরনের চিন্তা আরও ব্যাপ্তি লাভ করবে। এর এুটি বিচ্যুতি বিদুরিত হবে এবং ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে অভিজ্ঞজনের পরামর্শ পাওয়া যাবে বলে আশা রাখি।

সারণী ঃ ১

প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমঃ "সবার জন্য প্রশিক্ষণ"ঃ এক বৎসর সময়ের মধ্যে।

১। অবশ্য পাঠ্যঃ মাত্র তিনটি বিষয়ঃ (বুনিয়াদী মডিউল)

ক) পড়তে পারা
খ) লিখতে পারা
গ) অংক কষা (মোটামুটি ভাবে)

প্রশিক্ষণ কাল তিন মাস

২। জরুরী পাঠ্যঃ বিশেষ ধরনের দক্ষতা অর্জন (হিকমতী মডিউল) যে কোন একটিঃ সময় ছয় মাস।

ক) টাইপিং
খ) ষ্টেনগ্রাফী/সর্টহ্যাণ্ড
গ) টেলেক্স/ফ্যাক্স
ঘ) হিসাব–নিকাশ রক্ষণ
ঙ) পরিকল্পনা প্রণয়ন/বাজেট প্রনয়ণ
চ) প্রতিবেদন প্রণয়ন
ছ) সমবায় কর্মকাণ্ড
জ) সভা ডাকা, সভা পরিচালনা করা
ঝ) সভার সিদ্ধান্ত লিখন
ঞ) কম্পাউণ্ডারী (কেমিষ্ট ও ড্রাগিষ্ট)
ট) গাড়ী চালান, গাড়ী মেরামত ও রক্ষণা বেক্ষণ
ঠ) গবাদি পশু, হাসমুরগী ও মৎস চাষ
ড) খেলাধুলা
ঢ) প্রতিবেশ পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিধি

৩। অল্প জরুরী পাঠ্য/ইচ্ছাধীন পাঠ্যঃ যে কোন দুইটি (তেজারতী মডিউল), প্রশিক্ষণ সময় তিন মাস।

ক) বাংলাদেশের রাজনীতি ও প্রশাসন
খ) বাংলাদেশ সরকারের কাঠামোঃ জাতীয়, আঞ্চলিক, ও স্থানীয়
গ) প্রশাসনিক দায়–দায়িত্ব ও জবাবদিহি
ঘ) প্রশাসনিক সমন্বয়
ঙ) সরকারী প্রশাসনিক পদ্ধতি/ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
চ) নিজ পর্যায়ে নিজ এলাকায় প্রধান প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ
ছ) স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবহার
জ) ছোটখাট গবেষণা, তথ্য ব্যবহার ও প্রকল্প মূল্যায়ন
ঝ) প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ, বাস্তবায়ন
ঞ) প্রি–অডিট, পোষ্ট–অডিট
ট) কম্পিউটার ব্যবহার
ঠ) বহির্বিশ্ব

বিঃ দ্রঃ প্রশাসক প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন হাতে কলমে, কথায় ও কাজে, অফিস ও অফিসের বাইরে— যাতে অশিক্ষিত মানুষও এক বৎসরের মধ্যে একজন মোটামুটি শিক্ষিত/প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও দক্ষতা সম্পন্ন নাগরিক রূপান্তরিত হতে পারে। এভাবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসন এক অভিন্ন স্বত্তায় বিকশিত হবে যেখানে সাধারণ মানুষও প্রশাসন এই দুই এর মধ্যে ব্যবধান কমে আসে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ এ ধরনের প্রশিক্ষণের ফলে একজন প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন। এ ধরনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধানের ইংগিত স্পষ্ট।

এই মানস-মণ্ডল রচনায় নিম্নলিখিত ব্যক্তি/বক্তব্য আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেনঃ

1. " The president as National pedagouc " article in the Public Administration Review, 1947.

2. Mao ze Dong "Walking on Two Legs " Chinese communes and Cultural Revloution writings, John Gurley, " Rural Development in China 1949-72 and the Lessons to be learned from it " World Development 3: 788, 1975, 455-471.

3. Saemul Undong Movement (New community Movement) South Korea (1970)

4. Dag Hammarskjold; Another Development: Approaches and Strategies. Marc Nerfin, ed, Uppsala, Sweden. Dag Hammarskjold Foundation, 1987.

5. Another Sweden (Development Dialogue 1975: 1d:2)

6. Self-reliance and Ujamma: Tanzania's Development Strategy;

7. William Hintom, Fan-shon, n: d:a.

8. Irving Louis Horowitz, Three Worlds of Development: The Theory and practice of International tratification, second Edition, N:Y: OUP, 1972. Horowitz dedicated his book to Bangladesh with the following words:

   " To the people of Bangladesh;
   May they learn from the past,
   Live in the present, and
   Instruct the future. "

9. professor Jose Abueva, President, University of the Philippines (1987) is the source of this quote:

"The Future is not a place we are going to but a
place we are going to
But a Place we are making,
Not a path to be found
But made
And the activity changes both
The maker and the destination."

10. Akhtar Hameed khan, The Complete Works of Akhter Hameed Khan, ed. by M. Ghulam Satter (Comilla: BARD, 1985)

11. Sheikh Maqsood Ali, " the Batasam Durgapur Format for Rural Development in Bangladesh, "NIPA,1976.

12. Sheikh Maqsood Ali, " The Own Village Development (OVD) Model of Rural Development," NIPA1980.

13. Muhammad Yaseen, " The story of Deedar Cooperatives." Comilla, 1989.

14. Paulo freire, The Pedagogy of the Oppressed (NY: seabury, 1970)

15. Paulo freire, Education for critical consciousness (NY: seabury Press ,1973

16. Norman Uphoff, Feasibility and Application of Rural Development participation (Ithaca, NY: cornell University Rural development Committee, 1979).

17. Coralie Bryant and Louis White, Managing Deveopment in the Third World (Boulder; co, Westview press, 1982).

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম

— ডঃ ইকরামুল আহসান

ভূমিকা

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমকে বাস্তবধর্মী ও সময়োপযোগী করার জন্য প্রয়োজন প্রশাসন ও উন্নয়নের বাস্তব সমস্যাকেন্দ্রিক গবেষণা পরিচালনা করা। এ জন্য প্রশিক্ষণকে গবেষণা কর্মকাণ্ডের সাথে সমপৃক্ত করতে হবে। গবেষণা হবে কেন্দ্রের সার্বিক কর্মকাণ্ডেরই একটি অংশ যা প্রশিক্ষণের উপকরণ যোগাবে এবং একই সাথে প্রশিক্ষণের মান ও কার্যকারিতা বাড়াবে।

সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতি প্রশিক্ষক কর্তৃক বছরে কমপক্ষে দুটি গবেষণা কাজের সাথে জড়িত থাকা ও গবেষণা প্রতিবেদন স্বীকৃত পেশাদার জার্ণালে প্রকাশনার উপর গুরুতর আরোপ করা হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

১) অনুষদ ও পাঠ্যক্রম উন্নয়ন (গবেষণার ফলাফল ব্যবহার, পাঠ্যক্রম উপকরণ প্রস্তুত করণ),

২) প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ,

৩) জাতীয় পর্যায়ে, জেলা ও স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের দিকে প্রভাবিত করা ও সুপারিশ প্রণয়ন।

গবেষণা কার্যক্রমের শ্রেণীবিন্যাস

কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রমকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়: (ক) পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত গবেষণা এবং (খ) প্রশাসন ও উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা।

(ক) **পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত গবেষণাঃ** বর্তমানে কেন্দ্রে তিন ধরনের নিয়মিত প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম পরিচালিত হচ্ছেঃ- (১) বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম, (২) প্রশাসন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত উচ্চতর পাঠ্যক্রম এবং (৩) উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পাঠ্যক্রম।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে এবং পাঠ্যক্রমগুলোর উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর আলোকে গবেষণার ক্ষেত্র সমূহ চিহ্নিত করা হয়। সঠিকভাবে চিহ্নিত ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং গবেষণার ফলাফল প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(খ) **প্রশাসন ও উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা ঃ** বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ (জ) ধারা মোতাবেক প্রশাসন ও উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া কেন্দ্রের অন্যতম দ্বায়িত্ব। এ দ্বায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রশাসন ও উন্নয়নের বিভিন্ন দিকের উপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এরূপ গবেষণা লব্দ ফলাফল সরকারের নীতি/ কর্মসূচী নির্ধারণ ও সংস্কার সাধনে সহায়ক হয়।

গবেষণা কার্যক্রমের অর্থায়নঃ

অর্থায়নের দিক থেকে কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রমকে তিনভাগে ভাগ করা যায়ঃ – (ক) বিশ্বব্যাংকের অর্থানুকূল্যে উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম, (খ) কেন্দ্রের রাজস্ব বাজেটভূক্ত গবেষণা কার্যক্রম এবং (গ) বিপিএটিসি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম।

(ক) বিশ্বব্যাংকের অর্থানুকূল্যে উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে পরিচলিত গবেষণা কার্যক্রমঃ "পিএটিসি দ্বিতীয় পর্যায়" (সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায়" গবেষণা ও ঘটনা সমীক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী"(Studies & Case Development Programme) —এর সংস্থান করা হয়। বিশ্বব্যাংকের Staff Appraisal Report এ বলা হয়েছে, "গবেষণা ও ঘটনা সমীক্ষা কর্মসূচী কেন্দ্রের শিক্ষা অনুষদ কর্তৃক সম্পাদিত হবে এবং তা প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যাবলীকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হবে, যা জাতীয় পর্যায়, জেলা ও স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে" (SAR NO . 4181-BD)।

বিশ্বব্যাংকের অর্থানুকূল্যে ১৯৮৬–৮৭ অর্থ বছর থেকে কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম শূরু হয় ।উক্ত অর্থ বছরে মোট ৮টি গবেষণা প্রকল্প সম্পাদিত হয় (পরিশিষ্ট–ক)।১৯৮৭–৮৮ অর্থ বছরে সম্পাদিত গবেষণা প্রকল্পের সংখ্যা ১৪টি (পরিশিষ্ট–খ)।১৯৮৮–৮৯ অর্থ বছরে আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহের পাঠ্যক্রম উন্নয়ন সংক্রান্ত ১১টি গবেষণা প্রকল্প গৃহীত হয় (পরিশিষ্ট–গ)।

(খ) কেন্দ্রের রাজস্ব বাজেটভূক্ত গবেষণা কার্যক্রমঃ কেন্দ্রের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১৯৮৭-৮৮ অর্থ বছরে ১টি ও ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ১টি সহ মোট ২টি গবেষণা প্রকল্প সম্পাদিত হয়েছে। ১৯৮৯-৯০ অর্থ বছরে ৪টি গবেষণা প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-ঘ)। বর্তমানে এ প্রকল্প গুলি সমাপ্তির পথে।

(গ) বিপিএটিসি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমঃ- উপরোক্ত কার্যক্রম এর অধীনে কেন্দ্র ও বিশ্বব্যাংকের ইডিআই এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর উন্নয়ন কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে গবেষণা পরিচালিত হয়। ইডিআই এর সহযোগিতায় ১৯৮৭-৮৮ অর্থ বছরে "প্রকল্পের আয়ুস্কালীন ফলপ্রসুতার" উপর ৩টি এবং ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে " উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার" উপর ৩টি সহ মোট ৬টি ঘটনা সমীক্ষা পরিচালিত হয় (পরিশিষ্ট-ঙ) । এছাড়া এপিডিসির সহযোগিতায় দারিদ্র বিমোচন ও বিকল্প বিতরণ ব্যবস্থার উপর ৯টি ঘটনা সমীক্ষা প্রণীত হয়েছে (পরিশিষ্ট-চ)।

গবেষণা ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ

কেন্দ্রের গবেষণা কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সদস্য বিশিষ্ট একটি গবেষণা কমিটি গঠিত হয়েছেঃ

রেকটর	সভাপতি
পরিচালন পর্ষদের সদস্যবৃন্দ	সদস্য
প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবয়ন দপ্তর	সদস্য

পরবর্তীতে পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) কে উক্ত কমিটির সদস্য সচিব মনোনীত করা হয়।

গবেষণা কমিটির দায়িত্বাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) গবেষণা কর্মসূচী নির্ধারণ

(খ) গবেষণা প্রস্তাবনা নির্বাচন ও অনুমোদন

(গ) গবেষণা পরিচালনার জন্য গবেষক নির্বাচন

(ঘ) গবেষণা মূল্যায়নের জন্য সাবকমিটি নিয়োগ

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

(ঙ) গবেষণার জন্য পারিতোষিক অনুমোদন

(চ) প্রতিটি গবেষণা প্রকল্পের জন্য সময় নির্ধারণ

(ছ) প্রতিটি গবেষণা প্রকল্পের বিচার্য বিষয়, পরিধি, বাজেট, পরিচালক ও যুগ্ম পরিচালক, পর্যালোচক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নির্বাচন ও অনুমোদন।

কেন্দ্রের গবেষণা ও উপদেশনা বিভাগ উক্ত কমিটিকে সচিবালয় সহায়তা প্রদান করে।

গবেষণা প্রকল্পের নির্বাচন, অনুমোদন ও পরিচালনাঃ

কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে একটি গবেষণা নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। গবেষণা নীতিমালায় বর্ণিত গবেষণা প্রকল্পের নির্বাচন, অনুমোদন ও পরিচালনার স্তরগুলো নিম্নরূপঃ—

(১) প্রতি আর্থিক বছরে গবেষণা কমিটি কর্তৃক গবেষণার ক্ষেত্র, বিষয়— চিহ্নিতকরণ ও অনুমোদন,

(২) অনুমোদিত গবেষণার ক্ষেত্র / বিষয় সম্পর্কে অনুষদ সদস্যদের কাছ থেকে গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান,

(৩) আগ্রহী ও যোগ্য অনুষদ সদস্য কর্তৃক গবেষণা কমিটির বিবেচনার জন্য গবেষণা প্রস্তাবনা পেশকরণ,

(৪) গবেষণা প্রস্তাবনা (বিচার্য বিষয়, পরিধি, বাজেট, প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম পরিচালক, মূল্যায়ন কমিটি) অনুমোদন এবং সরকারী/ স্থানীয় আদেশ জারী করণ,

(৫) গবেষণা প্রস্তাবনা ও প্রশ্নপত্র মূল্যায়ন কমিটির বিবেচনার জন্য পেশকরণ,

(৬) নির্দিষ্ট ছকে মুলায়ন কমিটির অনুমোদন পত্র ও কার্যাদেশ পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) এর কাছে পেশকরণ,

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

(৭) প্রকল্প পরিচালক/যুগ্ম পরিচালকের অনুকূলে প্রথম কিস্তির অর্থ (অনুমোদিত বাজেটের ৫০%) ছাড় করণ,

(৮) মাসিক পর্যালোচনা সভায় পর্যালোচনার জন্য প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) এর কাছে পেশ করণ,

(৯) উপাত্ত সংগ্রহ, বিন্যাস ও বিশ্লেষণ,

(১০) খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন,

(১১) খসড়া প্রতিবেদন অনুষদ সেমিনারে উপস্থাপন,

(১২) সেমিনারের মন্তব্য, পরামর্শ (যদি থাকে) মোতাবেক খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন করে মূল্যায়ন কমিটির অনুমোদনের জন্য পেশ করণ,

(১৩) মূলায়ন কমিটির মন্তব্য/পরামর্শ (যদি থাকে) এর আলোকে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ,

(১৪) মূল্যায়ন কমিটির অনুমোদন পত্র দাখিলের পর প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ প্রকল্প পরিচালক/যুগ্ম পরিচালকের অনুকূলে করণ, এবং

(১৫) চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ১৫ কপি ও প্রকল্পের হিসাব জমা দান।

কাজের অগ্রগতি

১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হলেও প্রধানত গবেষণা কার্যক্রমে তহবিল ব্যবহারের পদ্ধতি নির্ধারণে বিলম্ব হওয়ার জন্য ১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে কেন্দ্রে গবেষণা কার্যক্রম আরম্ভ হয় এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩৯টি গবেষণা প্রকল্প সমাপ্ত হয়।

সমাপ্ত গবেষণা প্রকল্প

১৯৯০ এর ৩০শে জুন পর্যন্ত সম্পাদিত সর্বমোট ৩৯ টি গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে ৫টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিষয় ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ দেয়া হোলঃ—

বিষয়	সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা
লোক প্রশাসন	৭টি
উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা	৩টি
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৫টি
ল্যোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ	৪টি
স্থানীয় সরকার	৬টি
পল্লী উন্নয়ন	২টি
দারিদ্র বিমোচন	৯টি
উন্নয়ন পরিকল্পনা	১টি
প্রাথমিক শিক্ষা	১টি
তথ্য প্রযুক্তি	১টি
সর্বমোট	৩৯ টি

অর্থ সংস্থানের উৎস অনুসারে সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিভাজন নীচে দেয়া হোলঃ-

অর্থ সংস্থানের উৎস	সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা
(১) বিপিএটিসি প্রকল্প দ্বিতীয় পর্যায় (আইডিএ ঋণ নং ১৩৪৯ বি ডি)	২২ টি
(২) বিপিএটিসি রাজস্ব বাজেট	২ টি
(৩) যৌথ উদ্যোগে গবেষণা (ইডিআই এর সাথে)	৬ টি
(৪) যৌথ উদ্যোগে গবেষণা (এপিডিসি এর সাথে)	৯ টি
মোট	৩৯ টি

চলমান গবেষণা প্রকল্পঃ

বর্তমানে চলমান গবেষণা প্রকল্পের সংখ্যা হলো ১৫টি। উক্ত ১৫টি প্রকল্পের মধ্যে ১১টি প্রকল্পই আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহ কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের পাঠ্যসূচী উন্নয়ন সম্পর্কিত। এই ১১টি গবেষণা প্রকল্পের সমূদয় ব্যয় আরপিএটিসি প্রকল্প (আইডিএ ঋণ) থেকে বহন করা হচ্ছে। এগুলি ছাড়া বাকী ৪টি প্রকল্পের ব্যয় কেন্দ্রের রাজস্ব বাজেট থেকে বহন করা হচ্ছে।

আর্থিক অগ্রগতিঃ

গবেষণার জন্য অর্থ, তহবিলের সংস্থান ও ব্যয়ঃ

(ক) আইডিএ ঋণ (উন্নয়ন প্রকল্প)

অর্থবছর	বরাদ্দ (লাখ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (লাখ টাকা)
১৯৮৬-৮৭	বিপিএটিসি ৮. ১০	৮.০৬
১৯৮৭-৮৮	১৪.৬৪	১৪.৫৯
	২২.৭৪	২২.৬৫
১৯৮৮-৮৯	আরপিএটিসি	১১.৯১চলমান

(খ) **রাজস্ব বাজেট**

অর্থ বছর	সংশোধিত বারদ্দ	প্রকল্পের জন্য বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
১৯৮৭-৮৮	২,০০,০০০/-	৫৫, ০০০/-	২৭,৫০০/-
১৯৮৮-৮৯	২,০০,০০০/-	১,১৩,০০০/-	৫৬,৫০০/-
১৯৮৯-৯০	৫,০০,০০০/-	৪,১৬,০০০/-	৩,৮০,০০০/-
মোট	৯,০০,০০০/-	৫,৮৪,০০০/-	৪,৬৪,০০০/-

ব্যালেন্স ১,২০,০০০/- (প্রকল্প চলমান)

১৯৯০-৯১ ২,০০,০০০/-(প্রাক্কলিত)

গবেষণা পদ্ধতি পাঠ্যক্রম

কেন্দ্রের অনুষদ সদস্য ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকদের গবেষণা পদ্ধতিগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮৯ সাল থেকে দু'সপ্তাহব্যাপী গবেষণা পদ্ধতি পাঠ্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২টি গবেষণা পদ্ধতি পাঠ্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এবং ৩৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

অনুষদ সেমিনারঃ এপর্যন্ত মোট ২০টি অনুষদ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিবিধঃ

(১) কেন্দ্রের সম্পাদিত ৩৯টি গবেষণা প্রকল্পের প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ তৈরী করা হয়েছে 'Abstracts of Research Reports' শিরোণামে। গবেষণা প্রকল্পে প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশ এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

(২) সম্পাদিত গবেষণা কর্ম থেকে প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরী এবং কেন্দ্রের সম্পাদিত কাজের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন করা হয়েছে।

(৩)গবেষণা পদ্ধতির উপর একটি ম্যানুয়াল তৈরী করা হয়েছে যা প্রকাশনার অপেক্ষায় আছে।

পরিশিষ্ট–ক

১৯৮৬–৮৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত ৮টি প্রকল্প

1. Performance Appraisal System for Class-I Officers in Bangladesh.
2. Training Needs Identification for Effective Upazila Administration.
3. Intensive Rabi Crop Cultivation Programme, 1986-87:Analysis of Vertical Coordination in Project Management.
4. Delay in the Disposal of Cases: A Structural Analysis of the Bangladesh Secretariat.
5. The Employment Aspect of the Third Five Year Plan (1985-90): The Case of Handloom and Powerloom Sector.
6. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা।
7. A Study of the Career Development Programme in the Bangladesh Civil Service.
8. The Problem of Coordination in Upazila Administration: A Case Study of Two Upazilas.

পরিশিষ্ট–খ

১৯৮৭–৮৮ অর্থ বছরে সম্পাদিত ১৪টি গবেষণা প্রকল্প:

1. Tatgeted Poverty Alleviation Programme in the Third Plan.
2. সরকারী দপ্তর সমূহের পরিদর্শন ও অনুসুরণ পদ্ধতির নিরীক্ষা
3. A Case Study of the Procedures for Adjudication of Grievances of Government Employees.
4. Assesssment of Training Needs of Mid-Level Officers.

5. Education in Bangladesh: A Case Study of Policy Planning in Primary Education.
6. A Study of Constraints & Potentials of Domestic Resources Mobilization.
7. Assessment of Training Needs of Senior Civil Servants.
8. বুনিয়াদী পর্যায়ে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ।
9. ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিকরণ: উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের উপর একটি ঘটনা সমীক্ষা।
10. A Case Study on "On the Job Training for Officers" in BCS (Admn.) & BCS (Sectt.) Cadres.
11. A Study of Delay in Implementation of Development Projects.
12. Public Administration Computer Centre : a Case Study.
13. Delegation of Authority to Public Enterprises in Bangladesh:A Case Study of Bangladesh Steel & Engineering Corporation.
14. Upazila System and Agricultural Development in Bangladesh: A Case Study of Dhamrai Upazila.

পরিশিষ্ট–গ

১৯৮৮–৮৯ অর্থ বছরে আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহের পাঠ্যক্রম উন্নয়ন সংক্রান্ত ১১টি গবেষণা প্রকল্পের তালিকাঃ

1. A Study of Regional Public Administration Training Centres (RPATCs)Project.
2. দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন।
3. Assessment of Training Needs of Class III Employees:

4. চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ ওপাঠ্যসূচী উন্নয়ন।
5. বেঞ্চ ক্লার্কদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ পাঠ্যসূচী উন্নয়ন।
6. দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূল্যায়ণ।
7. Evaluation of Training Programmes for Class III & IV Employees: A Study.
8. তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের আর্থ- ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন।
9. On- the-job training Needs Assessment of Class II Level Officers.
10. Training Needs Identification For Training of Trainers (ToT).
11. Performance Appraisal System for Class III Employees in Bangladesh.

পরিশিষ্ট-ঘ

কেন্দ্রের রাজস্ব বাজেটভুক্ত গবেষণা কার্যক্রম ঃ

১৯৮৭-৮৮

1. A Study of Personnel Transfer System in Upazila Administration.

১৯৮৮-৮৯

1. Flood and Development :A Study of the Socio-Economic Impact of 1988 Flood in Rural Bangladesh.

১৯৮৯-৯০ অর্থ বছরে গৃহীত কেন্দ্রের রাজস্ব বাজেটভুক্ত ৪টি গবেষণা/ঘটনা সমীক্ষা

1. Upazila System & Agricultural Development in Bangladesh: A Case Study of Selected Upazilas.
2. Upazila System and Poverty Alleviation.

3. Recruitment Policy of Bangladesh Government.

4. প্রশাসনে মানবিক সম্পর্ক।

পরিশিষ্ট–ঙ

1. বিপিএটিসি ও বিশ্বব্যাংকের ইডিআই– এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ঘটনা সমীক্ষা :

a) Sustainability of Rural Development Projects : A Case Study of RD-I Project in Bangladesh.

b) Sustainabiluty of Primary Education Projechs :A Case Study of Universal Primary Education in Bangladesh.

c) Sustainabioity of Projects for Higher Agricultural Education: A Case Study of Bangladesh Agricultural University.

১৯৮৮–৮৯

a) Case Study on Meghna-Dhonagoda Irrigation Projects.

b) Case Study on Polash Urea Fertilizecr Factory.

c) Case Study on Second Extension and Research Project.

পরিশিষ্ট–চ

২। বিপিএটিসি এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় উন্নয়ন কেন্দ্র (এপিডিসি) এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত কার্যক্রম ঃ

1. A Case Study on Grameen Bank.

2. A Case Study on the Vulnerable Groups Development Programme (VGDP).

3. A Case Study on Gono Unnayan Procheshtya.

4. A Case Study on Money ond Medal Project.

5. A Case Study on Dhamsona Project.

6. Training Needs Assessment-in Bangladesh.

7. A Case Study on Swanirver Bangladesh.

8. Poverty Alleviation Programmes and Alternative Delivery System-Country Report.

9. Approaches to Rural Health Care: A Case Study of Ghonoshasthay Kendra.

উন্নয়ন প্রশাসনের লক্ষ্য ও পন্থা

—কঙ্কা জামিল খান

অর্থনীতিবিদ মাইকেল টোডারোর (Michael Todaro) মতে উন্নয়ন হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পুর্ণবন্টন, চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক কাঠামো, জনগণের মনোভাব এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়নের একটি বহুদিক–বিশিষ্ট প্রক্রিয়া।[১] যদিও উন্নয়ন প্রশাসন একটি বিতর্কিত বিষয় তথাপি আর, কে, হোপ উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম উপযুক্ত সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা– — উন্নয়নগামী দেশগুলোর লোক প্রশাসনের অবস্থান এবং দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ অধ্যয়ন ও উপদেশনাকে উন্নয়ন প্রশাসন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[২]

উন্নয়ন প্রশাসনের ইতিহাস অতি–সাম্প্রতিক কালের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্বাসিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল প্লানের অধীনে এ অঞ্চলে প্রচুর বৈদেশিক সাহায্য প্রদান করে। এ কার্যক্রমের আশাতিরিক্ত সাফল্য উন্নত বিশ্বের অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিবিদদের তৃতীয় বিশ্বের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। মূলত পশ্চিম ইউরোপে বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে অর্থনেতিক উন্নয়নের প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং তৃতীয় বিশ্বকে সমাজতান্ত্রিক শিবির হতে বিচ্ছিন্ন রাখার তাগিদ থেকে উন্নয়ন প্রশাসন ধারণার জন্ম।[৩] কাজেই প্রথম থেকেই উন্নয়ন প্রশাসন উন্নয়ন সম্পর্কিত পাশ্চ্যাত্য ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা এবং কলাকৌশল দ্বারা প্রভাবিত হয়।

প্রথম দিকে পাশ্চাত্যের বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞদেরকে উন্নয়নগামী দেশ সমূহের উপযোগী কোনো পৃথক মডেল ছাড়াই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে পরামর্শ দান, পরিকল্পনা প্রণয়ন অথবা কার্যসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণ করা হয়। তখন তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান পাশ্চাত্যের উন্নয়নের মডেলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই সংগত ভাবেই তাঁরা পাশ্চাত্য যে পন্থা অনুসরণ করে ক্রমানুয়ে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছে ঠিক সেই পন্থা অনুকরণ ও অনুসরণের জন্য তৃতীয় বিশ্বকে উপদেশনা দিতে থাকেন। ধারণা করা হয়, পাশ্চ্যাত্য যে পন্থায় তার ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে ঠিক একই পন্থা অনুসরণ করে তৃতীয় বিশ্বও তাদের অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হবে।[৪]

এ প্রবন্ধে মূলত ঃ

১। উন্নয়নের লক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল উন্নয়ন প্রশাসনের ঐতিহাসিক পটভূমি এবং

২। জন্মলগ্ন থেকে উন্নয়ন প্রশাসনে অনুসৃত পন্থাসমূহ আলোচিত হবে।

১। উন্নয়নের লক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল উন্নয়ন প্রশাসনের এতিহাসিক পটভুমিঃ

উন্নয়ন প্রশাসনের লক্ষ্য আলোচনা করতে হলে আমাদের প্রথমে উন্নয়নের লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে, কেননা উন্নয়নের লক্ষ্যের উপরই উন্নয়ন প্রশাসন বহুলাংশে নির্ভরশীল। দেখা গেছে যুগের শেষে উন্নয়নের লক্ষ্য পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে উন্নয়ন প্রশাসনের কাঠামো এবং কর্মপন্থাও যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উন্নয়নের লক্ষ্যঃ

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে অর্থনীতিবিদগন উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উন্নয়নের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেন এবং জি এন পি বৃদ্ধির বার্ষিক হারকে প্রবৃদ্ধির একমাত্র পরিমাপক হিসেবে গণ্য করেন। তাঁরা ধারণা করেন. সঞ্চয় বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক সাহায্যের সঠিক সংমিশ্রণ ঘটলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোও উন্নত বিশ্বের ন্যায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারবে।[৫]

দ্রুত শিল্পায়নকে এ দুই দশকে উন্নয়নের প্রধান পন্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। শিল্পায়নের জন্য প্রধানত দুটি পথ অবলম্বন করা হয়েছে। এক, সনাতনী কৃষি ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে শিল্প খাতকে উৎসাহিত করার জন্য শিল্পায়নোপযোগী প্রযুক্তি আমদানী করা হয়েছে। এ পন্থাটি অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। দুই, পাশ্চাত্য প্রযুক্তির পরিবর্তে শিল্পায়নের স্বার্থে কৃষি খাতকে কার্যকরী করা হয়েছে, অর্থাৎ শ্রম নির্ভর শিল্প খাত প্রতিষ্ঠা করার জন্য অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।[৬]

এ সময় অর্থনীতিবিদদের ধ্যানধারণা অন্যান্য ক্ষেত্র (যেমন নৃতত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, লোক প্রশাসন) কে প্রভাবিত করে। নৃতত্ববিদগণ সনাতনী মনোভাব ত্যাগ করে জনগণের মধ্যে কর্মস্পৃহা সঞ্চার করার কথা বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন, প্রশাসন বিশেষজ্ঞগণ মেধাভিত্তিক লোক প্রশাসনের উপর অধিক গুরুত্ব দেন, শিল্পখাতে সমাজ বিজ্ঞাণীগণ সমাজের উচ্চবিত্তদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চয় বিনিয়োগ করার জন্য উৎসাহিত করেন।[৭]

পরিকল্পনাবিদ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শিল্পায়নের সাথে সম্পৃক্ত আধুনিকীকরণের দিকে গুরুত্ব আরোপ করেন। পল্লী সমাজের দরিদ্র জনগণের অজ্ঞতা এবং সনাতনী মনোভাবকে আধুনিকীকরণের অন্যতম বাধা হিসেবে ধরে নেয়া হয়। মনে

করা হয় বহির্গত শক্তি এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে পল্লী সমাজে পরিবর্তন আনা সম্ভব। এ ধারণার উপর ভিত্তি করে এ সময় উন্নয়নগামী দেশগুলো রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং সামরিক শাসনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।[৮] অন্যদিকে, প্রবৃদ্ধি মূলক উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে যেহেতু উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রচুর বিনিয়োগ প্রয়োজন ছিল সেহেতু পরিকল্পনাবিদগণ সমতা বা পুর্নবন্টন-এর প্রশ্নগুলো কয়েক যুগের জন্য স্থগিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তারা মনে করেন যুগের শেষে অধিক কর্মসংস্থান, উন্নীত মজুরী, আধুনিকীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে উন্নয়নের সুফল দরিদ্র জনগণের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌছুবে।[৯]

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উন্নয়ন প্রশাসনঃ

উন্নয়ন প্রশাসনে এ সময় স্থানীয় স্বার্থ ও সরকারের চাইতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এ সময় প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দেখা যায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিকল্পিত হওয়ায় প্রশাসকদের আন্তর্জাতিক যোগসূত্র বৃদ্ধি পায়। এ সময় নিজ দেশ থেকে জ্ঞানার্জন এবং জনসাধারণের সাথে সরকারী কর্মকর্তাদের মিথস্ক্রিয়াকে তেমন উৎসাহিত করা হয়নি যার ফরে জনগণ বিশেষত দরিদ্র জনসাধারণ প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যায়।[১০]

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের মডেলের ফলাফল

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিমুলক উন্নয়নের ফলে তৃতীয় বিশ্বে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হওয়া সত্বেও সে সব দেশের দরিদ্রতম ৪০ ভাগ জনসাধারণের দারিদ্র, অনাহার, অপুষ্টি বৃদ্ধি পায়। দেশের অভ্যন্তরে এবং তুলনামূলকভাবে ধনী দেশগুলোর সাথেও অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে[১১]। অর্থাৎ ধনী অধিকতর ধনী এবং দরিদ্র অধিকতর দরিদ্র হতে থাকে।

এ মডেলের ব্যর্থতার জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলোকে দায়ী করা যায় [১২] ঃ-

ক) শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য উদ্বৃত্ত কৃষি খাত ছিল অত্যাবশ্যক। প্যশ্চাত্যে এই মডেল অনুসরণের পূর্বেই ব্যাপক কৃষি বিপ্লব সংঘটনের ফলে উদ্বৃত্ত পুঁজি সংগ্রহ তেমন অসুবিধাজনক ছিল না। কিন্তু উন্নয়নগামী দেশ সমূহে সনাতন কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি পুঁজি নিবিড় শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

খ) পাশ্চাত্যের শিল্প বিকাশে পুঁজিবাদী দেশসমূহ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কলোনীসমূহ থেকে একদিকে সস্তা দরে কাঁচামাল সংগ্রহ করেছেন অন্যদিকে উৎপাদিত পণ্যসমূহের বাজার হিসেবেও কলোনীসমূহকে ব্যবহার করেছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উন্নয়নগামী দেশগুলোর জন্য এ ধরণের কোন সুবিধা ছিল না। বরং নব্য ঔপনিবেশবাদের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্ব কর্তৃক তারা অসম শর্ত এবং প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

গ) পাশ্চাত্যে শিল্প বিকাশের সময় জনসংখ্যার কোন সমস্যা ছিল না বরং উদ্যোগী জনগণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের মত নতুন দেশসমূহের দ্বার উম্মুক্ত ছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্যায়ে অধিকাংশ উন্নয়নগামী দেশে জনসংখ্যার চাপ একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় অথচ তাদের জন্য বিশ্বের আর কোন নতুন দেশের দ্বার খোলা নাই।

সত্তরের দশকে উন্নয়নের লক্ষ্যঃ

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের উন্নয়নের নেতিবাচক অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য সত্তরের দশকে উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণে নতুন চিন্তাধারা প্রবর্তিত হতে থাকে। এ চিন্তাধারায় রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ (Political Economists), Dependency Theorists এবং মানবতাবাদীগণ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদগণ উন্নয়নকে অধিক সামাজিক দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেন। সামাজিক দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁরা সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। দ্বিতীয়তঃ উৎপাদন ও বন্টনকে তাঁরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত দুইটি বিষয় হিসেবে দেখেন[১৩]।

সত্তরের দশকের মধ্যভাগ থেকে অর্থনীতিবিদগণের কাছে প্রমানিত হয় যে উৎপাদনকে ব্যাহত না করেও পুণর্বন্টন সম্ভব। দেখা যায় পুণর্বন্টন বা সামাজিক সমতা বৃদ্ধির পেছনে অর্থনৈতিক সুবিধা রয়েছে। যেমন সমবন্টন নীতি দ্বারা বিনিয়োগের হার বাড়ানো যায়। আবার প্রবৃদ্ধির সাথে শিক্ষা, ভূমি সংস্কার এবং পুণর্বন্টনকারী করের মত ইতিবাচক নীতি গ্রহণ করলে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উভয় লক্ষ্যই অর্জন করা যায়। অর্থনীতিবিদগণ এ সময় আয়ের মাপকাঠিতে জনগণকে শ্রেণী বিভক্ত করে প্রতিটি শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[১৪]

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

Dependency theorists দের প্রধানতঃ দুটি চিন্তাধারায় ভাগ করা যায়। প্রথম চিন্তাধারাকে "'Neocolonial dependence model বলা হয় এবং এ দলের সদস্যরা মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার অনুসারী। তাদের মতে, তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নের মূলে রয়েছে উন্নত এবং অনুন্নত বিশ্বের বৈষম্যমূলক আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী সম্পর্ক; এবং উন্নয়নগামী দেশসমূহে ভূমির মালিক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সামরিক এবং সরকারী কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি সুবিধাবাদী শ্রেণীর এ বৈষম্যমূলক আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সহায়তা প্রদান। দ্বিতীয় চিন্তাধারাকে " The False Paradigm বলা হয়। এ দলের সদস্যদের মতে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নের মূলে রয়েছে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের তৃতীয় বিশ্বের অনুপযোগী এবং ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক পরামর্শ প্রদান।[১৫]

Dependency the orist রা মনে করেন তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়ন হ্রাস করার জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মৌলিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক পুণর্গঠন প্রয়োজন। সর্ব্বোচ্চ ক্ষেত্রে তারা ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তির অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্র মালিকানা পদ্ধতির মাধ্যমে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ, আর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসকরণ এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের স্বপক্ষে মতামত রাখেন।[১৬]

মানবতাবাদীগণ (Humanist views) উন্নয়নের নৈতিক এবং মানবিক দিকের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। Denis Goulet তাঁর বিখ্যাত বই " The Cruel Choice" এ অনুন্নয়ন এবং দারিদ্র্যের ভয়াবহ এবং বিভীষিকাময় চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে উন্নয়ন হচ্ছে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা করার জন্য ক্ষমতা সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়া।[১৭]

অর্থনীতিবিদ মাইকেল টোডারো মানবতাবাদী চিন্তাধারার সাথে একাত্ব হয়ে উন্নয়নের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৮]

১। মানুষের মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, বাসস্থান নিরাপত্তার চাহিদা পূরণ;

২। মানুষের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি;

৩। প্রকৃতি, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও শোষণমূলক ক্রীত দাসত্বের থেকে মুক্তি।

সত্তরের দশকে উন্নয়ন প্রশাসনঃ

সত্তরের দশকে উন্নয়নের নতুন অর্থ উন্মোচিত হওয়ায় প্রশাসনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। উন্নয়নের সুফল জনগণের দ্বার প্রান্তে পৌছে দেয়ার জন্য প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলা হয়। স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য জাতীয় পরিকল্পনার চাইতে স্থানীয় পরিকল্পনাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাছাড়া সুফল বন্টন যেহেতু একটি রাজনৈতিক বিষয় সেহেতু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে আমলাতন্ত্রের জবাবদিহী নিশ্চিত করার কথা বলা হয়।

আশির দশকে উন্নয়নের লক্ষ্যঃ

সত্তরের দশকের সামাজিক ন্যায় বিচার ভিত্তিক উন্নয়ন চিন্তাধারা তৃতীয় বিশ্বকে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক পল্লী উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। দেখা যায়, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কেবল সেবা বিতরণ যথেষ্ট নয়। বরং প্রাথমিক বিনিয়োগ অন্তে উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখার জন্য স্থানীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্ধিত স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা সম্পদ আহরণ ও নিয়ন্ত্রণ করার কথা তখন থেকে চিন্তা করা হয়। কাজেই আশির দশকে উৎপাদন ও বন্টনের সাবলীল প্রবাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ উন্নয়নের একটি অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।[১৯]

বর্তমানে উন্নয়ন বলতে ১। উৎপাদন এবং বন্টন উপযোগী সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, ২। সামাজিক ন্যায় বিচার, ৩। জনগণের হাতে ক্ষমতা অর্পণ ৪। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন এবং ৫। প্রকল্প সমূহের অব্যাহত গতিধারাকে বোঝায়।[২০]

আশির দশকে উন্নয়ন প্রশাসনঃ

এ দশকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (১৯৮৩) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ দান করে। এ রিপোর্টের মতে লোক প্রশাসনের পরিধি সংকোচনের মাধ্যমে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব—কারণ সরকারী প্রতিষ্ঠানের অদক্ষতার মূলে রয়েছে দক্ষ ব্যবস্থাপকের স্বল্পতা, দুর্নীতি, রাজনৈতিক প্রভাব এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের অনুপস্থিতি। কাজেই ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করে

প্রতিযোগিতামূলক বাজার নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার ব্যাপারে এ রিপোর্টে যুক্তি দেখানো হয়েছে।[২১]

উপরোক্ত রিপোর্টে পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের মত অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথাই শুধু বলা হয়েছে, জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। পূর্বের মত ধারণা করা হয়েছে যে, বাজার নির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়ন—অধিক কর্মসংস্থান, উন্নীত মজুরী, এবং সরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করতে সক্ষম হবে।

২। উন্নয়ন প্রশাসনের পন্থাসমূহঃ

উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উন্নয়নগামী দেশগুলো নিম্নলিখিত পন্থাগুলো গ্রহণ করে থাকে। বলাই বাহুল্য যে এ সকল পন্থা পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলো থেকে আমদানীকৃত ব্যবস্থাপনা কৌশল বা পদ্ধতি যা উন্নত দেশসমূহ উন্নয়নগামী দেশ গুলোকে ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকে। উন্নয়নের লক্ষ্য পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে এ সকল পন্থায়ও নতুন চিন্তাধারা প্রবর্তিত হয়েছে।

কর্মী প্রশাসনঃ

মেধা ভিত্তিক লোক প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য বিদেশী পরামর্শদাতা উন্নয়নগামী দেশগুলোকে সব সময়ই পারমর্শ দিয়ে আসছেন। প্রশাসনে দক্ষ কর্মী নিয়োগের জন্য নির্বাচনী পরীক্ষা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ; এবং পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের তুলনায় বর্তমানে উন্নয়নগামী দেশগুলোর প্রশাসনিক কাঠামো ও প্রশিক্ষণকে গণ-মুখী করার বিভিন্ন প্রয়াস নেয়া হয়েছে। তাছাড়া সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরিজীবন পেশা ভিত্তিক ও নিয়মতান্ত্রিক করার জন্য একটি দক্ষ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশাসন সংস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে পরামর্শদাতারা গুরুত্ব আরাপ করেন। এ সংস্থা সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বিধি প্রবিধি তৈরী, তাঁদের বেতনস্কেল, ভাতা, কর্মসংস্থানের মূল্যায়ন, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ করে থাকে। পাশ্চাত্যের আধুনিক প্রশাসনিক চিন্তাধারা এবং স্থানীয় প্রশাসনিক পুনর্গঠনের সাথে একটি সেতু বন্ধন সৃষ্টি করার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ উন্নয়নগামী দেশগুলোকে জাতীয় প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে উৎসাহ দিয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে উচ্চতর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করে, প্রশাসনিক তথ্য সংগ্রহের জাতীয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে, গবেষণা পরিচালনা করে এবং প্রশাসনিক পুনর্গঠনের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে থাকে।[২২]

পরিকল্পনাঃ

পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে বহু বিদেশী বিশেষজ্ঞ উন্নয়নগামী দেশগুলার পরিকল্পনা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষজ্ঞদের একটি দল পাকিস্তানের জাতীয় পরিকল্পনা বোর্ডকে সাহায্য করার জন্য পাকিস্তানে আসেন। তাঁরা পঞ্চ বার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে, সরকারের অর্থনৈতিক ও রাজস্ব নীতি নির্ধারণে ও পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের এ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানে সাহায্য করেন।[২৩]

সাধারণত উন্নয়নগামী দেশগুলোতে জাতীয় পরিকল্পনা বোর্ড পাঁচ ধরণের কাজ করে থাকে যেমনঃ উপাত্ত সংগ্রহ, কর্মসূচী প্রণয়ন, গবেষণা, কর্মসূচী সমূহের সমন্বয় সাধন এবং প্রকাশনা। কর্মসূচী প্রণয়ন পরিকল্পনা বোর্ডের প্রধান কাজ এবং অপর চারটি কাজ কর্মসূচী প্রণয়নে সহযোগিতা করে। বর্তমানে জাতীয় পরিকল্পনা বোর্ডের দীর্ঘ মেয়াদী বহুখাত বিশিষ্ট পরিকল্পনার পরিবর্তে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত পরিকল্পনা দল অধিক প্রাধান্য পাচ্ছে। অর্থনীতিবিদ, প্রকৌশলী, বৈজ্ঞানিক, নৃতত্ত্ববিদ, প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে এ সকল দল গঠিত হয়। তাঁরা মাঠ পর্যায়ে বিশেষতঃ খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ সকল কর্মীদল স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করেন এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় পরিকল্পনা প্রক্রিয়াটির সমন্বয় সাধন করেন।[২৪]

প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ

বর্তমানে অধিকাংশ দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর অধিকাংশ জুড়ে থাকে উন্নয়ন খাতে বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যয়সহ বর্ণনা । উন্নয়নের প্রথম দুই দশকে দাতা দেশসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কৃষি প্রভৃতিতে সাহায্য প্রদান করেছেন। ষাটের দশকে দাতা দেশ সমূহ তাদের অর্থনৈতিক সাহায্যের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। সত্তরের দশকের প্রথম দিকে দেখা যায় দাতাদেশসমূহ প্রকল্প সাহায্য প্রদানে অধিক উৎসাহী হয়ে পড়েন। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের পন্থা পূর্বে নির্ধারিত হয় বলে দাতা দেশগুলা তাদের সাহায্য সম্পর্কে অধিক অবহিত হওয়ার সুযোগ পান।[২৫]

একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের বেশ কয়েকটি স্তর রয়েছে। একত্রিত স্তরগুলোকে প্রকল্প চক্র বলা হয়। প্রকল্প চক্রে ১২ টি স্তর থাকতে পারে যেমনঃ

১। প্রকল্প চিহ্নিত করন ২। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, ৩। প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন, ৪। প্রকল্পের মূল্য নিরূপন, ৫। প্রকল্প বাছাই করন, চুক্তিপুর্ব আলোচনা এবং অনুমোদন, ৬। প্রকল্পকে কার্যকরী করার জন্য সংগঠন স্থাপন, ৭। প্রকল্পের বাস্তবায়ন, ৮। প্রকল্পের তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ, ৯। প্রকল্প সমাপ্তিকরণ, ১০। উৎপাদনের প্রসারণ এবং নিয়মিত প্রশাসনে স্থানান্তরকরন, ১১। প্রকল্প মূল্যায়ন, ১২। পরবর্তী বিনিয়োগের জন্য ফলাবর্তন।[২৬]

উপরোক্ত প্রতিটি স্তরেই সাহায্য দাতা সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ উন্নয়নগামী দেশের সরকারী কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকেন। একটি প্রকল্প অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত একটি সংগঠনকে দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রয়োজন বোধে প্রকল্প বাস্তবায়বেনর জন্য নতুন ইউনিট স্থাপন করা হয়। মূলতঃ প্রত্যেক প্রকল্পের জন্য একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়ে থাকে যিনি বিশেষজ্ঞ, সম্পদ সরবরাহকারী এবং নীতি নির্ধারকদের সাথে সমন্বয় সাধন করেন।

বিকেন্দ্রীকরণঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সত্তরের দশকে উন্নয়নের লক্ষ্য হিসাবে মৌলিক চাহিদা পুরণের বিষয়টি সংযোজিত হওয়ার পর থেকে উন্নয়ন কর্মসূচী এবং প্রকল্প বাস্তবায়বের জন্য নতুন পন্থা উদ্ভাবনের চিন্তা করা হয়। দেখা যায়, দরিদ্র জনগণের উন্নয়ন সাধনের জন্য পরিবর্তনযোগ্য, নমনীয় এবং জনগণের কাছে দায়ী প্রশাসন প্রয়োজন। সুতরাং জনগণের মৌলিক চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলা হয়। বিকেন্দ্রীকরণের প্রকারভেদ রয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সংস্থাকে দায়িত্ব অর্পন করতে গেলে যে ধরণের সাংগঠনিক কাঠামো, ক্ষমতা হস্তান্তর এবং জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন হবে, স্থানীয় সরকার বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব অর্পণ করতে গেলে ক্ষমতা হস্তান্তর, সাংগঠনিক কাঠামো এবং জনগণের অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া ভিন্নতর হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, "শুধু বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রশাসনে জনগণের অংশ গ্রহণের প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামো এবং সমাজের ক্ষমতাবানদের দায়িত্বহীনতার সমস্যা শুধু বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দূর হবে না। তবে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের

সমন্বয় সাধন করা, উন্নয়ন কার্যক্রমকে অধিকতর স্থানীয় সমস্যা ও প্রয়োজন উপযোগী করা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধিক নমনীয়তা আনা সম্ভব হবে।"[২৭]

পল্লী উন্নয়ন ঃ

একটি দেশের প্রশাসনের সর্বনিম্ন পর্যায়ের স্থানীয় কর্মকর্তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নের দক্ষতা ও পরিবেশের উপর সেই দেশের জাতীয় উন্নয়ন নীতির সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। ইদানিং দেখা যাচ্ছে উন্নয়নগামী দেশগুলোর পল্লী অঞ্চলে সেবা বিতরণের জন্য দাতা সংস্থগুলো স্থানীয় সরকারের চেয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (NGO) গুলোকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তৃতীয় বিশ্বে প্রবৃদ্ধি মুখী উন্নয়ন পুঁজিপতি তৈরী করেছে কিন্তু তা সামগ্রিক উন্নয়ন কিংবা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটায়নি, কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি করেনি, দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদি। দেশে নৈরাজ্য ও স্থিতিহীনতা সৃষ্টির ফলাফল পরিস্কার হবার পর বিশ্ব পুঁজিবাদী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থেকে দারিদ্র্য নিরসন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি কল্পে নানা মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ পথ ধরেই এসেছে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, বেসিক নিড এ্যাপ্রোচ ইত্যাদি মডেল যার প্রতিটির সংগেই বিশ্বব্যাংক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা পরিমণ্ডলের ওঁতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশে এসব মডেলের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই একে একে জন্ম নিয়েছে কুমিল্লা মডেল, স্বনির্ভর কর্মসূচী, সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী এবং সর্বশেষে এন, জি, ও মডেল। উক্ত মডেলগুলো ছাড়াও স্থানীয় সরকারগুলোকে উন্নয়নমুখী করার জন্য সেগুলোকে পূর্নগঠিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উপজেলা পরিষদকে স্থানীয় সরকার উন্নয়নের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

জনগণের অংশগ্রহণঃ

বিকেন্দ্রীকরণের ও পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত উন্নয়ন প্রশাসনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য পন্থা হচ্ছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরন। একটি উন্নয়নগামী দেশের জনগণ যতদিন না নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের ব্যাপারে সচেতন হবে ততদিন পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ, পল্লী উন্নয়ন অথবা অন্য কোন পন্থায় উন্নয়ন আশা করা যায় না।"বর্তমানে উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরনে সরকারী প্রতিষ্ঠানের চাইতে বেসরকারী প্রীতষ্ঠানগুলোকে অধিক কার্যকরী মনে করা হচ্ছে।"[২৮] তারা দরিদ্রতম

সমন্বয় সাধন করা, উন্নয়ন কার্যক্রমকে অধিকতর স্থানীয় সমস্যা ও প্রয়োজন উপযোগী করা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধিক নমনীয়তা আনা সম্ভব হবে।" [২৭]

পল্লী উন্নয়ন ঃ

একটি দেশের প্রশাসনের সর্বনিম্ন পর্যায়ের স্থানীয় কর্মকর্তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নের দক্ষতা ও পরিবেশের উপর সেই দেশের জাতীয় উন্নয়ন নীতির সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। ইদানিং দেখা যাচ্ছে উন্নয়নগামী দেশগুলোর পল্লী অঞ্চলে সেবা বিতরণের জন্য দাতা সংস্থগুলো স্থানীয় সরকারের চেয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (NGO) গুলোকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তৃতীয় বিশ্বে প্রবৃদ্ধি মুখী উন্নয়ন পুঁজিপতি তৈরী করেছে কিন্তু তা সামগ্রিক উন্নয়ন কিংবা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটায়নি, কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি করেনি, দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদি। দেশে নৈরাজ্য ও স্থিতিহীনতা সৃষ্টির ফলাফল পরিস্কার হবার পর বিশ্ব পুঁজিবাদী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থেকে দারিদ্র্য নিরসন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি কল্পে নানা মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ পথ ধরেই এসেছে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, বেসিক নিড এ্যাপ্রোচ ইত্যাদি মডেল যার প্রতিটির সংগেই বিশ্বব্যাংক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা পরিমণ্ডলের ওঁতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশে এসব মডেলের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই একে একে জন্ম নিয়েছে কুমিল্লা মডেল, স্বনির্ভর কর্মসূচী, সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী এবং সর্বশেষে এন, জি, ও মডেল। উক্ত মডেলগুলো ছাড়াও স্থানীয় সরকারগুলোকে উন্নয়নমুখী করার জন্য সেগুলোকে পূর্নগঠিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উপজেলা পরিষদকে স্থানীয় সরকার উন্নয়নের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

জনগণের অংশগ্রহণঃ

বিকেন্দ্রীকরণের ও পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত উন্নয়ন প্রশাসনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য পন্থা হচ্ছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরন। একটি উন্নয়নগামী দেশের জনগণ যতদিন না নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের ব্যাপারে সচেতন হবে ততদিন পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ, পল্লী উন্নয়ন অথবা অন্য কোন পন্থায় উন্নয়ন আশা করা যায় না।"বর্তমানে উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরনে সরকারী প্রতিষ্ঠানের চাইতে বেসরকারী প্রীতষ্ঠানগুলোকে অধিক কার্যকরী মনে করা হচ্ছে।" [২৮] তারা দরিদ্রতম

জ) প্রতিষ্ঠান নির্মাণঃ

সংগঠনের কার্যক্রমকে সমর্থন করার জন্য কোন সংগঠন যদি একটি সহযোগিতামুলক পরিবেশ ও জনসমর্থন সৃষ্টিতে সমর্থ হয়— তবেই প্রাতিষ্ঠানিক জীবন অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা হয়। প্রতিষ্ঠান নির্মানের জন্য সংগঠনের নেতাদের প্রয়োজনে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শ্রমনেতা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনসাধারণের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। উপরন্তু প্রতিষ্ঠান নির্মাতাদের আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।[৩১]

আশির দশক থেকে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ বলতে শুধু আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি বোঝায় না। তখন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা নির্মাণ বলতে স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্ধিত স্থানীয় প্রশাসনিক ক্ষমতাকেও বোঝায়।

ঝ) রাজনৈতিক সমর্থন সৃষ্টিঃ

সকল প্রশাসনিক পুর্ণগঠনের জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক সমর্থন অতি প্রয়োজন। উন্নয়নগামী দেশ সমূহের সরকারকে প্রশাসনিক পুর্নগঠন সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞরা রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের জন্য সেমিনার আয়োজন করেন, কারিগরী সাহায্য দানের পুর্বে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেন, কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মসূচী সংক্রান্ত আইনের খসড়া প্রণয়নে সহায়তা করেন।[৩২]

ঞ) আর্থ ব্যবস্থাপনাঃ

সীমিত সম্পদের কারণে উন্নয়নগামী দেশগুলোর আর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনায় যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় উন্নয়গামী দেশ সমূহে কেন্দ্রীয় বাজেট অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজস্ব সংগ্রহের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। রাজস্ব নিরূপনে উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাজস্ব বন্টনে নতুন পদ্ধতি যেমন "রেভেন্যু শেয়ারিং" পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। উপরন্তু বৈদেশিক বিশেষজ্ঞরা বাজেটের ক্ষেত্রে কর্মসূচী বাজেট বা প্রোগ্রাম বাজেটিং, প্রকল্পের মুল্য নিরূপনের ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি যেমন "Cost Benefit Analysis" প্রভৃতি প্রবর্তন করেছেন।[৩৩] সমালোচকরা এ সকল পদ্ধতি উন্নয়নগামী দেশে কতটুকু কার্যকরী হচ্ছে সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদদের যেখানে প্রকল্পের মূল্য নিরূপন এবং কর্মসূচীর সাফল্য

গণনায় অসুবিধা হয়, সেখানে উন্নয়গামী দেশসমূহে তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে এ সকল পদ্ধতি কতটুকু কার্যকরী হবে?

উপসংহারঃ

উপরে বর্ণিত উন্নয়ন কৌশলগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন একটি দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। সে কারণে সকল দেশের জন্য" একটি সঠিক কৌশল" বা মানদণ্ড" নির্দিষ্ট করা উচিৎ নয়। একটি দেশের জন্য সঠিক বা উপযুক্ত কৌশল সেই দেশের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে।

তথ্য নির্দেশিকা

১। Michael P. Todaro, **Economic Development in the Third World,** 3rd edition (New York and London: Longman, 1985) p. 85

২। R. K Hope, **The Dymanics of Development and Development Administration** (Westport Conn: Green wood Prees , 1984) p.65

৩। এ, টি, এম, শামসুল হুদা, "উন্নয়ন প্রশাসন লক্ষ্য ও পন্থা" (Mimeo) ১৯৮৬, পৃঃ ২–৩।

৪। Todaro, **opcit.**, p. 63

৫ Coralie Bryant and Louise G. White, **Managing Development in the Third world** (Boulder, Colorado: Westview Press, 1982) p.5.

৭। ঐ। পৃঃ ৬।

৮। ঐ।

২৫। দেখুন, Elliot R, Morss, " Institutional Destruction Resulting from Donor and project proliferation in sub- saharan African Countries" **World Development** Vol. 12. No. 4 (Great Britain: Pergamon Press Ltd, 1984) pp. 465-470.

২৬। দেখুন, Dennis A, Rondinelli, **Development projects as Policy Experiments: An Adaptive Approach to Development Administration** (New York and London: Methuen and company, Methuen and company, 1983) pp. 1-23.

২৭। David Fashole Luke," Trends in Development Administration: The continuing challenge to the efficacy of the post colonial state in the Third World" **Public Administration and Development,** Vol. 6. No. 1 (New York John Wiley and Sons Ltd, 1986). pp 78-79.

২৮। ঐ, পৃঃ ৭৯। দেখুন, আনু মোহাম্মদ, বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্কইট ও এনজিও মডেল (ঢাকাঃ প্রচিন্তা প্রকাশনা, ১৯৮৮) পৃঃ ১–২৫

২৯। Akbar Ali Khan, " Decentralization for Rural Development in Bangladesh" **Bangladesh Journal of Public Administration** VoL III. No. 1. (Savar: BPATC, Jan. 1989) p.18.

৩০। দেখুন, ঐ। পৃঃ ৭–১৯।

৩১। Mc Curdy, **opcit** ., pp 310-311

৩২। ঐ। পৃঃ ৩১১–৩১২।

৩৩। ঐ। পৃঃ ৩১২।

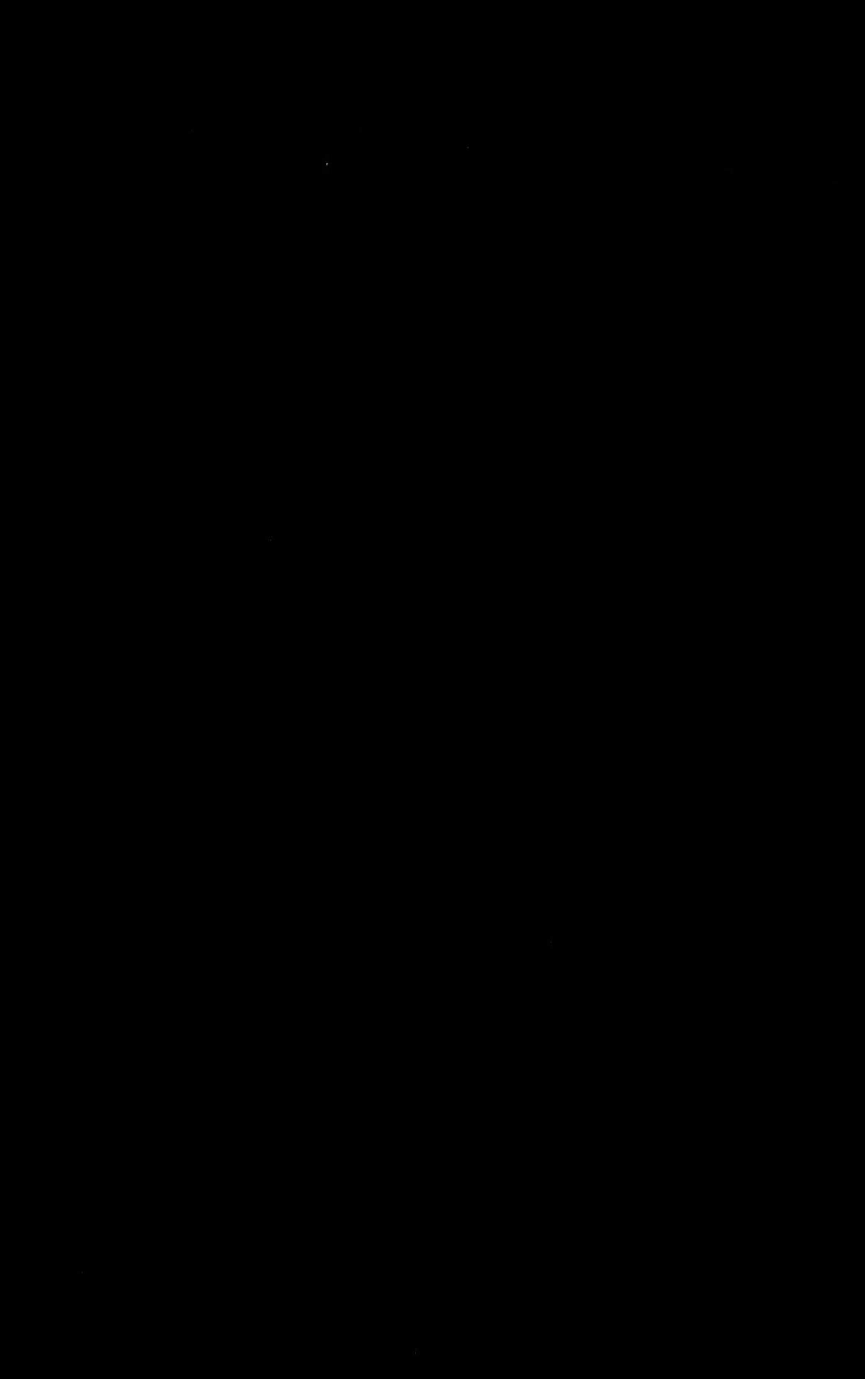

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত পূণর্বিন্যাসে বাণিজ্যনীতির ভূমিকা

—এস, এম, আলী আক্কাস

১. সূচনাঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন দিকে কাঠামোগত অসংবদ্ধতা রয়েছে। এই অসংবদ্ধতা যেমন আমাদের অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ কাঠামো ক্ষেত্রে (যথা সরকারী-বেসরকারীসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও কর ব্যবস্থায়) বিরাজমান, তেমনি তা বহিঃস্থ তথা আন্তর্জাতিক লেনদেন পর্যায়েও সুস্পষ্ট। অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অর্থনীতির বহু অভ্যন্তরীণ অসংবদ্ধতাই প্রকারান্তরে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতায় পর্যবসিত হয়। বাংলাদেশ তার অভ্যুদয়ের পর থেকেই এই আন্তর্জাতিক লেনদেন ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতায় ভুগছে। এ প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন আই, এম, এফ, এবং বিশ্বব্যাংক তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশকেও তার অর্থনীতির কাঠামোগত বিন্যাসের (Shuctural adjustment) জন্য পরামর্শ দিয়ে আসছে। বাংলাদেশ এসব পরামর্শের কতটা গ্রহণ করেছে এবং তদনুযায়ী দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে কাঠামোগত পুণর্বিন্যাসের জন্য কোন নীতি গ্রহণ করেছে কিনা এবং গ্রহণ করে থাকলে তার ফলাফল কি – এসব বিষয় বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষভাবে আলোচনার দাবী রাখে। তবে এ প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক লেনদেনের চলতি হিসাবে ভারসাম্য আনয়নে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গী কি এবং অনুসৃত বাণিজ্যনীতির সাথে তার সম্পর্ক কি, তা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হবো। আরো নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, বাংলাদেশ তার আন্তর্জাতিক লেনদেনের কারেন্ট একাউন্টে ক্রমাগত যে ঘাটতির সম্মুখীন তাতে শৃংখলা বিধানের জন্য তার আমদানি রপ্তানি নীতিকে কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে।

বিষয়টির গভীরে যাওয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত শব্দ গুলোর সজ্ঞা প্রদান আবশ্যকঃ-

(ক) কাঠামোগত বিন্যাস (খ) লেনদেন ভারসাম্য (গ) লেনদেনের চলতি হিসাব ও (ঘ) বাণিজ্যনীতি।

২. কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গাঃ

ক। **কাঠামোগত বিন্যাস ঃ** এটি— আই, এম, এফ ও বিশ্বব্যাংক প্রবর্তিত প্রত্যয় বা ধারণা। বৈদেশিক দায়গ্রস্থ কোন দেশ প্রতিকূল বহির্দেশীয় পরিস্থিতির শিকার হয়ে স্বীয় অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কারের উদ্দেশ্যে যখন ভোগ প্যাটার্ণ, সম্পদের পূণঃবরাদ্দকরণ এবং উপকরণ সন্নিবেশ ধারার পরিবর্তন আনে তখন তাকে কাঠামোগত বিন্যাস বলা হয়।

খ। **লেনদেন ভারসাম্য ঃ** প্রত্যেক দেশ অন্যান্য দেশের সাথে পরিচালিত লেনদেনের বেলায় তার হিসাব যে বিশেষ ব্যালেন্স সীট এর আকারে রাখে তাকে লেনদেনের ভারসাম্য বলে।

গ। **লেনদেনের চলতি হিসাবঃ** এটি লেনদেন ভারসাম্যেরই প্রথম ভাগ যাতে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত দৈনন্দিন লেনদেনের ক্ষেত্রে একটি দেশের উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি প্রদর্শন করে । এটি বৈদেশিক বাণিজ্যে সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য দ্রব্য/ সেবা লেনদেনের দৈনন্দিন হিসাব–(এই হিসাব ব্যালেন্স সীট আকারেও রক্ষিত হয়)।

ঘ। **বাণিজ্যনীতিঃ** আমদানি ও রপ্তানি নীতির সমষ্টি। বাণিজ্যনীতি বলতে এ প্রবন্ধে বাংলাদেসের বাণিজ্যনীতির কথাই বলা হয়েছে।

৩. কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসঃ আন্তর্জাতিক আর্থ-সংস্থা ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিতঃ

৩.১ কাঠামোগত পূণর্বিন্যাস- বিশ্বব্যাংক যেভাবে দেখেঃ

আগেই বলা হয়েছে যে, অর্থনীতিতে কাঠামোগত পূণর্বিন্যাসের ধারণাটি বিশ্বব্যাংক ও আই, এম, এফ,–এর উদ্ভাবিত। ঋণ দায়গ্রস্থ দেশগুলির প্রতিকূল বৈদেশিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবেলায় তাদের অর্থনীতিতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হলে কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত–এ সম্পর্কিত পরামর্শের সমষ্টিকেই এক অর্থে কাঠামোগত পূণর্বিন্যাস বলা যায়। ধারণাটি বিশ্বব্যাংক বা আই, এম, এফ,–এর উদ্ভাবিত বা তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে উক্ত দু'টি প্রতিষ্ঠান দায়গ্রস্থ দেশগুলির আন্তর্জাতিক লেনদেনের চলতি হিসেবে কোন মারাত্মক সমস্যা দেখা দিলে তা কাটিয়ে উঠার জন্য ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে কতিপয় শর্তের বিনিময়ে। এসব শর্ত সংশ্লিষ্ট অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কারের সাথে সম্পর্কিত। তাই এখন দেখা দরকার অর্থনীতির কাঠামোগত পূণর্বিন্যাস বলতে বিশ্বব্যাংক বা আই, এম, এফ, কি বুঝাতে চায়।

৩.১১ পুণর্বিন্যাস ঃ কাঠামোগত পুণর্বিন্যাস ঃ মারাত্মক প্রতিকূল বৈদেশিক পরিস্থিতিতেও একটি স্থায়ী প্রবৃদ্ধি কার্যকর রাখার প্রচেষ্টায় ভোগ প্যাটার্ণের পরিবর্তন, সম্পদের পুণর্বরাদ্দকরণ এবং অর্থনীতির উপকরণ সমাবেশ ধারায় পরিবর্তন আণয়ন প্রচেষ্টার নাম কাঠামোগত পুণর্বিন্যাস। এই পুণর্বিন্যাস সাধনের তাৎক্ষনিক পদক্ষেপ হলো, লেনদেনের চলতি একাউন্টের উন্নতি এবং ব্যয়ের মাত্রা এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে আসা যাতে স্বল্পমেয়াদী উৎপাদন–লোকসান সর্বনিম্ন হয় এবং অর্থনীতি পুনরায় প্রবৃদ্ধি অর্জনের সামর্থ নিশ্চিত করতে পারে।

চলতি হিসাবের (কারেন্ট একাউন্ট) অবস্থার উন্নতি "সার্বিক ব্যয় সংকোচন" এবং "স্বল্প ব্যয় পরিগ্রহণ নীতি" অনুসরণের মাধ্যমে সম্ভব হতে পারে। স্বল্প ব্যয় পরিগ্রহণ বা সার্বিক ব্যয় সংকোচন নীতির বাস্তবায়ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যাধীন পণ্যের অভ্যন্তরীণ ভোগ কমিয়ে এবং বহির্ভূত পণ্যের মূল্যের পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভব। উভয় নীতির উদ্দেশ্যই হলো আমদানি সংকোচন ও রপ্তানি বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ভারসাম্যের উন্নতি। কিন্তু, কৌশল দুটির কার্যকারিতা সময়ের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। পুণর্বিন্যাসের কার্যক্রম বিলম্বিত হলে অর্থাৎ বৈদেশিক ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হওয়ার মত চূড়ান্ত অবস্থার উদ্রেক হলে লেনদেনের চলতি হিসাবের ঘাটতি কমানোর জন্য কোন স্বাভাবিক পথ খোলা থাকে না। এমতাবস্থায়, পুণর্বিন্যাস ক্রিয়াকর্মের বেশীর ভাগই ব্যয় সংকোচন নীতির ন্যায় রূঢ় পদক্ষেপের আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ, স্বল্প ব্যয় পরিগ্রহণ নীতির সুফল পেতে দীর্ঘ সময় লাগে। ব্যয় সংকোচন নীতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যাধীন পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনমাত্রা ব্যাহত করে না। বরং তা প্রভাব ফেলে এসব পণ্যের রপ্তানি ও আমদানি মাত্রার উপর। অন্য কথায় বাণিজ্যিক ভারসাম্যের উপর। অপর পক্ষে, এ নীতির প্রয়োগের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বহির্ভূত পণ্যোৎপাদন খাতের মূল্য ও মজুরী অপরিবর্তনশীল হলে শ্রম ও মূলধন বাণিজ্যাধীন খাতে পুণস্থাপিত না হয়ে বরং স্বল্পকালের জন্য হলেও বেকার হয়ে পড়ে। সুতরাং লেনদেন ভারসাম্যের উন্নতির বিষয়টি বাণিজ্য বহির্ভূত পণ্য উৎপাদন হ্রাস ও বেকারত্ব সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত।

ব্যয়–সংকোচন নীতির এরূপ সম্ভাব্য মারাত্মক পরিণতির প্রেক্ষাপটে সকল দেশেরই উচিত সমস্যার শুরুতেই স্বল্প–ব্যয় পরিগ্রহণ নীতির পরিকল্পিত বাস্তবায়ন যাতে উত্তরণকালে অন্ততঃ স্বল্পতম বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নিশ্চিত করে। সময় থাকতে স্বল্প ব্যয় পরিগ্রহণনীতির বাস্তবায়ন তাই একটি দেশকে বৈদেশিক কম উৎপাদন ঘাটতির সম্মুখীন হয়ে একটি সহজ পুণর্বিন্যাস কর্মসূচী গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

কাঠামোগত পুণর্বিন্যাস কর্মসূচীর দুটো প্রধান দিক আছে বলে বিশ্বব্যাংক মনে করে। **এক**, রাষ্ট্রীয়খাতের পরিধি ও তৎপরতার যৌক্তিকরণ এবং **দুই**, বেসরকারী খাতের জন্য উৎসাহ কাঠামোর (Incetive structure) উন্নতিবিধান। এ দুটো দিকই চূড়ান্ত বিবেচনায় কোন না কোনভাবে লেনদেনের চলতি হিসাব বা বাণিজ্যিক ভারসাম্যের সাথে জড়িত। বিষয় দুটির বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

৩.১২ সরকারী খাতঃ অনেক দেশেই সরকারী খাতের ঘাটতি সার্বিক সরকারী ঘাটতির একটি বিরাট অংশ দখল করে আছে। অর্থনীতির কাঠামোগত পূণর্বিন্যাস বা সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সরকারী খাতের বিপুল ঘাটতির বর্তমান পরিসর ও কারণ কতটা যুক্তিসিদ্ধ তা মুল্যায়ন করে দেখা । যদি দেখা যায়, ভোগ্যপণ্যের ভর্তুকি প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত পণ্য মূল্যই সরকারী ঘাটতির কারণ, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কেন এই নির্দিষ্ট শ্রেণীর ভোক্তার জন্য এই ভর্তুকি ? তারা কি সমাজের সব চাইতে দরিদ্রতম শ্রেণী ? এটাই কি দরিদ্রতম শ্রেণীর কাছে আয় পৌছানের সর্বোত্তম উপায় ?

সরকারী খাতে ঘাটতির অপর একটি কারণ সম্পদ ব্যবহারে অদক্ষতা। অদক্ষতার উদ্ভব ব্যবস্থাপনাকারীর জওয়াবদিহীর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার জন্য হতে পারে অথবা এমন ধারণা থেকেও উদ্ভব হতে পারে যে, ঘাটতি বা লোকসান তো সরকার কর্তৃকই মিটানো হবে।

জন-উপযোগ বিবেচনায় একচেটিয়া কারবার ঠেকানোর জন্য সরকারী মালিকানা যুক্তিসিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্যের বেলায় তা মোটেই গ্রহণীয় নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, অনেক উন্নয়নশীল দেশে সরকারী সঞ্চয় এবং সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সরকারী খাতের পরিধি ও তৎপরতা পূণর্মূল্যায়ণ করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

৩.১৩ বেসরকারী খাতকে উৎসাহ প্রদানঃ বেসরকারী খাতে উৎসাহ প্রদানের নীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক ও আই, এম, এফ, "ট্রান্সপারেন্ট" এবং "অটমেটিক" এই দুই ধারণার ব্যবহার করতে আগ্রহী। উৎসাহ প্রদান নীতির এ বৈশিষ্ট্য দুটির মূল কথা হলো, সমজাতীয় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উৎপাদক কোন ক্রমেই বৈষম্যমূলক বা আলাদা ভাবে আচরণ পাবেন না। সকল ধরণের পরিমানগত বিধিনিষেধ এবং পরিমানগত বরাদ্দ বৈষম্যমূলক আচরণের সামিল। উদাহরণ স্বরূপ বিনিয়োগ লাইসেন্স ও বিধি নিষেধ, আমদানী লাইসেন্স এবং বৈদেশিক মুদ্রার পরিমানগত বরাদ্দ, রপ্তানী লাইসেন্স ইত্যাদির

কথা উল্লেখ করা যায়। এধরণের নিয়ন্ত্রণ স্বেচ্ছাচারী স্বভাবের। সুতরাং উৎসাহ কাঠামো সংস্কারের প্রথম ধাপ হলো, সকল ধরণের পরিমাণগত নিয়মানুগ ও বরাদ্দ তুলে দিয়ে মূল্য, কর, ট্যারিফ ও ভতুর্কির ভিত্তিতে নতুন উৎসাহ কাঠামো গড়ে তোলা। এ পর্যায়ে বাণিজ্য নীতিতে নিম্নোক্ত সংস্কার সাধনের প্রয়োজন রয়েছে।

৩.১৪ বাণিজ্য নীতিতে সংস্কারঃ প্রায় সকল দেশেই কৃষি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং উভয়ে মিলে যে পণ্য উৎপাদন করে তা রপ্তানি হয় এবং আমদানি বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব দেশের অনেকগুলিতে অনুসৃত বাণিজ্যনীতি বিদেশী ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা, ট্যারিফ ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় আমদানি বিকল্প ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যকে বৈষম্যমূলকভাবে সহায়তা প্রদান করে। অথচ কৃষি এসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এমতাবস্থায় সংস্কারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এমন একটি পক্ষপাতহীন উৎসাহ পদ্ধতি গড়ে তোলা যাতে উভয়ের মধ্যে একটি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ব ব্যাংক বা আই, এম, এফ, মনে করে এরূপ পক্ষপাতহীন নীতি গ্রহণ করলে ঐসব অর্থনৈতিক কার্যাবলী উৎসাহিত হবে যা দ্বারা স্বল্প ব্যয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বা সঞ্চয় করা সম্ভব হবে। উপরোক্ত নীতির সারকথা এই যে, একটি উন্নত বাণিজ্য নীতির উদ্দেশ্য কেবল মাত্র রপ্তানী বৃদ্ধিই হওয়া উচিত নয়।

বাণিজ্য নীতির পক্ষপাতহীনতার একটি বড় ধরণের তাৎপর্য ধরা পড়ে যখন পূণর্বিন্যাসের অস্ত্র হিসেবে স্বল্প ব্যয় পরিগ্রহণ নীতিকে বেছে নেয়া সম্ভব হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যাধীন পণ্যের দক্ষ খাতকে সম্প্রসারিত করার মাধ্যমেই সঠিক স্বল্প ব্যয় পরিগ্রহণ নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব।"একটি সর্বোত্তম রপ্তানি ও আমদানি বিকল্পনের সম্প্রসারণ যৌগ"(The best mix of exports and expansion of imports substitutes) তখনই অর্জিত হতে পারে যখন বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয় পরিগ্রহ নীতি কার্যকরী করা হয়। আমদানির উপর অতিরিক্ত ট্যারিফ বা পরিমানগত বিধিনিষেধ অদক্ষ– এটা অনেকে মনে করেন। এবং তাঁদের মতে এই অদক্ষতা– জনিত অপব্যয় দ্বারা সংশ্লিষ্ট খাতে কাঠামোগত পূণর্বিন্যাস করা যেত। মারাত্মক প্রতিকূল বৈদেশিক পরিস্থিতিতে ভোগ্য পণ্যের উপর করারোপের মাধ্যমে সম্পদ পূণর্বন্টনের বেলায় সবচাইতে সঠিক পদক্ষেপ হলো আমদানিকৃত অথবা অভ্যন্তরীণ ভাবে উৎপাদিত পণ্য নির্বিশেষে ভোগকর আরোপ করা।

উপরোক্ত কাঠামোগত পূণর্বিন্যাসের সাধারণ আলোচনায় বিশ্বব্যাংক ও আই, এম, এফ, এর দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে।[২] এর সারসংক্ষেপ করলে দাঁড়ায়, লেনদেনের

চলতি হিসাবের উন্নতি করতে হলে ব্যয় সংকোচন নীতি ও স্বল্প ব্যয় পরিগ্রহ নীতি (General expenditure reduction and expenditur switching policies) গ্রহণ করা যেতে পারে। নাজুক পরিস্থিতিতে অবস্থার তাৎক্ষণিক উন্নতির জন্য ব্যয় সংকোচন (বা ব্যয়-কর্তন) নীতি গ্রহণই শ্রেয়। এজন্য আমদানি ব্যয় কমিয়ে বাণিজ্য ঘাটতি সংকুচিত করতে হবে। এতে উৎপাদন পড়ে যাওয়া এবং কর্মসংস্থান পরিস্থিতির অবণতি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে থাকেলে স্বল্প ব্যয় পরিগ্রহণ নীতির বাস্তবায়ন বেশী সুফলদায়ক। দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক লেনদেনের চলতি হিসাবের অবণতির পিছনে সরকারী ঘাটতির কারণ প্রবল হলে সরকারী খাতের পরিধি ও তৎপরতা পূর্ণমূল্যায়ন করে দেখতে হবে। প্রয়োজনে ভর্তুকি প্রত্যাহার, অলাভজনক সরকারী প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়ার দরকার রয়েছে। তৃতীয়তঃ বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের উৎসাহ কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এজন্য বাণিজ্য নীতিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে হবে। পক্ষপাতযুক্ত পরিমানগত নিয়ন্ত্রণের স্থলে সাধারণভাবে মূল্য,কর, ট্যারিফ ইত্যাদির ভিত্তিতে নতুন উৎসাহ কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। চলতি বাণিজ্য নীতিতে যন্ত্রযোগে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য (Manufactured product) যে সব সুযোগ পায়, তার রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়, কৃষি পণ্য সে সুযোগ পায় না। উভয় পণ্যকে একই মানদণ্ডে বিচার করতে হবে, সর্বোপরি, সার্বিক নীতিমালায় বাজার অর্থনীতির উপর জোর দিতে হবে, যা চূড়ান্ত বিবেচনায় অর্থনৈতিক এবং ন্যায় নীতির পরিচায়ক।

৪. কাঠামোগত বিন্যাস ও বাংলাদেশের বাণিজ্যনীতি

এপর্যন্ত আলোচনায় এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, বিষয় হিসেবে কাঠামোগত বিন্যাস খুবই ব্যাপক ও যার সাথে একটি অর্থনীতির বহুবিধ খাত ও অর্থনৈতিক নীতি সমূহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। এ সকল অসংখ্য খাত ও নীতির মধ্যে বাণিজ্য নীতির ভূমিকা চিহ্নিত করাই এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। একটি অর্থনীতির প্রকৃত ভারসাম্যহীনতা তার আন্তর্জাতিক লেনদেনের চলতি হিসাবে ধরা পড়ে। আমদানি এবং রপ্তানি সেই চলতি হিসাবের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অন্য কথায় লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যের সিংহভাগই বণিজ্যিক ভারসাম্যের ফলশ্রুতি। তাই চলতি হিসাবের ভারসাম্যের উন্নতির সাথে বাণিজ্যনীতি তথা আমদানি রপ্তানী নীতির সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে।

৪.২ বাংলাদেশ তার অর্থনীতির কাঠামোগত বিন্যাস সাধনের জন্য আই, এম, এফ ও বিশ্বব্যাংকের অপরাপর পরামর্শ (যেমন সরকারী খাতের ভূমিকা সীমিত করে ব্যয় সাশ্রয়, ভর্তুকি পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা) বাস্তবায়ন করলেও বাণিজ্য নীতির বেলায় তার প্রয়োগ একটু ভিন্নধর্মী। বাংলাদেশ তার আন্তর্জাতিক লেনদেনের চলতি হিসাবে বিপুল ঘাটতি সত্ত্বেও আমদানি কমায়নি। বরং লেনদেন ভারসাম্যের উন্নতির জন্য রপ্তানি বৃদ্ধির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। **(সারণী-১ দ্রষ্টব্য)**। উদ্দেশ্য, আমদানি বৃদ্ধির চাইতে রপ্তানি বৃদ্ধি দ্রুততর করে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা যাতে লেনদেনের চলতি হিসাবের উপর স্বাভাবিক ভাবেই অনুকূল প্রভাব ফেলা যায়। বাংলাদেশ ১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত যে সকল আমদানি ও রপ্তানি নীতি ঘোষণা করেছে, তাতে কোন বছরেই তার লেনদেন ভারসাম্যের উন্নতির সাথে আমদানি নীতিকে সম্পৃক্ত করা হয় নাই। লেনদেনের চলতি হিসাবের ঘাটতি কমিয়ে আনার সাথে রপ্তানি নীতির একটা যোগসূত্র থাকলেও তা ততটা গুরুত্ব সহকারে নেয়া হয়েছে বলে মনে হয় না।[৩] কারণ ৮০ এর দশকের প্রথম তিন বছরে লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যহীনতা কাটানোর লক্ষ্যে রপ্তানী নীতিতে কোন কিছুই বলা হয়নি। ১৯৮৩-৮৪ থেকে ১৯৮৭-৮৮ পর্যন্ত গৃহীত রপ্তানী নীতিতে বিষয়টির উল্লেখ দেখা যায়। ১৯৮৮-৮৯ সালে তা আবার রপ্তানি নীতি তালিকা থেকে বাদ পড়ে। ১৯৮৯-৯১ এর দ্বিবার্ষিক রপ্তানী নীতিতে এটির পূণঃ সংযোজন হয়।

৪.৩ বাস্তবে উপরোক্ত নীতির প্রয়োগ কতটা হয়েছে তা সারণী-২ বিশ্লেষণ করলেই পরিস্কার হবে। এতে দেখা যায় ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৭-৮৮ পর্যন্ত আমদানি বেড়েছে গড়ে বছরে ২.৫% (খাদ্য ছাড়া)। অপর পক্ষে রপ্তানি আয় বেড়েছে প্রকৃত মূল্যে গড়ে বছরে ৬.৮%।

৪.৪ মনে রাখা আবশ্যক যে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয় তার রপ্তানি আয়ের আড়াই গুণেরও বেশী (১৯৮৭-৮৮)। এমতাবস্থায় রাপ্তানি বৃদ্ধির হার আমদানি বৃদ্ধি হারের চাইতে বেশী হলেও প্রকৃত অর্থে তা লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যে অনুকূল প্রভাব রাখছে কিনা তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। অন্য কথায় অনুসৃত বাণিজ্য নীতি প্রকৃতই লেনদেন ভারসাম্যের উন্নতির সহায়ক হচ্ছে কিনা ? বিষয়টির একটি সন্তোষজনক জওয়াব দেয়া যেতে পারে অভ্যন্তরীণ জাতীয় আয় সংশ্লিষ্ট (জিডিপি) কতিপয় অনুপাত উপস্থাপণের মাধ্যমে। রপ্তানি আয় দিয়ে আমদানির কত অংশ কেনা যায় এটাও একটি উৎকৃষ্ট পরিমাপক।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

সারণী-১ঃ আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য ১৯৮১-৮৮

(মিলিয়ন ডলারে)

	১৯৮০-৮১	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮
রপ্তানী (এফ, ও, বি)	৭১১	৬৮৬	৮১১	৯৩৪	৮১৯	১,০৭৪	১,১৭০
আমদানী (সি এণ্ড এফ)	– ২,৫৩৩	– ২,২৪৬	– ২,৩৫৩	– ২,৬৪৭	– ২,৩৬৪	– ২,৬২০	– ২,৮৯৫
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	– ১,৮২২	– ১,৫৬০	– ১,৫৪২	– ১,৭১৩	– ১,৫৪৫	– ১,৫৪৬	– ১,৭২৫
সার্ভিস (নীট)	১৫	– ১১৩	– ৩৩	– ৭৮	– ১২৫	– ১৫১	– ১৬৭
প্রাপ্তি	২৭৪	২৩০	২৭৯	২৮৬	২৬০	২৬২	২৯০
প্রদান	– ২৫৯	– ৩৪৩	– ৩১২	– ৩৬৪	– ৩৮৫	৪১৩	৪৫৭
বেসরকারী হস্তান্তর (নীট)	৩৭৯	৬৫৩	৬২৭	৪৭৭	৫৮৬	৭৩১	৭৪০
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	– [illegible]	[illegible]	– ৯৪৮	– ১,৩১৪	– ১,০৮৪	– ৯৬৬	– ১,১৫২

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বিশ্বব্যাংক ষ্টাফ প্রাককলন। এটি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশঃ এডজাষ্টমেন্ট ইন দি এইটটিজ এণ্ড শর্ট টার্ম প্রস্‌পেকটস", মার্চ ১০, ১৯৮৮ পৃঃ ১৯ থেকে গৃহীত।

সারণী–২ঃ আমদানী ও রপ্তানীর বৃদ্ধি হার

(শতকরা হারে)

	১৯৮০–৮১	১৯৮১–৮২	১৯৮২–৮৩	১৯৮৩–৮৪	১৯৮৪–৮৫	১৯৮৫–৮৬	১৯৮৬–৮৭	১৯৮৭–৮৮	১৯৮১–৮৮ গড়
রপ্তানী (স্থির মূল্যে)	১১.৪	৪.০	৪.৮	৪.৭	– ৩.৪	১১	২১.৪	– ০.৬	৬.৮
আমদানী সূচক	১০০	৯৯.২	৯৬.৬	১০২.৭	১২৩.০	১০৬.৪	১১৬.৫	১২৬.৭	২.৫%
(১৯৮০–৮১=১০০)									
খাদ্য বাদে									
আমদানী মূল্য সূচক	১০০	৯৯.৭	৯১.৪	৯০.৪	৪৫.০	৮৭.৭	৮৮.৭	৯০.২	

উৎসঃ পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিশ্বব্যাংক ষ্টাফ প্রাককলন বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশঃ এডজাষ্টমেন্ট ইন দি এইটটিজ এণ্ড শর্ট টার্ম প্রস্পেকটস্"—মার্চ ১০, ১৯৮৮ থেকে গৃহীত।

৪.৫ ১৯৮১–৮২ অর্থ বছরে লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্য অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদন এর ১২% ছিল। এই হার ক্রমাগত কমে ১৯৮৬–৮৭ অর্থ বছরে হয়েছে ৫.৫%। এটি বাংলাদেশের লেনদেন পরিস্থিতির উন্নতির পরিচায়ক নিঃসন্দেহে। খাদ্য ব্যতীত সার্বিক আমদানির গতি প্রকৃতি গত বছরগুলোতে (১৯৮০ এর পর থেকে) স্থবির থাকায় এবং রপ্তানি আয় গড়ে প্রতিবছর প্রায় ৭% বাড়ায় পরিস্থিতির মৌলিক উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয়। ১৯৮০–৮১ তে রপ্তানি আয় দিয়ে যেখানে ২৮% আমদানী ব্যয় নির্বাহ করা যেত ১৯৮৭–৮৮ তে তা ৪১% এ দাড়িয়েছে **(সারণী–৩ দ্রষ্টব্য)**।

৪.৬ তবে লেনদেনের চলতি হিসাবের ক্রমোন্নতি কেবলমাত্র বাণিজ্যিক ভারসাম্যের কারণ নয়। প্রকৃত পক্ষে ১৯৮০–৮৮ মেয়াদের প্রথম এবং শেষ বৎসর ছাড়া বাণিজ্য ঘাটতি স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল। সারণী–১ দ্রষ্টব্য। একই সময়ে চলতি হিসাবের ভারসাম্যের সার্বিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। চলতি হিসাবের ঘাটতি ১৯৮০–৮১ এর ১,৪২৮ মিলিয়ন ডলার থেকে কমে ১৯৮৭–৮৮ তে ১,১৫২ মিলিয়ন হয়েছে। বাণিজ্য ঘাটতির স্থিতিশীল অবস্থায় চলতি হিসাবের ভারসাম্যের উন্নতির কারণ অন্যত্র। সেটা হলো বেসরকারী হস্তান্তর যার প্রায় সবটাই প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে অর্থ প্রেরণ। এর পরিমান ১৯৮০–৮১ এর ৩৭৯ মিলিয়ন ডলার থেকে ক্রমাগত বেড়ে ১৯৮৭–৮৮ অর্থবছরে ৭৪০ মিলিয়ন হয়েছে। লেনদেনের চলতি হিসাবের অপর উপাদান নীট সার্ভিস চার্জ তেমন বাড়েনি– ১৯৮২–৮৩ অর্থবছরে ১৯৩ মিলিয়ন ডলার হয়েছে। সুতরাং উপরের বিশ্লেষণে এটা সুস্পষ্ট যে, লেনদেন ভারসাম্যের (ঘাটতি পরিস্থিতির) উন্নতির কারণ হলো বাণিজ্য ঘাটতির স্থিতিশীলতা এবং বেসরকারী হস্তান্তর খাতের উন্নতি।

বাণিজ্য ঘাটতি পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা আবার আমদানীর তুলনায় রপ্তানি হার বৃদ্ধির কারণে। সুতরাং রপ্তানির বৃদ্ধি হার লেনদেন ঘাটতি পরিস্থিতির স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক হয়েছে। এ বিবেচনায় বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতি তার আন্তর্জাতিক লেনদেন ভারসাম্যের অবনতি রোধে ধনাত্মক প্রভাব রাখতে পেরেছে স্বীকার করতে হবে।

উপসংহারঃ

বাংলাদেশ তার অর্থনীতিতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। সরকারী খাতের সীমা ও তৎপরতার যৌক্তিকরণ, বেসরকারী খাতের সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহ কাঠামো গড়ে তোলা এবং একটি লক্ষ্যাভিসারী বাণিজ্য নীতির মাধ্যমে তার অর্থনীতির কাঠামোগত বিন্যাসের চেষ্টা করছে। এ প্রচেষ্টার ফলে বিশেষ করে চলতি

সারণী-৩ঃ লেনদেন ভারসাম্যের উন্নতি

(শতকরা হারে)

	১৯৮০–৮১	১৯৮১–৮২	১৯৮২–৮৩	১৯৮৩–৮৪	১৯৮৪–৮৫	১৯৮৫–৮৬	১৯৮৬–৮৭	১৯৮৭–৮৮
১. জি, ডি, পি- এর শতকরা হারে চলতি হিসাবের ভারসাম্য	– ১০.০	– ১২০	– ৯.১	– ৬.৭	– ৮.২	– ৭.০	– ৫.৫	
২. জিডিপি-এর শতকরা হারে সরকারী বাজেট ভারসাম্য	– ৯.১	– ৮.৭	– ১১.২	– ৯.২	– ৭.৫	– ৭.২	– ৮.১	
৩. জি, ডি, পি, প্রবৃদ্ধি হার	৬.৮	০.৮	৩.৬	৪.২	৩.৬	৪.৯	৪.১	
৪. রপ্তানী আমদানী অনুপাত	২৮.০							৪১.০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

দশকে রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতির ফলে লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যে অনুকূল প্রভাব পড়েছে।

পাদটীকাঃ

১. সেলোম্কাই, এমঃ " এডজাষ্টমেন্ট ইন দি এইটটিজঃ এন ওভারভিউ অব ইস্যুজ" ইন " ফিন্যাস এণ্ড ডেভেলপমেন্ট" এ কোয়াটারলি জার্নাল অব দি ওয়ালর্ড ব্যাংক এণ্ড ইন্টারন্যাশলনাল মনেটরি ফাণ্ড, জুন ১৯৮৭।

২ ঐ পৃঃ২–৫।

৩. বিশ্বব্যাংক ঃ বাংলাদেশ ঃ এডজাষ্টমেন্ট ইন দি এইটটিজ এণ্ড শর্ট টার্ম প্রসপেক্টস পৃঃ ৩৫।

গ্রন্থ নির্দেশিকাঃ

১। বিশ্ব ব্যাংকঃ " বাংলাদেশঃ এডজাষ্টমেন্ট ইন দি এইটটিজ এণ্ড শর্ট টাম প্রস্পেক্টসন মার্চ, ১৯৮৮।

২। বিশ্বব্যাংক ঃ ওয়ার্লড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৮৯, অধ্যায় ঃ " এডজাষ্টমেন্ট এণ্ড গ্রোথ ইন দি এইটটিজ এণ্ড নাইন্‌টিজ " পৃঃ ৬–১৯।

৩। বিশ্বব্যাংক ঃ ওয়ার্লড ডেবেলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৮৮ অধ্যায় " ফিস্‌ক্যাল পালসি ফর ষ্ট্যাবিলাইজেশন এণ্ড এডজাষ্টমেন্ট" পৃঃ ৫৫–৭৮।

৪। বিশ্বব্যাংক ঃ ওয়ালর্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৮৭, অধ্যায় ঃ " বেরিয়ার্স টু এডজাষ্টমেন্টস্ এণ্ড গ্রোথ ইন্‌দি ওয়ালর্ড ইকনমি" পৃঃ ১৪–৩৫।

৫। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৮–৮৯

৬। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৭–৮৮

৭। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৬–৮৭

৮। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৫–৮৬

৯। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৪–৮৫

১০। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৩–৮৪

১১। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮২–৮৩

১২। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮১–৮২

১৩। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮০–৮১

জাতীয় আয়ঃ পরিমাপ, অর্থনীতি ও আর্থনীতিক কাঠামো

The great object of the political economy of every country, is to increase the riches and power of that country.
Adam Smith, Wealth of Nations

—ডঃ মোহাম্মদ তারেক

১। ভূমিকা

যে কোন সমাজ-বিজ্ঞানের মত অর্থনীতির কেন্দ্-বিন্দুতে রয়েছে মানুষ। এই আর্থনীতিক মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,-সে সব সময় তাঁর বৈষয়িক উন্নয়নে অথবা আর্থনীতিক কল্যাণ বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী।

এই বৈষয়িক উন্নয়নের অথবা আর্থনীতিক কল্যান বাড়ানোর প্রয়াস থেকেই সৃষ্ট হয় পণ্য ও সেবার। উৎপাদন থেকে আসে আয়। কিন্তু, একজন মানুষ শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বা দ্বারা গঠিত নয়। একই সাথে সে সমাজবদ্ধ ও রাষ্ট্রবদ্ধ। তাই, আর্থনীতিক বিশ্লেষণ ও আলোচনা ব্যক্তির গণ্ডি থেকে বেড়িয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিস্তৃত পরিসরে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। একটি রাষ্ট্র বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন, ও সমাজ নিয়ে গড়ে উঠে। তাই প্রতিটি রাষ্ট্রের মোট জাতীয় অথবা সামাজিক আয়, —যা ঐ রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তির, সংগঠনের, সমাজের ও রাষ্ট্রীয় সরকারের আয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠে, রাষ্ট্রটির আর্থনীতিক ক্ষমতার নির্দেশক হয়ে ওঠে।

এ প্রবন্ধটির [১] উদ্দেশ্য ত্রিবিধ ঃ (অ) জাতীয় আয় (National Income) প্রত্যয়টির সাথে অর্থনীতির মৌলিক জিজ্ঞাসা সমূহের সংযোগ ঘটানো, (আ) জাতীয় আয়

১। এ প্রবন্ধটি তৈরী করা হয়েছে মূলতঃ তাঁদের জন্য যাঁদের এর পূর্বে অর্থনীতির এ ধরণের প্রত্যয়ের সাথে পরিচয় ঘটেনি। তবে, অর্থনীতির সাথে পরিচয় যাঁদের আছে, তাঁরাও এ প্রবন্ধটি থেকে উপকৃত হবেন আশা করি।

২। National Income Accounting and Measures of National Income-দু'টি পরস্পর সম্পর্কিত প্রত্যয়। তবে এদের মধ্যে প্রত্যয়গত পার্থক্য রয়েছে।

এবং সে সাথে নব্য-ধ্রুপদী অর্থনীতির (Neo-classical Economics) কিছু অনুমানের (Assumptions) তাৎপর্যের উপর দৃষ্টিপাত করা এবং (ই) বাংলাদেশের জাতীয় আয় ও জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতির (National Income Accounting)[2] সমস্যাও বাংলাদেশ অর্থনীতির সামাজিক কাঠামোর উপর সংক্ষেপে আলোচনা করা। প্রবন্ধটি কিছুটা তাত্ত্বিক এবং কিছুটা মাধ্যমিক সূত্রে প্রাপ্ত উপাত্তের উপর ভিত্তি করে রচনা করা হয়েছে।

প্রবন্ধটির আলোচনা শুরু করতে চাই একটা প্রশ্নের মাধ্যমেঃ জাতীয় আয় কি?

২। জাতীয় আয়

জাতীয় আয় প্রত্যয়টির সাথে পরিচয়ের পূর্বে আরও দু'টি আর্থনীতিক প্রত্যয়ের সাথে পরিচয় ঘটা দরকার। প্রত্যয় দু'টি হলো- মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National product, GNP) এবং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (Gross Doinestic Product, GDP)।

(ক) মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP)

যে কোন আর্থনীতিক কর্মকান্ড শুরু হয়ে তাকে কোন অর্থনৈতিক পণ্য অথবা সেবা (Economic Good or Service) উৎপাদনের (Production) মাধ্যমে। কৃষক জমিতে ধান উৎদাপন করছে। একজন শিল্পপতি তার কারখানায় আপনি যে জামাটি পরে আছেন সেটি তৈরী করেছে।

আপনার কথাই ধরা যাক। ধরুন, আপনি একজন সরকারী চাকুরে। একজন সরকারী চাকুরে হিসেবে আপনি কি উৎপাদন করছেন? আপনি যা উৎপাদন করছেন, তার নাম সেবা। এ সেবার দাম কি? আপনার বেতন। এ মূল্য আপনাকে কতটা সময়ের ব্যবধানে দেয়া হয়? প্রতি মাস অন্তর।

অতএব দেখা যাচ্ছে, আপনার মাসিক আয়ের তিনটে মাত্রা (dimensions) আছে। প্রথমতঃ আপনি আপনার শ্রম দিয়ে একটি আর্থনীতিক সেবা উৎপাদন করছেন। দ্বিতীয়তঃ এই সেবার একটা দাম (Price) আছে। তৃতীয়তঃ সময়ের একটা নির্দিষ্ট ব্যাপ্তির ভেতর আপনার সেবাকে মুল্যায়ন করা হচ্ছে।

একইভাবে কোন রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে (Economy) তার কার্যকরী উৎপাদিকা শক্তি (Productive forces) বা তার সম্পদ (Resources) ব্যবহারের মাধ্যমে প্রচুর পণ্য ও সেবা উৎপাদিত হয়। এক বছরে উৎপাদিত সকল চূড়ান্ত (Final) অর্থনৈতিক দ্রব্য ও সেবার মোট আর্থিক মূল্য (Money Value) কে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (Gross domesrtc product, GDP) বলে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অথবা মোট জাতীয় উৎপাদন এর ভেতরে প্রবেশের পূর্বে একটা সাধারণ প্রশ্ন করা বাঞ্ছনীয়। উৎপাদন (Production) কেন?

খ) উৎপাদন (Production) ও অর্থনীতি (Economics)

একজন সরকারী চাকুরে কেন সেবা উৎপাদন করছে? কারণ, এই সেবার একটা দাম আছে এবং এই সেবার মুদ্রা-মূল্য তার আয় (Income)। অর্জিত আয় দ্বারা তাঁর কিছু চাওয়া (Wants) সে পুরণ করতে পারে। সে সেবা উৎপাদন করছে তার শ্রম দিয়ে। সে তার শ্রম অন্য কাজে লাগাতে পারতো। কিন্তু, সে শ্রেয় মনে করেই সরকারী চাকুরিতে ঢুকেছে। মানুষ কি কি উপাদান ব্যবহার করে, কোন কোন আকাঙ্খা পূরণের জন্য কি কি দ্রব্য সেবা উৎপাদন করবে, এবং কিভাবে তা বন্টন হবে, এসব সম্পর্কে তাকে বুদ্ধিমত্তার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সে এমনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে সব থেকে বেশী লাভবান হওয়া যায়। নীচের প্রবাহ চিত্র দ্বারা যে কোন আর্থনীতিক কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করা সম্ভবঃ

আর্থনীতিক কর্মকান্ডের প্রবাহ-চিত্র

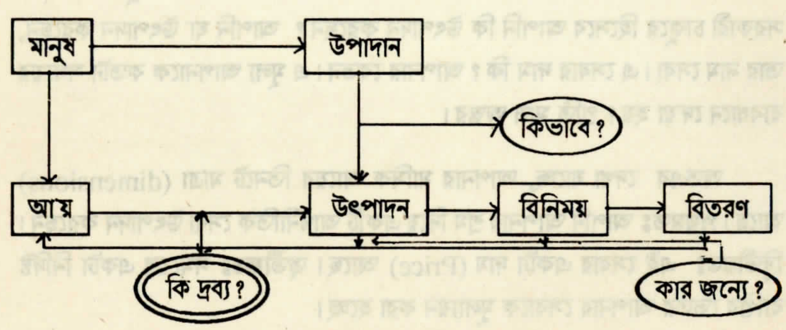

উপরের প্রবাহ-চিত্রের সাহায্যে অর্থনীতির সমস্ত মৌলিক প্রশ্নের জবাব ও জবাবের বিশ্লেষণ করা সম্ভব। যে কোন সমাজে তিনটি মৌলিক প্রশ্নের জবাব অর্থনীতি দিয়ে থাকেঃ-

(অ) কি কি দ্রব্য উৎপাদিত হবে?

(আ) কিভাবে উৎপাদিত হবে? এবং

(ই) উৎপাদন কার জন্য?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে- সেই সব দ্রব্য উৎপাদিত হবে, যে সব দ্রব্যের/সেবার চাহিদা আছে। চাহিদাকে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছেঃ—

চাওয়া + চাওয়া পূরণের আর্থিক সামর্থ্য = চাহিদা

এই চাহিদার সংজ্ঞার মধ্যেই লুকিয়ে আছে অর্থনীতির একটা বিতর্কিত প্রশ্নের উত্তর, আয়ের বৈষম্য কি ভাবে একটি সমাজের উৎপাদনকে প্রভাবিত করতে পারে? সমাজের নিঃস্ব গোষ্ঠীর অনেক চাওয়াই পূরণ হয়না, যেহেতু, তাদের ঐ সব চাওয়া পূরণ করার আর্থিক সামর্থ্য নেই। এজন্যে শিক্ষা ,স্বাস্থ্য ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা মেটাবার জন্য আমাদের মত দেশে সরকারকে এগিয়ে আসতে হয়। একই কারণে, একটি সমাজে বিনিয়োগযোগ্য দ্রব্য (Investment Goods) উৎপাদিত না হয়ে ভোগ্যপণ্য উৎপাদিত হতে দেখা যায়। একটি দেশে আয়ের বন্টন যত অসম হবে, সে সমাজে তত বেশী ভোগ্যপণ্য উৎপাদিত ও আমদানী হবে এবং সামাজিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য তত কম উৎপাদিত ও আমদানী হবে।

অর্থনীতির দ্বিতীয় মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছেঃ— উৎপাদিত দ্রব্য/সেবা সমূহ কিভাবে উৎপাদিত হবে? উৎপাদিত দ্রব্য/সেবা এমনভাবে উৎপাদিত হবে, যাতে সমাজের নির্দিষ্ট সম্পদ ব্যবহার করে প্রাপ্তি-সাধ্য প্রযুক্তি দ্বারা সবচেয়ে বেশী দ্রব্য/সেবা উৎপাদন করা যায়। এখানে লক্ষণীয়, উৎপাদনের উপাদান ও উৎপাদনের সম্পর্কটি প্রচলিত প্রযুক্তি দ্বারা নির্ধারিত। এই প্রযুক্তির বিবর্তনই মানব-সভ্যতাকে, আদিম সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে, বিংশ শতাব্দীর উন্নয়নের পটপরিক্রমায় এনে উপস্থিত করেছে।

একজন ব্যক্তি যেমন তার চাহিদা পূরণ করার জন্য সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না, একইভাবে প্রত্যেকটি দেশও তার চাহিদা অনুযায়ী সমস্ত দ্রব্য/সেবা উৎপাদন করতে পারে না। আর এজন্য বিনিময় প্রয়োজন। বিনিময় হয় টাকার মাধ্যমে। কখনও বা দ্রব্য

বিনিময়ের মধ্যে। আন্তর্জাতিক এই বিনিময় ব্যাখ্যা করতেই আন্তর্জাতিক অর্থনীতির উদ্ভব।

এখন আমরা দেখবো, উৎপাদন কার জন্য? অর্থনীতির সবচেয়ে জটীল এই প্রশ্নটির স্বরূপ কি? নব-ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা সরাসরিভাবে এর জবাবে বলেন— উৎপাদনের সুফল উৎপাদনের উপাদান সরবরাহকারীদের কাছেই পৌছিয়ে যায় তাদের উপাদানের অথবা উৎপাদনের উপকরণের পুরস্কার হিসেবে। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে, একটা সমাজে সম্পদের বন্টন অসম হলে তা উৎপাদনের সুফল বিতরণে এবং খোদ উৎপাদনে কি প্রভাব রাখবে? একটা প্রান্তবর্তী উদাহরণ নেত্বয়া যাকঃ—

ধরুন, সপ্তরাঙ্গা দেশে ফকা মাহমুদুল সমস্ত জমি ও পুঁজির মালিক। অন্যান্যরা শুধুমাত্র শ্রম সরবরাহ করে তাকে। উদাহরণটিতে স্পষ্ট যে, শ্রম সরবরাহকারীদেরকে ন্যূনতম শ্রম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অন্য দিকে উৎপাদনের সমস্ত সুফল ফকা মাহমুদুলের উপর বর্তাবে। সপ্তরাঙ্গা দেশটিতে যা উৎপাদিত হবে, তাও নির্ধারিত হবে ঐ একটি মাত্র ব্যক্তির ইচ্ছে অনুযায়ী। তাই, উৎপাদনের সুফল সমাজের সবার কাছে পৌছিয়ে দেবার জন্য সম্পদের সুষম বন্টন আবশ্যক। ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক কল্যানসাধনই অর্থনীতির মুল লক্ষ্য।

গ) ব্যষ্টিক থেকে সামষ্টিক উৎপাদন

এখন দেখা যাক, ব্যষ্টিক উৎপাদন থেকে কি ভাবে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পাওয়া যায়ঃ ধরুন, বঙ্গশাদ একটি ছোট দেশ। এখানে শুধুমাত্র বন্দুক ও মাখন উৎপাদন হয়। ১৯৮৮ সনের মোট উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ ও তাদের দাম (Prices) নিম্নরূপঃ—

বন্দুক	দাম (টাকায় প্রতিটি)	মাখন কেজি	দাম (টাকায় প্রতি কেজি)
১০০ টি	১০	১০০০	১

বঙ্গশাদ দেশে ১৯৮৮ সনে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কত? সহজেই অনুমেয় এটা হবেঃ—

১০০×১০ +১০০০×১ = ২০০০ টাকা

তবে, বাস্তবে কোন দেশেই মাত্র দুটি খাত থাকে না। উপরোক্ত উদাহরণটি ব্যষ্টিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে। বোঝার সুবিধার্থে। প্রকৃত পক্ষে,

অনেক দ্রব্য/সেবার অথবা খাতের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় বা সামষ্টিক অর্থনীতি। একটি দেশে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপ্তিতে (সাধারণতঃ এক বছর) যদি n সংখ্যক চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদিত হয় এবং এই n সংখক দ্রব্য / সেবার দাম যদি n সংখ্যক হয়, তা'হলে দ্রব্য/সেবা সমূহকে নিম্নে বর্নিত দ্রব্য ভেক্টর (Commodity Vector) Q এবং সংশ্লিষ্ট দাম সমূহকে দাম ভেক্টর (Price Vector) P দ্বারা প্রকাশ করা যায়ঃ—

$$P = [P_1 \; P_2 \cdots\cdots P_n]$$

$$Q = [Q_1 \; Q_2 \cdots\cdots Q_n]$$

এ ক্ষেত্রে, আলোচ্য দেশের মোট অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদন হবেঃ—

GDP = PQ . . . . (১)

উপরোক্ত সংজ্ঞার অসম্পূর্ণতায় আমরা আবার ফিরে আসবো। এখন দেখা যাক, জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি কাকে বলে?

৩। জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি

জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি হচ্ছে দেশের সামগ্রিক (Aggregate) উৎপাদন পরিমাপের বিজ্ঞান। জাতীয় আয় হিসাব পদ্ধতির মূল সূত্র (Basic Principle) হচ্ছেঃ-- কোন অর্থনীতির মোট উৎপাদন–এর মূল্য ঐ অর্থনীতির জাতীয় আয়ের সমান। এ মূলটি খুবই সহজে উৎপাদন এবং আয়ের চক্রকার প্রবাহ (Circular - Flow) দ্বারা দেখানো সম্ভব।

যে কোন অর্থনীতিতে ক্রিয়াশীল আর্থনীতিক নিযুক্তক সমূহকে (Economic Agent) স্থুলভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ— (অ) ভোক্তাবর্গ ও (আ) উৎপাদকবর্গ। একজন ব্যক্তি একই সাথে ভোক্তা ও উৎপাদক হতে পারেন। উপরোক্ত বিভাজনটি তাই মূলত আর্থনীতিক নিযুক্তি সমুহের ভূমিকার বিভাজন, দৈহিক বিভাজন নয়।

ভোক্তারা ভোগ করেন–উৎপাদকরা যা' উৎপাদন করেন। ভোক্তাদের ভোগ খরচ আয় হিসেবে পৌছায় উৎপাদক বর্গের কাছে। উৎপাদক বর্গ এই আয় দিয়ে উৎপাদনের উপকরণ কেনেন এবং উৎপাদক বর্গের এই খরচ আয় হিসাবে পৌছায় ভোক্তাবর্গের কাছে। কারণ, উৎপাদনের উপকরণ আসে ভোক্তাবর্গের কাছ থেকে।

আর্থনীতিক কর্মকাণ্ডের চক্রাকার প্রবাহ

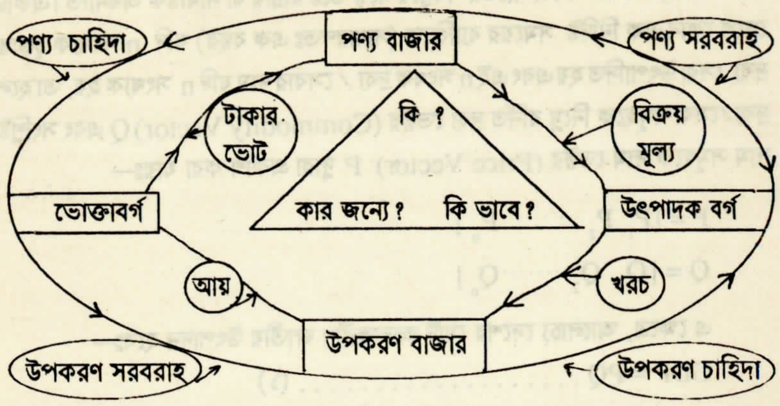

আর্থনীতিক কর্মকাণ্ড তাই চক্রাকার। বাইরের চক্র অর্থনীতিতে পণ্য (ও সেবা) এবং উপকরণের প্রবাহ দেখায়। উৎপাদকবর্গ ভোক্তাবর্গকে পণ্য দেয়। আর ভোক্তাবর্গ উৎপাদক বর্গকে উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহ করে। ভেতরের প্রবাহ টাকার প্রবাহ দেখায়। ভোক্তাবর্গ উৎপাদক বর্গকে বিক্রয়লব্ধ টাকা সরবরাহ করে যা উৎপাদনের খরচ হিসেবে ভোক্তাবর্গ–এর আয়ে রূপান্তরিত হয়। প্রবাহ দু'টি বিপরীতমুখী। ত্রিভুজটি দেখায় কি ভাবে অর্থনীতির প্রধান সমস্যা সমূহ এই চক্রাকারে আবর্তিত আর্থনীতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত।

আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ও আয় পরিমাপ (সামগ্রিকভাবে)

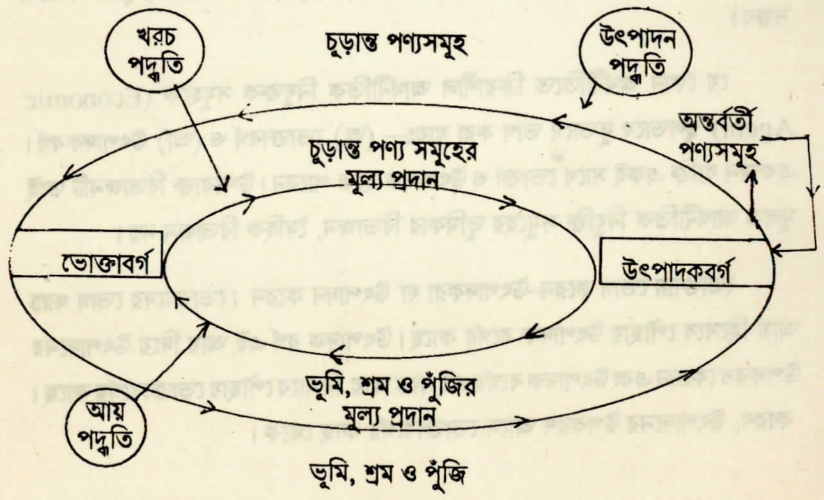

উপরোক্ত প্রবাহের উপরিভাগে দেখানো হয়েছে, উৎপাদকবর্গ হতে ভোক্তাবর্গের নিকট চূড়ান্ত পণ্যসমূহের প্রবাহ এবং সংশ্লিষ্ট অনুরূপ মূল্য প্রদান প্রবাহ ভোক্তাবর্গ হতে উৎপাদকবর্গ–এর দিকে। প্রবাহের নীচের অংশ দেখায়, ভোক্তাবর্গ হতে উৎপাদক বর্গ এর দিকে উৎপাদনের উপকরণের প্রবাহ এবং সংশ্লিষ্ট উল্টো প্রবাহটি, যা উৎপাদন উপকরণ সমূহের আয়ের। অন্তর্বর্তী (Intermediate) পণ্য সমূহ উৎপাদকবর্গের ভেতরই বাণিজ্যিকভাবে লেনদেন হয় ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিঃশেষিত হয়। তাই, এসব পণ্য চক্রাকারে প্রবাহের অন্তর্ভূক্ত নয়। এবং GDP পরিমাপ করার সময় অর্ন্তভূক্ত করা হয় না।

উপরোক্ত চক্রাকের প্রবাহটি জাতীয় আয় হিসাব পদ্ধতির মূল অভেদটি (Identity) দেখায়ঃ চূড়ান্ত পণ্য্য ও সেবার মূল্য উৎপাদনের উপকরনের আয়ের সমান। সমীকরণ আকারে এই অভেদটিকে নিম্ন বর্ণিত উপায়ে প্রকাশ করা যায়ঃ

মোট খরচ = মোট উৎপাদন
= মোট আয়..................(২)

চূড়ান্ত পণ্য ও অর্ন্তবর্তী পণ্যের পার্থক্য বোঝার জন্য নিম্নে বর্ণিত উদাহরণটি ধরা যাকঃ—

বীজ বপন করে কৃষক ধান উৎপাদন করে। ধান মাড়াই করে ধানের দানাকে আলাদা করা হয়। ধান সিদ্ধ করে রোদে প্রক্রিয়া জাত করা হয়। পরে ঢেঁকিতে অথবা কলে ছাটাই করা হয়। ধান থেকে চাল হয়। কিছুটা চাল কৃষক ভোগ করে এবং বাকী অংশ বিক্রি করে। চাল ব্যবসায়ী (অথবা কোথায়ও সরকার) চাল বাজার জাত করে। ভোক্তারা বাজার থেকে চাল ক্রয় করে।

উদাহরণে অর্ন্তবর্তী পণ্য বা সেবা হচ্ছেঃ-- (অ) বীজ, ধান, চাষ, (আ) ধান মাড়াই করা, (ই) ধান ঢেঁকিতে বা কলে ছাঁটা, (ঈ) চাল বাজার জাত করা ও চূড়ান্ত পণ্য হচ্ছেঃ (অ) যে অংশ কৃষক ভোগ করছে এবং (আ) যে চাল ভোক্তা বাজার থেকে ভোগের জন্য ক্রয় করেছে।

প্রতিটি অর্ন্তবর্তী পর্যায় মূল্য সংযোজিত হয়। একটি চূড়ান্ত পণ্য বাজারে ভোক্তার কাছে বিক্রীত হবার পূর্বে বিভিন্ন অর্ন্তবর্তী পর্যায়ে মোট যে মূল্য সংযোজিত হয়, তার পরিমাণ দ্রব্যটির বাজার মূল্যের সমান। তাই অর্থনীতির একটি বছরে উৎপাদিত সকল চূড়ান্ত পণ্য সেবার সংযোজিত মূল্য যোগ করেও জাতীয় আয় পাওয়া সম্ভব। অর্থনীতির পরিভাষায় এভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করাকে মূল্য সংযোজন পদ্ধতি (Value Added Method) বলা হয়।

চূড়ান্ত ও অন্তর্বর্তী পণ্যের সম্পর্ক

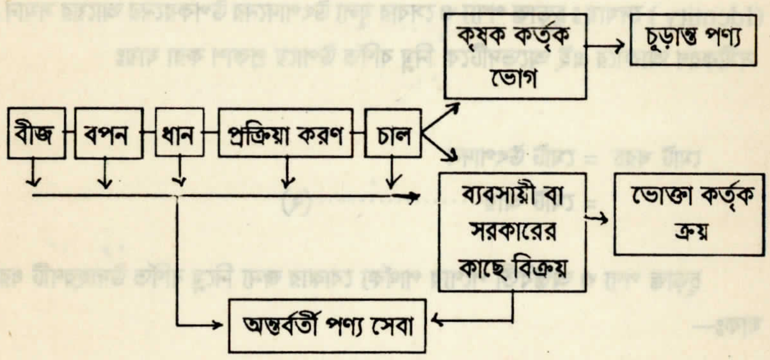

৪। GDP কি ভাবে পরিমাপ (Measured) করা হয়?

কোন দেশের GDP কত? এটা তিন ভাবে পাওয়া যেতে পারেঃ—

(অ) সামগ্রিক উৎপাদনের মূল্যের সমষ্টি দ্বারা (উৎপাদন পদ্ধতি);

(আ) সামগ্রিক খরচের পরিমাপ করে (খরচ পদ্ধতি) এবং

(ই) মোট আয় হিসাব করে (আয় পদ্ধতি)।

তিনটি পদ্ধতিই আয়ের চক্রাকার প্রবাহে প্রতিভাত এবং সমীকরণ নং ২ দ্বারা চিহ্নিত। প্রথম পদ্ধতিটি সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে (সমীকরণ নং ১)।

GDP পরিমাপের উদাহরণ দু'টি উৎপাদন পদ্ধতির অন্তর্গত (সমীকরণ নং ১)। ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি ঃ—

মোট আয় = মোট উৎপাদনের মূল্য = মোট খরচ

যদি জাতীয় আয়ের সমস্ত উপাত্ত ভোক্তাদের খরচ প্রবাহ থেকে নেয়া হয়, তা হলে খরচ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।আর যদি সমস্ত উপাত্ত ভোক্তাদের আয়ের প্রবাহ থেকে নেয়া হয়, তা হলে সেটাকে আয় পদ্ধতি বলা হয়। মূল্য সংযোজন পদ্ধতি চরিত্রগত ভাবে আয় পদ্ধতির অন্তর্গত। যখন মোট উৎপাদনের প্রবাহ থেকে জাতীয় উৎপাদন বের করা হয়, তখন সেটাকে উৎপাদন পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে।

৫। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনঃ খরচ পদ্ধতি

ব্যবহার অনুযায়ী মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে চারভাগে ভাগ করা যায়ঃ মোট উৎপাদনের কিছু অংশ ভোগ (Consumption Expenditiured, Cd) করা হয়, কিছু অংশ বিনিয়োগ করা হয় (Investmemt Expenditure, I_d), কিছু অংশ খরচ করে সরকার (Gouernment Expenditure, G_d) এবং বাকী অংশ রপ্তানী (Export) করা হয়ে থাকে। তা হলে সমষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে GDP কে নিম্নে বর্ণিত সমীকরণ দ্বারা সংখ্যায়িত করা যায়[৩] ঃ—

$$GDP = C_d + I_d + G_d + X \cdots\cdots\cdots\cdots (৩)$$

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন

C_d	I_d
G_d	X

কিন্তু, আমরা কি শুধু মাত্র দেশী পণ্য ও সেবা ভোগ করি? আমাদের দেশে শুধু কি দেশী পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়?

বাস্তব জগত থেকে আমরা ভোগ (Consumption Expenditure C), বিনিয়োগ (Investment Expediture, I) ও সরকারী খরচ (Government Expeditue, G)–এর যে উপাত্ত পাই সেখানে অভ্যন্তরীণ দ্রব্য অথবা সেবার উপর ভোগ (C_d) যেমন থাকে, তেমন থাকে বৈদেশিক দ্রব্য অথবা সেবার উপর (C^f) ভোগ।

৩. ছোট হাতের ডি (d) ব্যবহার করা হয়েছে 'domestic' কথাটি বোঝানোর জন্য।

অনুরূপভাবে, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে সঞ্চিত বিনিয়োগ (I_d) যেমন থাকে, তেমন থাকে বিদেশ থেকে প্রেরিত পুঁজির বিনিয়োগ (I_f)। সরকারের খরচেরও একটা অংশ আসে বিদেশ থেকে (G_f)। আমরা জানি C_f, I_f ও G_f এর সমন্বয়েই একটি দেশের মোট আমদানী খরচ (M) গডিত। তা হলে আমরা লিখতে পারিঃ

প্রকৃত উপাত্ত

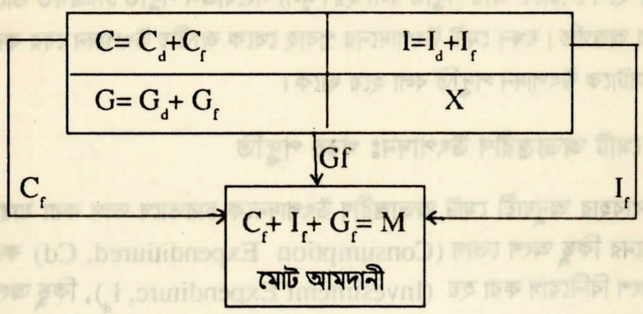

আমরা জানি C_f, I_f ও G_f–এর সমন্বয়েই একটি দেশের মোট আমদানী খরচ (M) গঠিত। তা হলে আমরা লিখতে পারিঃ

প্রকৃত উপাত্ত = C + I + G + X

অথবা,

প্রকৃত উপাত্ত — M = C + I + G + X - M

$= C_d + I_d + G_d + X$

= GDP. . . . . (4)

উপরোক্ত অভেদটিই খরচ পদ্ধতি অনুযায়ী মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বীজ গাণিতিক প্রকাশ। এখন দেখা যাক, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও মোট জাতীয় উৎপাদনের সম্পর্কটি কি?

৬। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GNP) ও মোট জাতীয় উৎপাদন (GDP)

আমরা জানি, কিছু বাংলাদেশী বিদেশে কাজ করছেন। এবং তাঁরা তাঁদের আয়ের একটি অংশ দেশে পাঠাচ্ছেন (REMITANCE , R_d)। একই ভাবে বাংলাদেশে কিছু

৪. ছোট হাতের এফ (f) ব্যবহার করা হয়েছে 'Foreign বা 'বিদেশ' শব্দটি বোঝাতে।

বিদেশী কাজ করছেন এবং তাঁদের পুঁজির আয়ের একটা অংশ বাংলাদেশ থেকে বাইরে পাঠাচ্ছেন (R_f)। R_d ও R_f–এর পার্থক্যকে নীট উপরকণ আয় (Net Factors' Earnings) বলে। তা হলে GDP ও GNP–র সম্পর্ক হচ্ছে নিম্ন রূপঃ

GDP + Rd - Rf = GNP ……………(৫)

সমীকরণ নং (৫) থেকে দেখা যায়ঃ

একটি দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সাথে নীট উপকরণ আয় যোগ দিলে মোট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়। এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো যে, মোট অভ্যন্তরীণ উপাদানকে আমরা বিন্যাস (Disposal) অনুযায়ীও চার ভাগে ভাগ করতে পারিঃ মোট ভোগ (C), মোট সঞ্চয় (S), মোট কর (T), ও হস্তান্তরিত আয় (Trasfer Payments, T_r)। সেক্ষেত্রে লেখা[৫] যায়ঃ

$$GDP = C+S+T+T_r$$
$$= C + I + G + X - M \quad \text{……………(৬)}$$

সমীকরণ নং ৬ কেইন্সীয় অর্থনীতির মূল নির্যাস হিসেবে জাতীয় আয় নির্ধারণে মূল ভূমিকা রাখে। তবে, এ বিষয়টি বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় বস্তু নয়। তাই আলোচনার বাইরে রাখা হলো।

৭। জাতীয় আয়ঃ পুনরায়

এ পর্যন্ত আমরা অর্থনীতি, উৎপাদন ও জাতীয় উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা দেখবো মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে কিভাবে জাতীয় আয়কে বের করা যায়।

(ক) নীট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product, NNP)

কোন নির্দিষ্ট বছরে কতজন নতুন যোগ হলো পূর্বের জনসংখ্যার সাথে? এটা জানার জন্য ঐ বছরের মোট কতজন জন্ম নিলো, যেমন জানার দরকার আছে, একইভাবে জানার দরকার আছে কতজনের ঐ বছরে মৃত্যু হলো। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। প্রতি বছর মোট বিনিয়োগের (I) সাথে সাথে কিছু কিছু পুঁজির মৃত্যু বা অবচয়

---

৫. দান, অনুদান, চ্যারিটি ইত্যাদি বিষয়সমূহ হস্তান্তরিত আয় হিসেবে গন্য করা হয়।

(depreciation) ঘটছে। নীট বিনিয়োগ (I_n) ঘটছে মাত্র (I –অবচয়) এর সমান। তাই নীট জাতীয় উৎপাদনকে লেখা যায়ঃ ৬

NNP = GNP–অবচয়

= C+I+G+X -M-অবচয়

= $C+I_n+G+X-M$ .... (৭)

(খ) জাতীয় আয় (National Income, NI)

GDP–র উদাহরণ ও সংজ্ঞায় আমরা দেখেছি, GDP–র এবং সে অর্থে GDP অথবা NNP–র পরিমাপ করা হয়ে থাকে বাজার দামে। কিন্তু, আমি অথবা আপনি কোন পণ্য অথবা সেবার জন্য যে দাম দেয়ে থাকি, সে দামের মধ্যে অপ্রত্যক্ষ কর (indirect Taxes) থাকে। কাজেই, কোন দেশের কোন এক নির্দিষ্ট বছরের সত্যিকারের উৎপাদন অথবা আয় সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে NNP থেকে অপ্রত্যক্ষ কর বাদ দিতে হবে । অতএব NI = NNP – অপ্রত্যক্ষ কর . . . . (৮)

সমীকরণ ৮ সমীকরণ ২–এর যথার্থতা প্রমাণ করে। এখন দেখা যাক, একটা দেশের জাতীয় উৎপাদন অথবা জাতীয় আয় পরিমাপ করা এত প্রয়োজনীয় কেন?

জাতীয় আয় কেন?

(ক) তথ্য ও নীতি

একজন রুগ্ন লোকের স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা অনাবশ্যক। এমনকি একজন সুস্থ্য ব্যক্তির শরীরের তাপ মাত্রা যেমন, তেমনি GNP অথবা NNP অথবা NI কোন দেশের আর্থনীতিক স্বাস্থ্যের অবস্থান সর্ম্পকে ধারনা দেয়। এবং আর্থনীতির স্বাস্থ্যের অসুস্থতা ধরা পড়লে সে সম্পর্কে যথাযথ নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় সুস্থতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে।

কোন নির্দিষ্ট বছরের জাতীয় আয় হচ্ছে উপাত্ত নির্ভর একটা পরিমাপ। পরিমাপ থেকে তথ্য পাই। এ তথ্য থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌছায় দেশের আর্থনীতিক অবস্থা

---

৬. এ অনুচ্ছেদের আলোচনায় নীট উপকরণ আয়কে শূন্য অথবা C, I ও G –র অর্ন্তভূক্ত ধরা হয়েছে।

ও তার কারণ সম্পর্কে। যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় তত্ত্ব বলে। এবং তত্ত্বের ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। নীতির বাস্তবায়ন ও ফলাফল হিসেবে পরবর্তি বছর জাতীয় আয় পরিমাপের মাধ্যমে আবার একটি তথ্য পাই। এবং তত্ত্বের পরিশীলনের মাধ্যমে জাতীয় নীতিতে পরিবর্তন আনা হয়। তথ্য, তত্ত্ব ও নীতির মধ্যেক্যর এই ত্রৈমাত্রিক সম্পর্কের ফলপ্রসূ প্রয়োগই উন্নয়ন প্রয়াসী দেশ সমূহের আর্থনীতিক চাকাকে সফল করতে পারে।

তথ্য, তত্ত্ব, ও নীতির পারস্পরিক সম্পর্ক

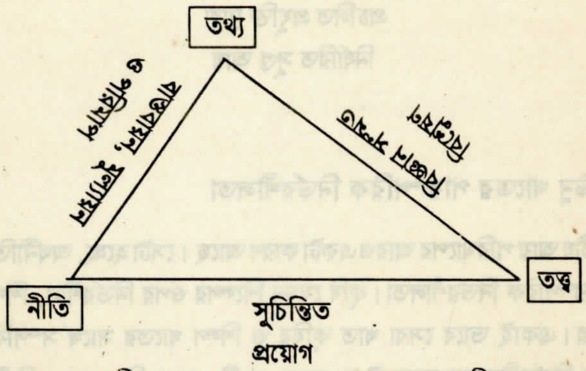

(খ) সত্যিকারের জাতীয় আয় (Actual NI) এবং সুপ্ত জাতীয় আয় (Potential NI)

কোন রাষ্ট্রের প্রাপ্তসাধ্য সমস্ত সম্পদের প্রচলিত প্রযুক্তির আওতায় সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত সুপ্ত আয়ের দ্বোরে পৌছানো সম্ভব। সত্যিকারের আয় থেকে সুপ্ত আয়ের দিকে এই যাত্রা–পথে সামিল সমস্ত উন্নয়নশীল দেশ। শুধু মাত্র উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধির মাধ্যমেই সুপ্ত আয়ের সোনালী দিগন্তের কাছাকাছি পৌছানো সম্ভব। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, সুপ্ত জাতীয় আয় অনড় কোন কিছু নয়। প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে সুপ্ত জাতীয় আয়ের স্তরকে সব সময় আমাদের নাগালের বাইরে রাখা সম্ভব। মানব জাতিয় প্রগতির ইতিহাসই হচ্ছে প্রযুক্তির প্রগতির ইতিহাস।

নীতি, প্রযুক্তি, আয় ও সুপ্ত আয়ের সম্পর্ক

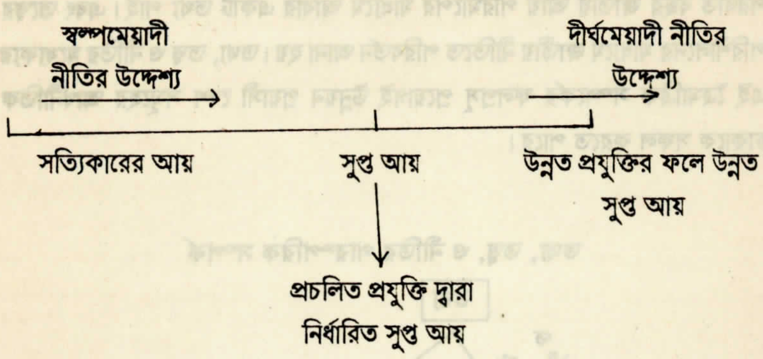

(গ) বিভিন্ন খাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

জাতীয় আয় পরিমাপের আরও একটা কারণ আছে। সেটা হচ্ছে, অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। কৃষি যেমন শিল্পের ওপর নির্ভরশীল, শিল্প তেমন কৃষির উপর। একাই ভাবে সেবা খাত কৃষির ও শিল্প খাতের সাথে সম্পর্কিত। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কারণেই যে কোন একটি খাতের বিশৃঙ্খলা প্রতিটি খাতকে অদক্ষ করে তুলতে পারে। উন্নয়ন নীতি ও কৌশল প্রণয়ণের সময় প্রখর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন কোন খাতের অনুয়ী (Likage) প্রভাব সবচেয়ে বেশী।

দু'টি বছরের মাঝে শুধু উৎপাদনেরই পরিবর্তন হয় না। সাথে সাথে পরিবর্তন হয় দামের। তাহলে কি ভাবে দু'টো বছরের মোট উৎপাদন অথবা জাতীয় আয় তুলনীয়?

৯। মুদ্রাগত মোট উৎপাদন (Nominal GNP) ও প্রকৃত মোট উৎপাদন (Real GNP)

আমরা দেখেছি, মোট উৎপাদন মূল্যায়িত করা হয় টাকায়। কাজেই, টাকার মূল্য কমলে পণ্যের দাম বাড়ে এবং উৎপাদন না বাড়লেও উৎপাদন মূল্য বেড়ে যায়। তাই বিভিন্ন বছরের মোট উৎপাদন সমূহকে স্থির দামে (Constant Price) প্রকাশ করা হয়।

এখন দেখা যাক এ দশকে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের ও জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির গতি প্রকৃতি কেমন ছিলো।

সারণী-১

জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি (মিলিয়ন টাকায়)
(১৯৭২-৭৩ এর স্থির মূল্যে)

	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫	১৯৮৫/৮৬	১৯৮৬/৮৭	১৯৮৭/৮৮
স্থিরমূল্যে (১৯৭২/৭৩)								
জাতীয় আয়	৭১৬৪৪	৭২২২৬	৭৪৮৩৫	৭৮০০৩	৮০৯০৩	৮৪৭০৮	৮৮০৭৭	৮৯৬৮১
প্রকৃত বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার	(৬.৮)	(০.৮)	(৩.৬)	(৪.২)	(৩.৭)	(৪.৭)	(৪.০)	(১.৮)
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	২.৩১	২.৬	২.২৭	২.২৫	২.২৬	২.২৯	২.২১	

সূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

উপরোক্ত সারণী থেকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান, আমাদের জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি হারের প্রবণতা নিম্নমুখী। অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের প্রবণতা ধ্রুব পর্যায়ে বিদ্যমান। কাজেই, আর্থনীতিকভাবে অধঃগামী আমরা। আমাদের এ বিপর্যয় কে রুখবে? কিভাবে রুখবে? আমাদের নিম্নমুখিতার কারণ কি? হয় আমাদের তথ্যগত ভিত্তি দুর্বল, তাই সঠিক তত্ত্বে ও নীতিতে পৌছাতে পারছি না অথবা ভুল তত্ত্ব ও নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে অথবা আমাদের নীতি আমাদের রাজনীতিবিদ্দের ও পরিকল্পনাবিদদের মূল্যবোধ থেকে জাত, বিজ্ঞান সম্মত তথ্য ভিত্তিক নয়।

উৎপাদনের উঠা নামা বোঝার সুবিধার্থে একটা ছোট উদাহরণ নেয়া যাকঃ—

উদাহরণ ঃ

বঙ্গরঙ্গ দেশে গত দু'বছর যে আয় হয়েছে তা নিম্নের সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী -২

সাল	উৎপাদন (একক)	দাম (টাকায়)	মোট মুদ্রাগত আয়	প্রকৃত আয় (৮৭–এর দামে)
১৯৮৭	১০০	১০০	১০০×১০০ =১০,০০০	$১০০০০ \times \frac{১০০}{১০০} = ১০,০০০$
১৯৮৮	১০০	২০০	১০০×২০০=২০,০০০	$২০০০০ \times \frac{১০০}{২০০} = ১০,০০০$

উপরোক্ত উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিভিন্ন বছরের প্রকৃত উৎপাদন ও প্রকৃত আয়ের অনুপাত অবশ্য সমান হবে। প্রকৃত GNP–র সজ্ঞা হচ্ছে [৭]

$$\text{প্রকৃত GNP} = \frac{\text{আর্থিক NGP}}{\text{ডিফ্লেটর}} \cdots\cdots\cdots\cdots (৯)$$

ডিফ্লেটর' হচ্ছে একটা আপেক্ষিক সূচক যা যে কোন বছরের GNP কে ভিত্তি–বছরের (Base Year) দামে প্রকাশ করে। উপরোক্ত উদাহরণে ঃ

$$\text{ডিফ্লেটর}_{৮৮} = \frac{\text{৮৮ এর দাম}}{\text{৮৭ এর দাম}}$$

এখন আসুন, আমরা দেখি প্রকৃত GNP –র কোন অসম্পূর্ণতা রয়েছে কিনা?

১০. GNP কি দেখাতে চায়? কি দেখাতে পারে না?

সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে GNPঃ (অ) জাতীয় কল্যাণ, (আ) সমাজিক উৎপাদন ও (ই) আর্থনীতিক শক্তির পরিচায়ক। কিন্তু, সব আর্থনীতিক কর্মকাণ্ড টাকা দ্বারা মূলায়িত করা সম্ভব নয়। যেমন, গৃহ–গৃহিনীর কর্মকাণ্ড। অনেক কর্মকাণ্ড বাজার বহির্ভূত হতে পারে। যেমন–বাংলাদেশের একজন কৃষক তার উৎপাদনের কিছু অংশ নিজেই ভোগ

---

৭. এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, আর্থিক আয় ও আর্থিক GNP অথবা GDP কে প্রকৃত সংখ্যায় প্রকাশ করার পদ্ধতি একই হবে।

করে। আপনার সেবার সত্যিকার দাম কি? পেনশন, গ্রাচুইটি ও অন্যান্য সুবিধাদির মূল্য কি ভাবে GNP-তে দেখানো হবে? বিশ্রামের মূল্য কি? কিন্তু, বিশ্রাম আপনাকে শান্তি দেয় এবং এর কাম্যতা রয়েছে।

অদৃশ্য ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড কি GNP-তে ধরা হয়? আর্থনীতিক অপণ্য- এর বিভাজন নিম্নরূপঃ

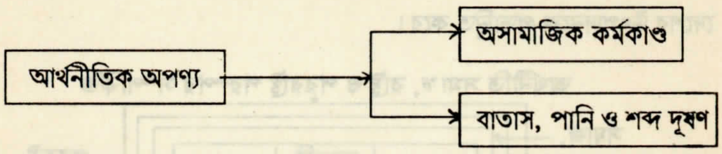

এ ধরনের পণ্য বা সেবা কোন সমাজের আর্থনীতিকে মঙ্গল (Economic Welfare) আনে না।

জাতীয় উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করার সময় প্রশ্ন আসা স্বাভাবিকঃ প্রতিটি পণ্য বা সেবার বাজার দাম (Market price) ও তার সামাজিক মূল্য (Social Price) কি সমান? অবশ্যই সমান নয়। এবং যেহেতু সমান নয়, GNP-কে সামাজিক উৎপাদনের সাথে তুলনায় করা সম্ভব নয়। একমাত্র পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি বিরাজমান থাকলে এবং অর্থনীতিতে কোন বাহ্য প্রভাব (Externalities) না থাকলেই জাতীয় উৎপাদনকে সামাজিক উৎপাদন বলা যায়।

আমরা সাধারণতঃ দু'টি অর্থনীতির GNP তুলনা করে তাদের আপেক্ষিক শক্তি বুঝতে চাই। কিন্তু, দু'টি অর্থনীতির মোট জাতীয় উৎপাদন তুলনীয় কি? এক অর্থে নয়। কারণ, কোন দ্রব্যের মূল্য নির্ভর করে ক্রয় ক্ষমতার উপর। প্রতিটি দেশে ক্রয় ক্ষমতা এক নয়। প্রতিটি দেশের প্রয়োজনও এক নয়। প্রয়োজন অনেক সময় ভৌগলিক অবস্থা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এরপরও প্রশ্ন থাকে ঃ উচ্চ GNP কি শক্তিশালী অর্থনীতির পরিচায়ক? পুরোপরিভাবে নয়। কারণ, দু'টো অর্থনীতির সমান আয় হবার পরও তাদের মাথা পিছু আয়ের প্রচুর পার্থক্য থাকতে পারে। আবার মাথাপিছু আয় খুব বেশী হবার পরও অর্থনীতিটির উৎপাদন ক্ষমতা ও সামাজিক- আর্থনীতিক কাঠামো দুর্বল হতে পারে। যেমন, তলে উৎপাদনকারী দেশসমূহ।

---

৮. Deflator শব্দটির বাংলা করার চেষ্টা করিনি।

১১। কোন দেশের জাতীয় আয় কিসের উপর নির্ভরশীল?

প্রথম এবং প্রধান নিয়ামক জনসংখ্যা। জনসংখ্যার দ্বারা কোন দেশের সেবা/শ্রম নির্ধারিত হয়। আবার শ্রমই সব নয়। শ্রমশক্তি দক্ষ ও ফলনশীল হওয়া বাঞ্চনীয়। শ্রমের দক্ষতা ও ফলনশীলতা কিসের উপর নির্ভরশীল? স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মূল্যবোধ, সমাজ কাঠামো, রাজনেতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদির উপর শ্রমের ফলনশীলতা নির্ভরশীল। এমনকি আন্তর্জাতিক সম্পর্কও বহির্বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের ভেতর দিয়ে একটি দেশের উৎপাদনকে প্রভান্বিত করে।

অর্থনীতি সমাজ, রাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র পরস্পর সম্পর্কিত

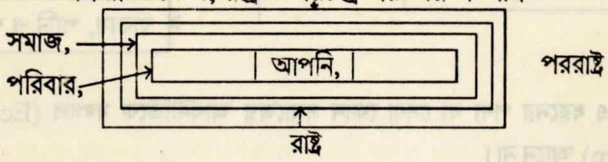

প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার সদ্ব্যবহার এর উপর অনেকটা নির্ভর করে জাতীয় উৎপাদন কত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছেঃ সম্পদহীনতা কি উচ্চ GNP-র অন্তরায়? সব সময় নয়। যেমন, জাপান। কারিগরী জ্ঞান ও প্রযুক্তি উৎপাদনের উপরকণ ও উৎপাদনের মধ্যেকার সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে উপকরণের মাথাপিছু উৎপাদন বাড়াতে পারে। বাণিজ্য বিনিময় হারও (Terms of Trade) একটি দেশের মোট উৎপাদনের উপর প্রভাব রাখে। বর্তমান বিশ্বে উন্নত শিল্পায়ত্ত দেশসমূহ প্রধানতঃ কাচাঁ মালের বিনিময় অনুন্নত দেশে শিল্প দ্রব্য রাপ্তানী করে। কাঁচামালের বিনিময় হার ঐতিহাসিকভাবে কমে যাচ্ছে। দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য-এর প্রভাবও রয়েছে মোট উৎপাদনের উপর। ইতিহাস ও ঐতিহ্য গড়ে তোলে দেশের সাংস্কৃতিক মণ্ডল। আর এই সাংস্কৃতিক মণ্ডল প্রভান্বিত করছে উৎপাদনকে।

১২। বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদনঃ গঠন ও বিন্যাস

বাংলাদেশে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জাতীয় আয় সংক্রান্ত সমস্ত উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশনার দায়িত্বে নিয়োজিত। এই ব্যুরোটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ডিভিশনের অধীন। বাংলাদেশে জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ করার জন্য প্রধানতঃ উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পারস্পরিক স্বতন্ত্র এগারোটি খাতে বিভাজন করা হয়।

পরিসংখ্যান ব্যুরো বাংলাদেশ আর্থনীতিকে বিভিন্ন খাতে যেভাবে ভাগ করেছে সেটা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

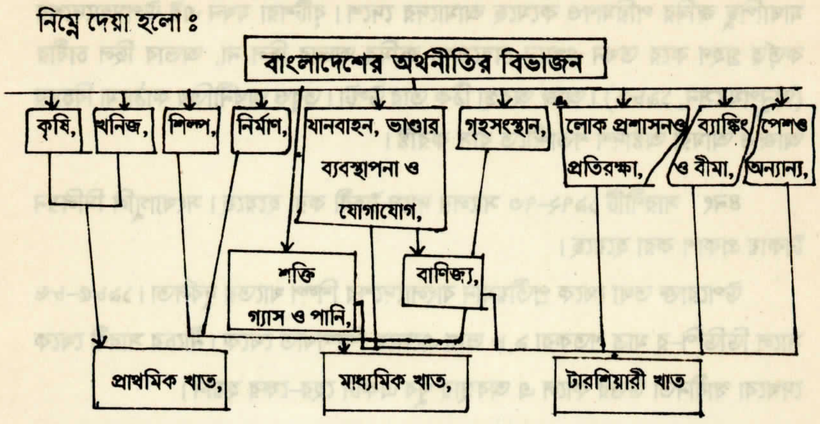

উপরোক্ত এগারোটি খাতের মধ্যে কৃষি ও খনিজ খাতকে প্রাথমিক খাত (Primary Sector) শিল্প, নির্মান ও গৃহসংস্থান খাতকে মাধ্যমিক খাত (Secondary Sector) এবং অন্যান্য খাতকে টারশিয়ারী (Tertiary Sector) খাত বলে। ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে, শিল্পায়িত দেশসমূহে শিল্প বিপ্লবের পূর্বে জাতীয় উৎপাদনে প্রাথমিক খাতের অবদান সবচেয়ে বেশী ছিলো। শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে ধীবে ধীরে এ খাতে অবদাম কমেছে। আর শিল্প খাতের অবদান রেড়েছে। নীচের সারণী থেকে স্পষ্ট শিল্পায়িত দেশসমূহে যতই শিল্পায়নের বিস্তৃতি ও গভীরতা পেয়েছে ততই ধীরে ধীরে কৃষির উপর নির্ভরতা কমেছেঃ

সারণী-৩

শিল্পায়ত দেশে কৃষিতে নিয়োজনের বিবর্তন

দেশের নাম	১৮৩০	১৮৭০১	১৯১০	১৯৬০
যুক্তরাজ্য	২৩	১৫	৮	৪
যুক্তরাষ্ট্র	৭১	৫১	৩২	৯
সুইডেন	৬৩	৫৬	৪৮	১৪
ফ্রান্স	৬৩	৫০	৪১	২৫
জাপান	৬৩	৮২	৬৩	৩৩

সূত্র ঃ এল, জি, জিম্মারম্যান, Poor Lands, Rich Lands, পৃ. ৮০

সারণী-৪
এক নজরে ১৯৮৫-৮৬ সালের বাংলাদেশের GDP ও GNP

খাত	মোট মূল্য	প্রধান খাত	GDPতে অবদান (শতকরা হারে)	GNP তে অবদান (% হারে)
১. কৃষি	৩৯০৯৪			
২. খনিজ	২	ক. প্রাথমিক	৪৬.২৮	৪৪.৯৩
৩. শিল্প	৮২৮২	খ. শিল্প	৯.৮	৯.৫১
৪. নির্মাণ	৪১৬৯			
৫. শক্তি, গ্যাস, পানি ইত্যাদি	৫৯২	খ. মাধ্যমিক	২১.৭৮	২১.১৫
৬. যানবাহন যোগাযোগ ইত্যাদি	৫৭৮৭	গ. অন্যান্য	৪৩.৯২	
৭. বাণিজ্য	৭৬০০	গ. অন্যান্য	৪৩.৯২	
৮. গৃহ-সংস্থান	৫৯৪৯			
৯. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৪৩২২	গ. টারশিয়ারী	৩১.৯৪	৩৩.৯২
১০. ব্যাংকিং বীমা	১৯৫১			
১১. পেশাগত ও অন্যান্য সেবা	৬৭৩৪			
১২ রেমিট্যান্স[৯]	২৫২৯			
মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন= ৮৪৪৮২			মোট= ১০০	মোট= ১০০
আমোট জাতীয় উৎপাদন =৮৭০১১				

সূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

৯. সম্ভবতঃ রেমিট্যান্সের হিসেব টি স্থূল (gross) নীট (Net) নয়।

শিল্পায়নের অভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে যতই চাপ বেড়েছে মাথাপিছু জমির পরিমাণও কমেছে আমাদের দেশে। বৃটিশরা যখন এই উপমহাদেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তখন এখানে চাষযোগ্য জমির অভাব ছিল না, অভাব ছিল চাষীর (অনুপম সেন, ১৯৮৯)। আজ অবস্থা ঠিক তার উল্টা। তবুও অর্থনীতির কাঠামো বিচারে আজও আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাস করছি।

৪নং সারণীটি ১৯৭২-৭৩ সালের দামে তৈরী করা হয়েছে। সংখ্যাগুলি মিলিয়ন টাকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

উপরোক্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান বাংলাদেশের শিল্প খাতের দুর্বলতা। ১৯৮৫-৮৬ সালে ডিডিপি-র মাত্র শতকরা ৯.৮ ভাগ এসেছে শিল্পখাত থেকে। নীচের সারণী থেকে দেখবো স্বাধীনতা উত্তর কালে এ অবস্থার খুব একটা হের-ফের হয়নি।

সারণী-৫
জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ও গঠন
(১৯৭২/৭৩ সালের মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

খাত	১৯৭২/৭৩ সালের জাতীয় আয়	১৯৮৪-৮৫ সালের জাতীয় আয়	বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার (%)	জাতীয় আয়ের অংশ (শতাংশে) ১৯৭২/৭৩	১৯৮৪/৮৫
(১) কৃষি	২৭২২.০	৪২৪৮.৬	৩.৮	৬০.১	৫৪.৩
(২) শিল্প	৩২৯.৮	৬৭৬.৮	৬.২	৭.৩	৮.৬
(৩) অন্যান্য খাত	১৪৭৮.২	২৯০৩.৬	৫.৮	৩২.৬	৩৭.১
মোট	৪৫৩০.০	৭৮২৯.০	৪.৭	১০০	১০০

সূত্রঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ১৯৮৫-৯০, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

ঐতিহাসিকভাবে শিল্প–উন্নত দেশে শিল্প খাতে একটা ব্যাপক উন্নয়ন–পর্যায়ে পৌঁছানোর পর থেকে টারশিয়ারী খাতের অবদান বাড়া শুরু হয়। কারণ, মূলতঃ খাতটির (অ) সরাসরি উৎপাদনশীলতা কম এবং (আ) অনেকটা ভোগধর্মী চরিত্র। অতএব, আমাদের জাতীয় উৎপাদনে প্রাথমিক ও টারশিয়ারী খাতের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এবং শিল্প খাতের করুণ চিত্র (সারণী–৫ ও সারণী–৪) আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ব্যর্থতারই পরিচায়ক। এ ধরণের উৎপাদন–কাঠামো একটা অধঃগ্রামী, পরজীবী এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য নির্ভর অর্থনীতির বেদনাদায়ক প্রতিচ্ছবি।

১৩। উপসংহারঃ

কেইন্সীয় অর্থনীতি মূলত অসম্পূর্ণ নিয়োজনের অর্থনীতিতে যার মূল চাবিকাঠি হচেছ রাজস্ব নীতির মাধ্যমে অর্থনীতির নিয়োজন বাড়িয়ে পূর্ণ নিয়োজন বা সুপ্ত জাতীয় উৎপাদনের দিকে অর্থনীতিকে ধাবিত করা। এই কেইন্সীয় নীতিই বিরাট মন্দা থেকে পাশ্চাত্য শিল্পায়িত দেশ সমূহকে এ শতাব্দীর ত্রিশ দশকে মুক্তি দেয়। এ শতকের সত্তর দশক পর্যন্ত এই কেইন্সীয় নীতি–দাওয়াই–এর জয়জয়াকার অব্যাহত থাকে। যদিও কাঠামোগত কারণে অনুন্নত দেশ সমূহে কেইন্সীয় মডেলের প্রয়োগ ও কার্যকারিতা ছিলো সীমাবদ্ধ।

কেইন্সীয় অর্থনীতির জয়যাত্রার সাথে সাথে জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় অর্থনীতির কৃতিসূচক হিসেবে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। এ প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে জাতীয় আয়–এই সামষ্টিক ধারণাটি কিভাবে ব্যষ্টিক উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত? কিভাবে নবধ্রুপদী আর্থনীতি বিভিন্ন অনুমানের অক্রিয়াশীলতা জাতীয় উৎপাদনকে প্রভাবন্বিত করতে পারে? কিভাবে সমাজ, রাষ্টনীতি ও সংস্কৃতিক বাতাবরণ অর্থনীতি ও জাতীয় আয়–এর উপর প্রভাব ফেলে। সর্বশেষে বাংলাদেশের জাতীয় আয় ও এর পরিমাপ ও গঠন–বিন্যাস নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এবং দেখেছি, জাতীয় আয়–এই প্রত্যয়টির অনেক অসম্পূর্নতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের গঠন বিন্যাস কিভাবে আমাদের আর্থনীতিক কাঠামোর অধঃগামী প্রক্রিয়ার প্রতিবিম্ব হিসেবে দেখা দেয়।

আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বে উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায় (বল্ডিং, ১৯৬৬)। উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা না বাড়াতে পারলে আমাদের সমস্ত বিশ্লেষণ, নীতি, কর্মসূচী ও কৌশল ভ্রান্ত হতে বাধ্য। আমাদের পরিকল্পনা শুধুমাত্র আর্থনীতিক

তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে রচনা করা চলবে না। সাথে সাথে আর্থনীতিক উপাত্ত সমূহের উপর পরিকল্পনার ভিত্তি দাড় করাতে হবে। সমাজতত্ত্ববিদ বয়লির কথা দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই ঃ

"The Values included in income are valued in exchange, which are dependent not only on the goods and services in question but also on the whole complex of a society . . . . the numerical measurement of total national income is thus dependent on the distribution of income and would alter with it."

গ্রন্থপুঞ্জি ঃ

১. হোসেইন, মোতাহার ১৯৮৮। The System of National Accounts in Banglladesh, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বুক সেন্টার, গ্রন্থ ভবন, বঙ্গবন্ধু এ্যাভেনিউ, ঢাকা–১২০২, বাংলাদেশ।

২. পরিকল্পনা কমিশন। ১৯৮৫। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৮৫–৯০, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩. – – – – – – ১৯৮৮। Mid-term Review of Third Five Year Plan ১৯৮৫–৯০, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

৪. সেন, অনুপম। ১৯৮৯। বাংলাদেশঃ রাষ্ট্র ও সমাজ, সামাজিক অর্থনীতির স্বরূপ, প্রকাশকঃ সাহিত্য সমবায়। ১০২/ফ দীননাথ সেন রোড, ঢাকা–৪।

৫. বলডিং, কেনেথ, ই,।১৯৬৬। The Economics of Knowledge and the Knowledge of Economics, American Economic Review, May ১৯৬৬, পৃঃ ১১।

৬. বয়লি, এ, এস,। ১৯২৩। The Nature and Purpose of the Measurement of Social Phenomena, 2nd edition, পৃঃ ২৮৮।

৭. স্মিথ, এড্যাম। Wealth of Nations, সম্পাদনা কেনান, ভলিউম ১, অধ্যায় ৫, পৃঃ–৩৫১।

অফিস ব্যবস্থাপনাঃ পত্রাদির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

— হীরালাল বালা

কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজের অনেকাংশ জুড়ে আছে বিভিন্ন পত্রাদি লিখন। তাঁদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে নানা ধরনের পত্রালাপ করতে হয়। উপরের অফিস নীচের অফিসে এবং নীচের অফিসও উপরের অফিসে পত্রাদি পাঠায়। সরকারের মতামত, আদেশ, নির্দেশ, মঞ্জুরী, তথ্য প্রভৃতি জ্ঞাপনের জন্য মন্ত্রণালয় তার অধীন দপ্তর; স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, অধস্তন অফিস এবং ব্যক্তি বিশেষের নিকট পত্র লিখে থাকে। অধীনস্থ দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানও তাদের উপরের অফিসে কোন তথ্য, মতামত জানতে চেয়ে ও বিভিন্ন অনুরোধ জানিয়ে পত্রাদি পাঠিয়ে থাকে।

পত্র প্রাপকের নিকট মূল বক্তব্য সুন্দর, যথাযথ ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করে প্রেরকের পত্র পাঠানো উচিত। তাহলেই পত্র লেখা সার্থক হয় এবং দাপ্তরিক কাজে অনেকটা সাফল্য আসে। বিভিন্ন পত্রের ভাষা ও উপস্থাপনা যেমন বিভিন্ন হয়; তেমনি এগুলোর কাঠামোগত বিভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। একজন কর্মকর্তার কর্তব্যকর্মে সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে তিনি কতটুকু সফলতা ও সার্থকতার সঙ্গে পত্রাদি লিখে নিজের কাজ আদায় করে নিতে পারেন তার উপর।

প্রত্যেকটি পত্রের শেষে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা দরকার। "প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠানো হ'ল বা অনুরোধ করা হ'ল" এটি একটি অস্পষ্ট অনুরোধ অথবা প্রস্তাব। কি চাওয়া হচ্ছে, কিসের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে বা কি জানানো হচ্ছে, আপনার চাহিদা কি তা পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা দরকার।

পত্রাদি লেখার অনুসরণীয় নীতিমালাঃ

পত্রাদি লেখার কতগুলো নিয়মকানুন রয়েছে। সেগুলো অনুসরণ করে লিখলে অবশ্যই পত্রাদি উত্তম হবে এবং কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা সম্ভবপর হবে। পত্রাদি লেখার সময় নিম্নোক্ত ৬ টি C মনে রাখা দরকারঃ

Correct : পত্রের বক্তব্য ও পরিবেশিত তথ্যসমূহ অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ, যথাযথ ও সত্য হতে হবে। পত্রে তথ্যের ভুল ভ্রান্তি ঘটলে পত্র লেখার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে; কাজ-কর্মের দারুণ অসুবিধা ও বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। যার নিকট পত্র লেখা হচ্ছে

তিনি পত্রের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। পত্র প্রেরকও এতে ক্ষতিগ্রস্ত ও অনিশ্চয়তা সম্মুখীন হবেন।

Clear: বক্তব্য ও উপস্থাপনা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হতে হবে। অস্পষ্টতা ও অস্বচ্ছতা থাকলে ভুল সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার সম্ভাবনা থাকে। এতে আসল সত্য চাপা পড়ে যায় এবং নানা কুয়েরির সম্ভাবনা ও দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হয়। ফলে কাঙ্খিত ফল লাভে অযথা বিলম্ব ঘটে।

Complete: পত্রের বক্তব্য অবশ্যই সম্পূর্ণ হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য পত্রে অবশ্যই পরিবেশন করতে হবে। অসম্পূর্ণ বক্তব্য ও তথ্য কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। এতেও ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয় যার ফলে প্রেরক ও প্রাপক গুরুতর অসুবিধার মধ্যে নিপতিত হতে পারেন।

concise: পত্র সংক্ষিপ্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। দীর্ঘ পত্র পড়া বিরক্তিকর ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

consistent: পত্রের বক্তব্যে অবশ্যই ঐক্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণতা থাকবে। অনুচ্ছেদগুলো গুরুত্ব অনুযায়ী সাজাতে হবে। অগোছালো ও বিক্ষিপ্ত বক্তব্য কারো জন্যই শুভ নয়।

courteous: পত্রাদির ভাষা ভদ্র, শোভন ও শালীন হবে। বিদ্বেষপূর্ণ, আক্রমণাত্মক ও অশোভন ভাষা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

সচিবালয় নির্দেশমালাতে (১৯৭৬) বর্ণিত পত্রাদির প্রকারভেদ (Forms of Written communication)

(ক) সরকারী পত্র (Official Letter);

(খ) অফিস স্মারক (Office Memorandum);

(গ) আধা-সরকারী পত্র (Demi-official Note);

(ঘ) অনানুষ্ঠানিক নোট (Un-Official Letter);

(ঙ) অবগতির জন্য অনুলিপি (Endorsement);

(চ) বিজ্ঞপ্তি (Notification);

(ছ) গৃহীত প্রস্তাব (Resolution);

(জ) প্রেস ইস্তাহার/ প্রেস নোট (Press communique &Note);

(ঝ) টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার ও টেলেক্স সংবাদ (Telegram, teleprinter and telex Message);

(ঞ) অফিস আদেশ (Office order);

(ট) পরিপত্র/ সার্কুলার (Circular);

(ঠ) জরুরী পত্র (Express Letter);

(ড) সেভিংগ্রাম (Saving-gram).

উপরিউক্ত পত্রাদি ছাড়াও তাগিদ পত্র, সভা-সমিতিতে উপস্থিত থাকার জন্য দাওয়াত পত্র, ছাড়পত্র প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সরকারী পত্রঃ

(ক) সুপ্রীম কোর্ট, সরকারী কর্মকমিশন, সরকারী সংস্থাসমূহ এবং ব্যক্তি বিশেষকে সকল আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরীর বিষয় ও বার্তা জ্ঞাপনের জন্য ;

(খ) সরকারের আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরীর বিষয় সংযুক্ত দপ্তর ও অধস্তন. অফিসগুলোকে জনাবার জন্য ;

(গ) উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের অফিসগুলো তাদের উপরের অফিসে কোন কিছু চাওয়া, পাওয়া বা অনুরোধ জানানোর জন্য এবং মতামত জানতে চাওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারী পত্র ব্যবহৃত হতে পারে।

সরকারী পত্রসমূহ নিম্নবর্ণিত উপকরণ সম্বলিত হবেঃ

(ক) 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের /দপ্তরের নামযুক্ত শিরোণাম ;

(খ) পত্রের সংখ্যা ও তারিখ ;

(গ) প্রেরকের নাম (উপাধিসহ, যদি থাকে) ও পদবী ;

(ঘ) প্রাপকের পদবী ও ঠিকানা ; (নমুনা দেখুন)

সরকারী কর্মকর্তগণের নামে প্রেরিত পত্রাদির শুরুতে 'জনাব/মহোদয়' সম্ভাষণ এবং শেষে 'আপনার' অনুগত সূচক সৌজন্য-উক্তি উল্লেখ থাকেবে। বেসরকারী কর্মকর্তা বা ব্যাক্তিবর্গের নামে প্রেরিত পত্রাদির শুরুতে 'প্রিয় মহোদয়/ মহোদয়গণ' সম্ভাষণ এবং শেষে 'আপনার/আপনাদের বিশ্বস্ত' সৌজন্য- উল্লেখিত থাকবে। এ সৌজন্য উক্তির নীচে পত্র স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর ও পদবী দিতেহবে।

যে সকল সরকারী পত্র সরকারের নির্দেশের অধীনে জারী হচ্ছে বলে বুঝানো হচ্ছে না, সেগুলোর শুরুতে 'নির্দেশিত হয়ে জানাচ্ছি' না লিখে "আমি জানাচ্ছি", "বিনীত আরজ এই যে" লেখা হবে।

অফিস স্মারকঃ

(ক) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের মধ্যে চিঠিপত্র বিনিময়ের ক্ষেত্রে ;

(খ) সরকারী আদেশের সমতুল্য নয় এমন কোন তথ্য সংযুক্ত দপ্তর ও অধস্তন কর্তৃপক্ষ, বিভাগীয় কমিশনার , জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সরকারের অধীন অন্যান্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরণের ক্ষেত্রে ;

(গ) দরখাস্ত, নিয়োগের জন্য আবেদন-পত্র ইত্যাদির উত্তরদানের ক্ষেত্রে ;

(ঘ) উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের অফিসগুলো তাদের নীচের অফিসে স্মারক লিখতে পারে। তাছাড়া একই পর্যায়ের অফিসগুলোতে তথ্য প্রেরণ, মতামত জ্ঞাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্মারক লেখা যায় ;

(ঙ) নীচের দপ্তর উপরের দপ্তরে তথ্য/বিবরণী প্রভৃতি প্রেরণের ক্ষেত্রেও স্মারক ব্যবহার করতে পারে।

এটা তৃতীয় পুরুষের ভাষ্যে (In the third person) লিখতে হবে এবং এতে প্রেরণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও পদবী ব্যতীত কোন সম্ভাষণ বা উপসংহারে সৌজন্য উক্তির প্রয়োজন নেই। পৃষ্ঠার নীচে বাম কোণে প্রাপকের নাম লেখা হবে। যে স্মারক সরকারের নির্দেশে জারী হচ্ছে সে স্মারক "নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশিত হয়ে" শব্দাবলী সহকারে শুরু করা বাঞ্ছনীয় (নমুনা দেখুন)।

আধা-সরকারী পত্রঃ

কোন বিষয়ে প্রাপক ব্যক্তির ব্যক্তিগত মনোযোগ অথবা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এটা লেখা হয়। কোন বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ প্রয়োজনে আধা-সরকারী পত্র লেখা যেতে পারে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিম্নের কর্মকর্তাদের নিকট এবং অধস্তন কর্মকর্তাগণ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট অথবা একই পর্যায়ের কর্তকর্তাগণ পরস্পরের নিকট আধা-সরকারী পত্র লিখতে পারেন। আধা- সরকারী পত্র প্রাপক কর্মকর্তার নাম উল্লেখপূর্বক তার নিকট প্রেরিত হবে। এটা 'প্রিয়— নাম — জনাব —– সম্ভাষণসহ উত্তম পুরুষে এক বচনে (In the first person singular) লিখতে হবে এবং এর শেষে "আন্তরিকভাবে আপনার" সৌজন্যসূচক উক্তি থাকবে। প্রাপক- কর্মকর্তা একই পদ মর্যাদা সম্পন্ন বা কণিষ্ঠ (Junior) হলে সাধারণত 'প্রিয় ——(নাম)' সম্ভাষণ এবং যদি প্রাপক কর্মকর্তা পদ মর্যদায় পত্র লেখক অপেক্ষা এক বা একাধিক উচ্চতর পর্যায়ের হয়, তা হলে 'প্রিয় জনাব' সম্ভাষণ ব্যবহার করা হবে। অবশ্য যদি প্রাপক কর্মকর্তা পত্র-লেখক অপেক্ষা তিন বা ততোধিক উচ্চ পর্যায়ের হন, তা হলে 'প্রিয় মহোদয়' অভিবাদন ব্যবহার করা হবে। পত্র প্রেরকের নাম ও পদবী পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় শীর্ষ স্থানের নীচে টাইপ করা যাবে। প্রেরকের টেলিফোন নম্বরও অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। সাধারণতঃ আধা-সরকারী পত্র অফিস প্যাডে লেখা হয়। অফিস প্যাড না থাকলে টাইপ করেও লেখা যেতে পারে (নমুনা দেখুন)।

অনানুষ্ঠানিক নোটঃ

অনানুষ্ঠানিক নোট সংশ্লিষ্ট নথিতে লিখে প্রেরণ করা হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে এরূপ কোন নোট নথি ছাড়াও প্রেরণ করা যায়। মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহ এবং সংযুক্ত দপ্তরসমূহের মধ্যে পরামর্শের জন্য এ পদ্ধতি অনুমোদিত ক্ষেত্রসমূহে সাধারণতঃ অনুসরণ করা হয়। একই অফিসের বিভিন্ন বিভাগ, অনুবিভাগ, শাখা ও অনুশাখার মধ্যে তথ্য ও মতামত বিনিময় ও অনুরোধ জানাবার ক্ষেত্রে নোট পাঠানো যায়।

অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

যখন কোন পত্রের অনুলিপি মূল প্রাপক ছাড়াও অন্যান্যদের নিকট প্রেরণ করতে হয়, তখন নিম্নলিখিত প্রেরণ-রীতি অনুসরণ করা হবেঃ—

অবগতির জন্য /অবগতি ও অনুসরণের জন্য/প্রয়োজনীয় কার্য-ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য/ পরিপালনের (Compliacnce) জন্য — এর নিকট একটি অনুলিপি (যে পত্রের উত্তর দেয়া হয়েছে তার একখানি অনুলিপিসহ) প্রেরিত হল অবগতি, প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ, অনুসরণ এবং প্রতিপালন প্রভৃতি যে কোন ক্ষেত্রে অনুলিপি দিতে হলে তার উপরে অবশ্যাই নম্বর ও তারিখ উল্লেখ করতে হবে এবং নিম্নে যে কোন একজন কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকবে।.

বিজ্ঞপ্তিঃ

অধ্যাদেশ (Ordinance), বিধি, কানুন, আদেশ , গেজেটেড কর্মকর্তাগণের নিয়োগ, ছুটি, বদলী এবং অন্যান্য বিষয়াদি, যেগুলি বাংলাদেশ গেজেটে প্রজ্ঞাপিত করা প্রয়োজন,সেগুলির জন্য এ রীতি অনুসরণ করা হবে। তাছাড়া বৃহদাকার অফিসে কোন বিশেষ কারণে নোটীশ দেয়ার প্রয়োজন হলে অনেক সময় বিজ্ঞপ্তির আকারে প্রচার করা হয়। এগুলো অনেকটা সার্কুলার /পরিপত্রের অবয়বে লেখা হয়ে থাকে।

গৃহীত প্রস্তাবঃ

সরকারী নীতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ কমিটি বা তদন্ত কমিশন নিয়োগ এবং এরূপ সংস্থাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনগুলোর সমীক্ষার ফলাফল বাংলাদেশ গেজেটে সরকারী ঘোষণা করার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে।

প্রেস ইস্তাহার/প্রেসনোটঃ

যখন সরকারের কোন সিদ্ধান্ত/ভাষ্য প্রচার করার প্রয়োজন হয়, তখন একজন ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেস ইস্তাহার বা প্রেস নোট জারী করা হয়। এটা সাধারণতঃ তথ্য দপ্তরের সহিত পরামর্শক্রমে প্রস্তুত ও উহার মাধ্যমে জারী করা হয়।

টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টার বার্তাঃ

কেবলমাত্র জরুরী ক্ষেত্রেই টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হবে। যেখানে দ্রুত বিমান ডাক সার্ভিস চালু রয়েছে এবং এর দ্বারা উপযুক্ত অগ্রগণ্যতা চিহ্নযুক্ত পত্র প্রেরণের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সেক্ষেত্রে কোন টেলিগ্রাম প্রেরণ করার প্রয়োজন নেই। যেখানে টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস চালু রয়েছে সেখানে টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের তুলনায় বরং এটাকেই যথাসম্ভব

সর্বাধিকভাবে ব্যবহার করা উচিত। টেলিগ্রাম দু প্রকারের অর্ডিনারী ও এক্সপ্রেস। এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম অফিস প্রধানের অনুমোদনক্রমে পাঠানো হয়।

টেলিগ্রাম বা টেলিপ্রিন্টারের বার্তা সংক্ষিপ্ত ও বোধগম্য হবে, কিন্তু একে সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে এর বোধগম্যতা বিনষ্ট করা উচিত নয়। যখন কোন বার্তায় সংখ্যামালা উল্লেখ করা প্রয়োজন, তখন সেগুলি প্রেরিতব্য অনুলিপিতে শব্দে টাইপ করা হবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ– '১৯৩৬৫' সংখ্যামালাকে 'উনিশ হাজার তিনশত পঁয়ষট্টি' রূপে টাইপ করতে হবে। যদি আরও সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়, তা'হলে 'যার দ্বিগুন হল আটত্রিশ হাজার সাতশত ত্রিশ' কথাগুলিও যুক্ত করা যেতে পারে (নমুনা দেখুন)।

বার্তাসমূহের অগ্রগণ্যতা নিম্নরূপঃ

'সাধারণ' (Ordinary) বা 'জরুরী' (Express)। এটা টাইপকৃত প্রতিলিপিতে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করা হবে। সচিব/যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিবের অথবা অফিস প্রধানের কর্তৃত্বেই কেবল জরুরী টেলিগ্রামসমূহ প্রেরণ করা উচিত।

সকল ক্ষেত্রেই (সাইফার টেলিগ্রাম ব্যতীত) টেলিগ্রামগুলির অনুলিপি প্রাপকগণের নিকট ডাকে প্রেরিত হবে।

যখন কোন টেলিগ্রাম সাইফারে প্রেরণ করা হবে, তখন টেলিগ্রামের মত সংক্ষিপ্ত ইংরেজীতে না করে বরং স্বাভাবিক ইংরেজীতেই বার্তার খসড়া রচনা করা হবে। কিন্তু নিষ্প্রয়োজন বাক্‌বাহুল্য পরিহার করতে হবে। সাইফার ব্যুরোর মাধ্যমে সাইফার বার্তাগুলি প্রেরণ করা হবে। প্রেরিত সকল সাইফার টেলিগ্রামের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত শ্রেণী বিন্যাসকরণ, সম্পাদনা ও সংখ্যা প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সতর্কতার সহিত পালন করতে হবে। সাইফার বার্তা প্রেরণ যথাসম্ভব পরিহার করা হবে, কারণঃ

(১) সাইফার বার্তাসমূহ ব্যয়বহুল ;

(২) এগুলিকে সাংকেতিক ভাষায় সাজাতে এবং সে ভাষাকে স্বাভাবিক ভাষায় রূপান্তরিত করতে অধিক সময়ের প্রয়োজন এবং

(৩) নির্বিচারে ব্যবহারের ফলে ঐগুলির নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

টেলেক্স বার্তাঃ

টেলেক্স ব্যবহার আওতাধীন অফিসগুলি বাইরে অবস্থিত অফিসগুলির সহিত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে টেলিগ্রামের পরিবর্তে টেলেক্স বার্তা প্রেরণ করা যায়। বর্তমানে জেলা প্রশাসকের অফিসে টেলেক্স মেশিন বসানো হয়েছে। এর মাধ্যমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

অফিস আদেশ ঃ

অফিসে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী জ্ঞাপন ও নন-গেজেটেড কর্মচারীগণের নিয়োগ, পদোন্নতি, ছুটি ইত্যাদি বিজ্ঞাপিত করার জন্য এ রীতি ব্যবহার করা হয়। জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয় সদর দপ্তরে অবস্থিত দপ্তর সমূহে অফিস প্রধান কর্তৃক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বিশেষ কোন দায়িত্ব প্রদানকালে অফিস আদেশ প্রদান করা হয় (নমুনা দেখুন)।

পরিপত্র/ সার্কুলার ঃ

সার্কুলার/পরিপত্রসমূহ ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজন অনুযায়ী পত্র, স্মারকপত্র বা অবগতির জন্য অনুলিপির (Endorsement) আকারে হতে পারে। সার্কুলার/পরিপত্র সমূহ সাধারণপত্র হতে কেবল এটুকুই পৃথক যে, এগুলো একাধিক অফিস বা ব্যক্তিবর্গের নামে জারী হয়। মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সকল শ্রেণীর দপ্তর হতে পরিপত্র জারি হতে পারে (নমুনা দেখুন)।

জরুরী পত্রঃ

টেলিগ্রামসমূহের ব্যবহার যথাসম্ভব হ্রাস করে ব্যয় সংকোচের উদ্দেশ্যে জরুরী পত্র প্রেরণের সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। এধরনের জরুরী পত্রে টেলিগ্রামের অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করা হয়। জরুরী পত্র ডাকযোগে প্রেরিত হয়; কিন্তু ইহার প্রাপক একে টেলিগ্রামের সম-জরুরী বলে গণ্য করবেন।

সেভিংগ্রামঃ

এটা কোন জরুরী পত্রেরই সাংকেতিক অনুবাদ স্বরূপ (Coded version) এবং এটা গোপনীয় ধরণের বহির্দেশীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এটা কূটনৈতিক ব্যাগে রেজিস্টার্ড বীমাকৃত ডাকে প্রেরণ করা হয়। অন্যান্য সকল দিক দিয়ে এটা সাইফার টেলিগ্রামের ন্যায় বিবেচিত হয়।

টেলিফোন যোগাযোগঃ

সম্পূর্ণভাবে রুটিনবাঁধা বিষয়াদিতে, লিখিতভাবে যোগাযোগ করবার প্রয়োজন নেই, এমন সব ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ টেলিফোনে অপরাপর অফিস/পার্টির সহিত যোগাযোগ করতে পারে। টেলিফোন অবশ্যই অফিসের কাজে ব্যবহার করা উচিত। টেলিফোনে কথা-বার্তা নীচু স্বরে হলে ভাল হয়। টেলিফোন কল গ্রহীতা প্রথমেই তার নাম ও পদবী বলবেন এবং ধীরও স্থিরভাবে আলাপ করবেন।

অত্যন্ত জরুরী বিষয়াদিতে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ—স্থানীয় ও বাইরে অবস্থিত অন্যান্য অফিস ও পার্টির সহিত টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারে। প্রয়োজনবোধে, এরূপ টেলিফোন যোগাযোগের পর যথানিয়মে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।

গ্রাহক ট্রাংক ডায়েলিং (Subscribers Trank dialing) কলসহ টেলিফোন ট্রাংককলের ব্যবহার বিভাগীয় নির্দেশাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

তাগিদপত্রঃ

উপরের অফিসে তাগিদপত্র প্রেরণের ক্ষেত্রে সরকারী পত্রের নমুনা ব্যবহার করা যায়। নীচের অফিসে স্মারক ব্যবহার করা শ্রেয়।

দাওয়াতপত্রঃ

মিটিং ও সভায় উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়ে এ পত্র পাঠানো হয়। এটা সরকারী পত্রে বা অফিস স্মারক অথবা দুয়ের মিশ্রণে লেখা যেতে পারে।

ছাড়পত্রঃ

যে কোন কর্মস্থল থেকে অব্যাহতি দেওয়া বা রিলিজ করার ক্ষেত্রে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। ছাড়পত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। সচিবালয় নির্দেশমালা ১৯৭৬, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা ১৯৭৯ পৃঃ ৩৪-৩৮।

২। এম, এ, হাওলাদার, বাংলা ভাষায় খসড়া ও সারসংক্ষেপ লিখন পদ্ধতি, পৃঃ ২৬-৪৬।

৩। Kshanada Mohan Das, Training Manual, vol. I, 1982 STI. Dhaka, pp. 248-254.

সরকারী পত্রের নমুনা

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা।

০৭-০৭-১৩৯৬ বাং
তারিখঃ ———————
২২-১০-১৯৮৯ ইং

নং- বিপিএটিসি/ আর এণ্ড ডি/আর-৫০/৮৯-

প্রেরক ঃ হীরালাল বালা
পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

প্রাপক ঃ সচিব,
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ জনাব মোঃ ইদ্রিস আলী, উপ-সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

বিষয় ঃ এস, আর-১২ অনুসারে গবেষণা প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম-পরিচালকদের প্রাপ্ত ফি এর এক তৃতীয়াংশ কেন্দ্র কর্তৃক কর্তন ও সরকারী খাতে জমা দান সংক্রান্ত।

মহোদয়,

নির্দেশিত হয়ে আপনাকে জানাচ্ছি যে, বিপিএটিসি'র ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত গবেষণা/ ঘটনা সমীক্ষা প্রকল্প সমূহের পরিচালক ও যুগ্ম-পরিচালকদের প্রাপ্ত ফি এর এক তৃতীয়াংশ এস, আর -১২ অনুসারে সরকারী খাতে তাঁদের স্বীয় উদ্যোগে জমা দেবার বিধান প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু জমা দান ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যাত্যয় পরিলক্ষিত হওয়ায় বিগত ৫/১০/৮৯ ইং তারিখে কেন্দ্রের গবেষণা কমিটির সভায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে কেন্দ্র কর্তৃক সকল পরিচালক ও যুগ্ম- পরিচালক এর প্রাপ্ত ফি এর এক- তৃতীয়াংশ কর্তন পূর্বক সরকারী খাতে জমাদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এমতাবস্থায় কেন্দ $\frac{১}{৩}$ অংশ ফি কর্তন পূর্বক সরকারী খাতে জমা দানের বিষয়টি সদয় অনুমোদন করার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার অনুগত,

(হীরালাল বালা)
পরিচালক (গঃ ও উঃ)

স্মারকের নমুনা

অতীব জরুরী
বিশেষ বাহক মারফৎ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
অঃ প্রঃ শাখা–১

নং-সম (অঃ প্রঃ- ১) / পিএটিসি-২৮/৮৯- তারিখঃ ————

অফিস স্মারক

বিষয়ঃ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (বিপিএটিসি) একটি নতুন ও আধুনিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন সংক্রান্ত।

উপরোক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (বিপিএটিসি) রেক্টর মহোদয়ের ২৯-৮-৮৯ ইং তারিখের বিপিএটিসি /ল জিঃ— ১১/৮৯-১১১৫ নম্বর আধা-সরকারী পত্রের অনুলিপি এতদ্‌সংগে প্রেরণ পূর্বক নির্দেশ ক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, বিপি এ টি সির বর্তমান টেলিফোন এক্সচেঞ্জটি সুইডেনে তৈরী একটি ক্রসবার এক্সচেঞ্জ যা বেশ পুরানো হয়ে গিয়েছে। একাধিকবার সার্ভিসিং করা সত্ত্বেও এ থেকে আশানুরূপ সেবা পাওয়া যাচ্ছে না এবং খুচরা যন্ত্রাংশের অভাবে এর রক্ষণবেক্ষণের কাজও দুরূহ হয়ে পড়েছে। উপরন্তু, গত বৎসরের প্রয়লংকারী বন্যার ফলে টেলিফোন এক্সচেঞ্জটির কার্যকারিতা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। ফলে বিভিন্ন কোর্স পরিচালনাসহ ঢাকার ভিতরে ও বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন দপ্তর/ প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাভাবিক টেলিফোনিক যোগাযোগে দারূণ অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, কেন্দ্রের যাবতীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে বিপিএটিসিতে জরুরী ভিত্তিতে একটি নতুন ও আধুনিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

(দ্বিজেন্দ্রনাথ বেপারী)
উপ-সচিব
ফোনঃ ২৪০৮০৯

প্রাপক ঃ চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড,
রমনা, ঢাকা।

নং-সম(অঃ প্রঃ-১/ পিএটিসি-২৮/৮৯ তারিখ ঃ ————

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ
রেক্টর, বিপিএটিসি, সাভার ,ঢাকা।

(মোঃ ইমদাদুল হক)
সহকারী সচিব

আধা-সরকারী পত্রের নমুনা

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

হীরালাল বালা
কোর্স পরিচালক
অষ্টম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স

আধা-সরকারী পত্র নং-বিপিএটিসি/পিপিআর/প্রোঃ/১৭২/৮৯ তারিখ ০২-০৮-১৯৮৯ / ১৮-০৪-১৩৯৬

প্রিয় আবদুস সামাদ,

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিগত ২২ শে জুলাই থেকে ৮ম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স আরম্ভ হয়েছে। কোর্সটি ২১ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত হবে। কোর্সের আবশ্যকীয় অঙ্গ হিসেবে ৫দিনের শিক্ষা সফর কার্যক্রম নির্ধারিত রয়েছে। বর্তমান কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ ' পল্লী বাংলায় ১৯৮৮ সালের বন্যা ' বিষয়ের উপর সমীক্ষা পরিচালনার জন্য উপজেলা থেকে তথ্য সংগ্রহ ও স্থানীয় জনগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন।

২। উপরোক্ত কার্যক্রমে ৫ জন প্রশিক্ষণার্থী আগামী ২৫ শে আগষ্ট ' ৮৯ ইং আপনার উপজেলায় গমন করবেন এবং সেখানে ৫দিন অবস্থানের পর ৩০ শে আগষ্ট কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন করবেন। তাঁদের সাথে কেন্দ্রের ১ জন অনুষদ সদস্য গাইড হিসেবে সফরসঙ্গী হবেন। তাঁরা বিগত ৮৮ এর বন্যা কবলিত ২টি গ্রাম পরিদর্শন করবেন এবং কতিপয় গ্রামবাসীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন। উপজেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকেও বিগত বন্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে।

৩। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সফরকালে উল্লিখিত ৬ জন কর্মকর্তার কার্যক্রম পরিচালনায় আপনার সার্বিক সহযোগিতা শিক্ষা সফরকে সফল ও সার্থক করে তুলবে। প্রশিক্ষণার্থীদের অবস্থানকালে আবাসিক ও পরিদর্শন সুবিধাসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদানের জন্য আপনাকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। কেন্দ্রের প্রতি আপনার নিরবচ্ছিন্ন সহায়তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

শুভেচ্ছান্তে, আন্তরিকভাবে আপনার

জনাব আবদুস সামাদ,
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (হীরালাল বালা)
ফরিদপুর।

STATE EXPRESS TELEGRAM

UPAZILA NIRBAHI OFFICER
SONARGAON
NARAYANGANJ

KINDLY REFER OUR DEMI OFFICIAL LETTER DATED SECOND AUGUST REGARDING STUDY TOUR OF FOUNDATION TRAINEES IN YOUR UPAZILA (STOP) FIVE TRAINEES WILL REPORT TO YOUR UPAZILA ON TWENTY FIFTH AND STAY UPTO THIRTIETH AUGUST (STOP) PLEASE ARRANGE ACCOMMODATION IN DAKBUNGALOW COMA HOTELS COMA HOSTELS AND HOST FAMILIES IF NECESSARY (STOP)

DIRECTOR
BPTC, SAVAR

NOT TO BE TELEGRAPHED

Sd-
DIRECTOR

NO. BPATC&PPR& PRO& 172&89-884 (42) DATED 19TH, AUG, 1989

Copy by post in confirmation is forwarded to:

(1) Upazila Nirbahi Officer,
Sonargaon,
Narayanganj.

Sd/-
Director
BPATC, Savar, Dhaka.

সার্কুলারের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
.... মন্ত্রণালয়, ঢাকা

সার্কুলকার নং – প্রশ–৬/৫৩/৮৪– তারিখঃ ____________

সরকার সদয় হইয়া এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, সকল সরকারী অফিস/স্বায়ত্তশাসিত/ আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সমূহে রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি হিসাবে পালন করা হইবে।

এই আদেশ আগামী ....তারিখ হইতে কার্যকর হইবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এই মর্মে অবহিত করা যাইতে পারে।

স্বাক্ষর ____________________

নাম ____________________

পদবী ____________________

তারিখ ____________________

অফিস আদেশের
নমুনা

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

নং ব ৬–৬৪০/৯০–৬১৮৪

তারিখ ঃ ১১–৪–৯০ইং / ২৮–১২–৯৬ বাং

অফিস আদেশ

এতদ্বারা কেন্দ্রের সকল সাঁট মুদ্রাক্ষরিকগণকে জানানো যাচ্ছে যে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সহকারী পরিচালক (সাধারণ) জনাব মোঃ ইসমাইল কেন্দ্রের যাবতীয় মুদ্রাক্ষর কাজের সমন্বয় সাধন করবেন। তাঁর নিকট হতে মৌখিক অথবা লিখিতভাবে কোন নির্দেশ কোন সাঁট–মুদ্রক্ষরিক বা মুদ্রাক্ষরিকের নিকট পৌছাবার সাথে সাথে তা পালন করবার জন্য আদিষ্ট হয়ে নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে। তবে হাতে মুদ্রাক্ষরের বিশেষ জরুরী কোন কাজ থাকলে সে ক্ষেত্রে তা অবহিত করতে হবে।

যে সব শাখায় মুদ্রাক্ষরিকের পদ নাই সে সব শাখার মুদ্রাক্ষরের কাজ সম্পন্ন করাবার জন্য সে সব শাখার প্রধানগণকে সরাসরি সহকারী পরিচালক (সাধারণ) এর সাথে যোগাযোগ করবার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সহকারী পরিচালক (কর্মী প্রশাসন)

বিতরণঃ

১। রেক্টর মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিপিএটিসি, সাভার ঢাকা।

২। সকল কর্মকর্তা, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

৩। সকল সাঁট মুদ্রক্ষরিক, বিপিএটিসি, সাভার ঢাকা।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ

— সৈয়দ শামসুল আলম

ঐতিহাসিক পটভূমি

মানব সভ্যতার ইতিহাসে মৎস্য একটি অতি প্রাচীন এবং অন্যতম খাদ্য–সামগ্রী। মানুষের জীবিকা নির্বাহের বিবর্তন পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, প্রাচীন কালের মানুষ প্রথমে মৎস্য অথবা পশু শিকার করে তাদের যাযাবর জীবন যাপন করত। নৃতত্ত্ববিদ, ভূগোলবিদ এবং ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন সভ্যতার যে সকল স্থান চিহ্নিত করেছেন, তন্মধ্যে মেসেপটেমিয়া (ইরাক), নীল–নদের উপত্যকা (মিশর) এবং সিন্ধু উপত্যকা (পাকিস্তান) সমূহের সভ্যতা নদীর উপকূল এবং নদীর পানি ভিত্তিক গড়ে উঠেছিল।

বাংলাদেশ এই উপ–মহাদেশের একটি অন্যতম নদী–বহুল দেশ। সংগত কারণে এদেশের আদি মানুষ মৎস্য শিকার এবং উর্বর প্লাবন ভূমিতে কৃষি কাজ করত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এই জন্যই সম্ভবতঃ " মাছে–ভাতে বাঙালী " এই প্রবাদটি যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের উপ–কথায় এবং গল্প–সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে প্রাচীন কালে কৃষি কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের পূর্বে আদি মানুষের প্রথম পেশা ছিল মৎস্য শিকার। বিশেষজ্ঞদের উপরোক্ত মতামতের আলোকে প্রচলিত " মাছে ভাতে বাঙালী " প্রবাদটিতে তার সমর্থন পাওয়া যায়।

মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব

বাংলাদেশের কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৮৭–৮৮ অর্থ বৎসরে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) শতকরা ৫০.১৮ ভাগ কৃষি খাতের মধ্যে মৎস্য সম্পদ উপ–খাতের অবদান শতকরা ৫ ভাগের অধিক (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৬–৮৭)। মৎস্য এবং মৎস্যজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করে ১৯৮৬–৮৭ সনে ৪২২.৩৯ কোটি টাকা অর্থাৎ দেশের সমগ্র রাপ্তানি আয়ের শতকরা ১১ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়েছে (ইকনমিক রিভিউ ১৯৮৭–৮৮)। এই উপ–খাতে বর্তমানে দেশে মোট ১১ মিলিয়ন পূর্ণকালীন এবং খণ্ডকালীন মৎস্য জীবি নিয়োজিত রয়েছে। এরমধ্যে পূর্ণকালীন পেশাজীবি জেলের সংখ্যা ১.১৯ মিলিয়ন এবং খণ্ডকালীন মৎস্য জীবির সংখ্যা ১(এক) মিলিয়ন (পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ১৯৮৭)।

গত তিন দশকে মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের জন্য সরকারী ভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন মুখী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এবং এজন্য কোটি কোটি দেশী ও বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করা হলেও দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমাদের মৎস্য গ্রহণের পরিমান দৈনিক মাথাপিছু প্রয়োজনীয় ৪২ গ্রামের স্থলে ১৯৬৩-৬৪ সনে ৩৩ গ্রাম হতে ১৯৮৪-৮৫সনে ২১ গ্রামে দাঁড়িয়েছে। তথাপি এ দেশের জনগণের অতি প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষ শতকরা ৮০ ভাগ আসে এই মৎস্য থেকে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বাংলাদেশ নদী মাতৃক বিধায় মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রচুর এবং দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণে মৎস্য সম্পদ খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশে বিদ্যমান অফুরন্ত পানি সম্পদে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ করে দেশের মোট চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে মৎস্য এবং মৎস্যজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং সেই সঙ্গে দেশের বেকার সমস্যা সমাধান, খাদ্য ঘাটতি পুরণ এবং অবহেলিত মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব। মৎস্য সম্পদ বলতে আজ শুধু জেলে, জাল ও মৎস্য শিকার নয়। বর্তমান যুগে মৎস্য শিল্প এক বহুমুখী বিজ্ঞান ভিত্তিক কর্মকাণ্ড। তাই আধুনিক মৎস্য শিল্প বলতে আমরা বুঝি বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্য চাষ, আহরণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাত করণ, আধুনিক ট্রলার, যান্ত্রিক নৌকা, জাল কারখানা, মৎস্য অবতরণ ঘাঁটি, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরণের হিমাগার, হিমাগার সম্বলিত গাড়ী ও ভ্যান, মৎস্য পরিবহনের সামুদ্রিক জলযান, উন্নত স্বাস্থ্য সম্মত মৎস্য নিলাম কেন্দ্র, পাইকারী মৎস্য বাজার, খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি মৎস্য শিল্পের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ১৯৮৬-৮৭ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে মৎস্য উৎপাদন হয়েছিল ৮ লক্ষ ১৪হাজার মেট্রিক টন। মোট উৎপাদনের চাইতে বেশী পরিমান চাহিদা দেশে থাকা সত্বেও গতবৎসর মৎস্যজাত দ্রব্যাদি রাপ্তানী করে ৪২২.৩৯ কোটি টাকা আয় করা হয়। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝাযায় আমাদের অর্থনীতি প্রত্যক্ষ ভাবে মাছ সম্পদের সাথে জড়িত। এদেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় করতে মৎস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশের মৎস্যের উৎস্য

বাংলাদেসের মৎস্য প্রাপ্তির এলাকা সমূহকে প্রধানতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় যেমনঃ-

(১) অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্র এবং

(২) সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র।

উপরোক্ত এই উৎস গুলোকে বিশেষজ্ঞরা আবার কয়েকটি উপ-ভাগে ভাগ করেছেন। নিম্নের সারণীতে আভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্রের বিবরণ পেশ করা হলো।

আভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্র (ইনল্যাণ্ড ফিসারিজ) ১৯৮৫-৮৬

সারণী-১

(ক) উন্মুক্ত জলাশয়ঃ-

উৎসের নাম	আয়তন (হেক্টর)	শতকরা হারে	উৎপাদন (মেঃ টন)	শতকরা হারে
(১) নদী ও মোহনা	১০,৩১,৫৬৩	২৪.২৫	২,০৭,৭৬৬	২৭.৫২
(২) বিল	১,১৪,১৬১	২.৬৮	৫১,৩৭৩	৬.৮১
(৩) কাপ্তাই হ্রদ	১,৬৮,৮০০	১.৬১	৪,০৫৭	০.৫৩
(৪) প্লাবন ভুমি	২৮,৩২,৭৯২	৬৬.৬০	২,০০, ৬১৬	২৬.৫৮
মোট	৪০,৪৭,৩১৬	৯৫.১৪	৪,৬৩,৮১২	৬১.৪৪

(খ) চাষাধীন জলাশয় ঃ-

(১) পুকুর ও দীঘি	১,৪৮,৩৪৬	৩.৪৮	১,০৯,৩৩৩	১৪.৪৮
(২) বাওর সমূহ	৫,৪৯৯	০.১৫	৮৬২	০০.১১
(৩) চিংড়ি খামার	৫৯,৮১২	১.২৪	৮,২১৯	০১.০৮
মোট	২,০৫, ৬৪৬	৪.৮৬	১,১৮,৪১৪	১৫.৬৭
সর্ব মোট (ক+খ)	৪২,৫২,৯৬২	১০০	৫,৮২,২২৬	৭৭.১১

উৎস ঃ- পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী ১৯৮৭-৮৮

সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্রের পরিমান ৪২,৫২,৯৬২ হেক্টর এবং দেশের সামগ্রীক উৎপাদনের (৫,৮২,২২৬ মেঃ টন) ৭৭.১১ ভাগ মৎস্য পাওয়া যাচ্ছে এই উৎস থেকে। বাংলাদেশে উন্মুক্ত জলাশয়ের মোট আয়তন ৪০,৪৭,৩১৬ হেক্টর, শতকরা হারে মোট আয়তনের ৯৫.১৪ ভাগ। এর মধ্যে প্লাবন ভূমি মোট আয়তনের ৬৬.৬০ ভাগ, নদী ও মোহনা ২৪.২৫, বিল এবং বিল জাতীয় এলাকা ২.৬৮ এবং কাপ্তাই হ্রদ ১.৬১ ভাগ।

১৯৮৫–৮৬ সালে উক্ত ক্ষেত্র সমূহে মোট ৪,৬৩,৮১২ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন হয়েছে। যা শতকরা হিসাবে মোট উৎপাদনের ৬১.৪৪ ভাগ। এর মধ্যে নদী ও মোহনায় ২৭.৫২ (২,০৭,৭৬৬ মেঃ টন) প্লাবন ভূমিতে ২৬.৫৮ (২,০০,৬১৬ মেঃ টন) বিল এলাকায় ৬.৮০ (৫১,৩৭৩ মেঃ টন) এবং কাপ্তাই হ্রদে ০.৫৩ (৪,০৫৭ মেঃ টন) ভাগ।

অপরদিকে অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্রের চাষাধীন জলাশয়ের মোট আয়তন ২,০৫,৬৪৬ হেক্টর অর্থ্যৎ শতকরা হারে মোট আয়তনের ৪.৮৬ ভাগ। এর মধ্যে পুকুর ও দীঘি ৩.৪৮(১,৪৮, ৩৪৬ হেক্টর), চিংড়ি এলাকা ১.২৪ (৫১,৮১২ হেক্টর), এবং বাওর সমূহ ০.১৫ (৫, ৪৮৮৮ হেঃ) ভাগ। ১৯৮৩–৮৪ সালে চাষাধীন জলাশয়ে ১,১৮,৪১৪ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন হয়েছে, যা আভ্যন্তরীণ মৎসের মোট উৎপাদনের শতকরা হিসাবে ১৫.৬৭ ভাগ। এর মধ্যে ১৪.৪৮ (১,০৯,৩৩৩ মেঃ টন) ভাগ পুকুর ও দীঘিতে, ০১·০৮(৮,২১৯ মেঃ টন) ভাগ চিংড়ি খামারে এবং ০০.১১ (৯৬২ মেঃ টন) বাওর সমূহে।

সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র

বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমান্তে রায়মঙ্গল থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরে ৭২০ কিলোমিটার (৪৫০মাইল) দীর্ঘ এলাকায় বিপুল পরিমান মাছ বিচরণ করে থাকে। ১৯৭৯ সালে জেনেভা সম্মেলনে সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন অনুসারে বাংলাদেশ তার উপকূল থেকে ৩২০ কিলোমিটার (২০০ মাইল) গভীর সমুদ্র পর্যন্ত এলাকা সার্বিকভাবে ব্যবহার (এক্সক্ল্যোসিব ইকনমিক জোন) করার ক্ষমতা রাখে। বঙ্গোপসাগরের সহীসোপানের (কন্টিন্যানটাল সেল্‌ফ) মোট পরিমান হচ্ছে ৬,০০০,০০(ছয় লক্ষ) বর্গ কিলোমিটার এর মধ্যে বাংলাদেশ বরাবর সহীসোপানের পরিমান হচ্ছে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) বর্গ কিলোমিটার।

১৯৬৯–৭০ সালে ফাও; ইউএনডিপি, এবং মৎস্য উন্নয়ন সংস্থার যৌথ সহযোগিতায় এক জরীপে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে উপরোক্ত এলাকা সমূহে রয়েছে এক বিরাট মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্র। এই মৎস্য ক্ষেত্রের ৪৭৫ টি প্রজাতির মধ্যে ১৩২ টি আবিস্কৃত হয় এই এলাকায় এবং এর ৪২ টি প্রজাতি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আহরণ করা হচ্ছে। এরমধ্যে চিংড়ি মাছই রয়েছে ১৮ প্রকারের। উক্ত প্রতিবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ বঙ্গোপসাগরে ৪টি মৎস্যক্ষেত্রের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।

মৎস্য ক্ষেত্রগুলোঃ–

(১) বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্র

নদীর মিঠা পানি এবং সমুদ্রের লবনাক্ত মিশ্রণ এবং জোয়ার ভাটা এই ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট। পানির গভীরতা কম বলে এই এলাকা মৎস্য প্রজননের জন্য খুবই উপযোগী।

(২) দক্ষিণ পশ্চিম মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্র

এখানে গভীরতা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশী। বাণিজ্যিক দিক থেকে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ক্ষেত্র। মাছের মধ্যে গ্রান্টার, ক্যাটফিস এবং কাপার উল্লেখ যোগ্য।

(৩) নিমগ্ন মহা সাগরের বিচরণ ক্ষেত্র

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মূল্যবান অথচ অধিক পরিমানে মাছ এ ক্ষেত্রে উল্লেখ জনকভাবে পাওয়া যায়।

(৪) নিমগ্ন মহাগহ্বরের পূর্ব দিক

এখানে পানির গভীরতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। ফলে গভীর সমুদ্রে মাছ চাষের জন্য ক্ষেত্রটি অধিকতর উপযোগী এবং বৎসরের সব সময় পর্যাপ্ত মাছ পাওয়া যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম দেশ। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় এই বিপুল পরিমান মৎস্য ক্ষেত্রে আমরা দেশের মোট উৎপাদনের মাত্র ২২ .৯ ভাগ মৎস্য পাচ্ছি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন সরকারী উপযুক্ত নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলে বিশাল এই মৎস্য ক্ষেত্র হতে বর্তমান উৎপাদনের চেয়ে কয়েকশত গুণ বেশী মৎস্য উৎপাদন করা সম্ভব। নিম্নে সামুদ্রিক মৎস্যের উৎপাদন (১৯৮৫–৮৬) দেখা যেতে পারে ঃ–

সারণী–২

উৎস	উৎপাদন	শতকরা
১। বাণিজ্যিক ভিত্তিক (যান্ত্রিক বড় ট্রলার দ্বারা ধৃত)	১৯,৪৮৪	২.৫৮
২। ক্ষুদ্র জেলেদের দ্বারা ধৃত	১,৫৩,০০০	২০.২৭
মোট	১,৭২,৪৮৪	২২.৮৫

উৎসঃ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী, ১৯৮৭–৮৮

মৎসের উৎপাদন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মৎস্য আমাদের খাদ্যে এবং পুষ্টিতে আবহমান কাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মৎস্যই এই অঞ্চলের জনগনের খাদ্য এবং পুষ্টিতে সবচেয়ে মূল্যবান প্রাণিজ প্রোটিন জুগিয়ে আসছে। দেশের ক্রম বর্ধমান জন সংখ্যার চাপে মৎস্যের চাহিদা বাড়ছে কিন্তু মৎস্য উৎপাদনের বৃদ্ধির পরিমান অতি নগণ্য (স্মারণী–৩)। এর ফলে জনপ্রতি মৎস্য সরবরাহ ও ব্যবহার ক্রমেই কমে আসছে।

সারণী–৩

অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্যের উৎপাদন (হাজার মেট্রিক টন)

বৎসর	অভ্যান্তরীণ	শতকরা	সামুদ্রিক	শতকরা	মোট
১৯৬৫–৬৬	৭২০	৮৯.৮৯	৮১	১০.১১	৮০১
১৯৭০–৭১	৭২৯	৮৯.৫৬	৮৫	১০.৪৪	৮১৪
১৯৭৫–৭৬	৫৪৫	৮৫.১৬	৯৫	১৪.৮৪	৬৪০
১৯৮০–৮১	৫২৫	৮০.৭৭	১২৫	১৯.২৩	৬৫০
১৯৮৫–৮৬	৫৮৭	৭৩.১২	২০৭	২৬.০৭	৭৯৪
১৯৮৬–৮৭	৫৯৭	৭৩.৩৪	২১৭	২৬.৬৬	৮১৪

উৎসঃ মৎস্য বিভাগ, ১৯৮৮–৮৯

ওপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনের পরিমান ১৯৬৫–৬৬ সনে ছিল ৭২০ হাজার মেট্রিক টন. গত ২০ বৎসর পরেও আমরা সেই ১৯৬৫–৫৫ সালের সমপরিমান মৎস্য উৎপাদন করতে সক্ষম হই নাই। তবে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের পরিমান গত ২০ বৎসরে আড়াই গুণ বেড়েছে। গত ১৯৮৬–৮৭ সালে অভ্যন্তরীণ এবং সামুদ্রিক মৎস্য মিলে মোট উৎপাদন মাত্র ৮,১৪,০০০ (আট লক্ষ চৌদ্দ হাজার) মেট্রিক টন অর্থাৎ ১৩ হাজার টন বেশী।

মৎসের চাহিদা ও উৎপাদন

পৃথিবীতে জনপ্রতি গড়ে দৈনিক মৎস্য ব্যবহারের পরিমান যেখানে ৩২ গ্রাম সেখানে বাংলাদেশে গড়ে জনপ্রতি দৈনিক ১৯৮০ সনের গোড়ার দিকে নেমে এসেছে মাত্র ২০ গ্রাম (এম, পি, ও; ১৯৮৪) । এই কমে যাওয়া প্রোটিনের পরিমান অন্য কোন উৎস যেমন মাংস, দুধ এবং ডিম থেকে প্রয়োজন অনুসারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। মৎস্য মোট জৈব প্রোটিনের শতকরা ৭০ থেকে ৮০ভাগ সরবরাহ করে এবং এই পরিমান আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও পুষ্টি ইনষ্টিটিউট মৎস্যের ব্যবহার আরো শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধির সুপারিশ করেছেন। যাতে বর্তমানে মৎস্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত মোট প্রোটিনের শতকরা ৬ ভাগের স্থলে ১০ ভাগে উন্নীত করা যায়। নিম্নের সারণীতে (সারণী– ৪) ১৯৮০ সন থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সংগে মৎস্যের ব্যবহার ও চাহিদার তুলনামূলক চিত্র দেখানো হয়েছে। এই চিত্রের মাধ্যমে মৎস্য সম্পর্কে তিনটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমটি হল বর্তমানে অভ্যন্তরীণ মৎস্যের উৎপাদন যদি আগামী ২০১০ মণ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনপ্রতি মৎস ব্যবহারের পরিমাণ কোথায় এসে দাঁড়াবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিকটি হল অপরিবর্তনীয় মৎস ব্যবহারের পরিমাণ জনপ্রতি ২০.১ গ্রাম রাখতে হলে আমাদের উৎপাদন কতটুকু বাড়াতে হবে এবং বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ অনুসারে জনপ্রতি মৎসের ব্যবহার ২০.১ গ্রাম থেকে ৩৮.০ গ্রামে উন্নীত করতে উৎপাদন কত পরিমাণ বাড়াতে হবে।

স্মারণীঃ ৪ঃ

বাংলাদেশে মৎস্যের জনপ্রতি ব্যবহার ও মৎস্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধির ঃ তিন পর্যায়ের চিত্র অপরিবর্তনীয় মৎস্য উৎপাদন (১৯৮০ সন ভিত্তি হিসাবে)

বৎসর	জনসংখ্যা (মিলিয়নে)	মৎস্য ব্যবহার জনপ্রতি দৈনিক (গ্রাম ব্যবহার)	মৎস্য উৎপাদন (০০০ মেট্রিক টন)
১৯৮০	৮৮.৭	২০.১	৬৫০
১৯৮৫	৯৮.১	১৮.২	৬৫০
১৯৯০	১০৮.৫	৯৫.৪	৬৫০
১৯৯৫	১১৮.৩	০.১	৬৫০
২০০০	১২৭.৯	৯৩.৯	৬৫০
২০০৫	১৩৭.৯	১২.৯	৬৫০
২০১০	১৪৭.৬	১২.১	৬৫০
২. অপরিবর্তনীয় মৎস্য ব্যবহার			
১৯৮০	৮৮.৭	২০.১	৬৫০
১৯৮৫	৯৮.১	২০.১	৭২০
১৯৯০	১০৮.৫	২০.১	৭৯৬
১৯৯৫	১৯৮.৩	২০.১	৮৬৮
২০০০	১২৭.৯	২০.১	৯৩৮
২০০৫	১৩৭.৯	২০.১	১০১২
২০১০	১৪৭.৬	২০.১	১০৩৮
৩. সুপারিশকৃত পর্যায়ে বর্ধিত ব্যবহার			
১৯৮০	৮৮.৭	২০.১	৬৫০
১৯৮৫	৯৮.১	২২.২	৭৯৫
১৯৯০	১০৮.৫	২৩.৭	৯৩৯
১৯৯৫	১১৮.৩	২৭.৬	১৯৯১
২০০০	১২৭.৯	৩০.৯	১৪৪৩
২০০৫	১৩৭.৯	৩৪.৭	১৭.৪৫
২০১০	১৩৭.৬	৩৮.০	২০৮৭

উৎসঃ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী সমূহ ও এম, পি, ও, ১৯৮৭

সারণী (৪) থেকে দেখা যায় যে যদি মৎস্য উৎপাদন অপরিবর্তিত থাকে তবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রতি দৈনিক মৎস্য ব্যবহার ক্রমন্বয়ে কমে ২০১০ সাল নাগাদ দাঁড়াবে ১২.১ গ্রামে। আবার মৎস্য ব্যবহার অপরিবর্তিত রাখলে ২০১০ সাল নাগাদ মৎস্যের প্রয়োজন হবে ১০৩৮ হাজার মেট্রিক টন। অপরদিকে খাদ্য ও পুষ্টি ইনষ্টিটিউট কর্তৃক সুপারিশকৃত মৎস্য সরবরাহ করতে হলে ২০১০ সালে মৎস্যের প্রয়োজন হবে ২০৪৭ হাজার টন, যা কিনা বর্তমান উৎপাদন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় অসম্ভব বলেই ধারণা করা যায়।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের সম্ভাব্যতা

বর্তমানে দেশের উৎপাদিত মৎস্যের শতকরা ৭৭ ভাগেরও বেশী অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে সংগৃহীত হয়। অভ্যন্তরীণ জলাশয়কে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় যেমনঃ (১) উন্মুক্ত (২) বদ্ধ ও (৩) উপকূলীয় জলাশয়। নদী, প্লাবনভূমি পানি সেচ খাল ও নিম্নাঞ্চল (বিল ও হাওর) উন্মুক্ত অঞ্চলের অন্তর্গত।

উন্মুক্ত জলাশয়ে প্রধানতঃ নদীর মাছের চলাচলের প্রকৃতি ঋতুভিত্তিক মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত। মৎস্যের চলাচল এবং অভিগমন নদীতে স্রোতের অনুকূলে অথবা প্রতিকূলেই বৎসরের অধিকাংশ সময় হয়ে থাকে কিন্তু বর্ষা ঋতুতে মৎস্য প্লাবনভূমি মৎস্যের প্রজনন, স্বল্প সময়ে বর্ধন ও উৎপাদনের সবচেয়ে সুবিধাজনক স্বাভাবিক বাসস্থান।

দুঃখের বিষয় উন্মুক্ত জলাশয়গুলি অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারের চাপে পরিবর্তিত হচ্ছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও পানি সেচের ক্রমবর্ধমান কর্মসূচী আমাদের সম্পূর্ণ পানি ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে এবং মোট প্লাবনভূমি ও নদী অঞ্চলের পরিমান ক্রমেই কমে যাচ্ছে এবং জলাশয়গুলির গুণগত মানেরও ক্রমাবনতি ঘটছে। বাংলাদেশের উন্মুক্ত পানি অঞ্চল থেকে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ সারণী ৫–এ দেওয়া হলোঃ–

সারণী-৫

জলাশয়ের প্রকারভেদ নিরূপিত (এষ্টিমেটেড) মৎস উৎপাদন

জলাশয়ের প্রকার	আয়তন (০০০ হেকটর)	নিরুপিত উৎপাদন (মেট্রিক টন)	শতকরা হার	নিরুপিত উৎপাদন কেজি/ হেক্টর/ বৎসর
উন্মুক্ত জলাশয়				
নদী	৮৩০	১৯৯,০০০	৩৮	২৪০
বিলও হাওর	২৭২	৬২,৫০০	১২	২৩০
প্লাবন ভূমি	২,৮০০	২৩৫,৬০০	৪৫	৮৪
	৩,৯০২	৪৯৭,১০০		

উৎস মৎস বিভাগঃ ১৯৮৭

সারণী–৫ থেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশের নদী ও প্লাবনভূমি প্রতি হেক্টর আয়তন এলাকা প্রায় ১০০ থেকে ২০০ কিলোগ্রাম মৎস্য উৎপাদন করে। উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় হচ্ছে কৃষি উন্নয়নের জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ পানি নিষ্কাশন ও পানি সেচ প্রকল্পের সম্প্রসারণ কর্মসূচী। এ সকল কর্মসূচী যেহেতু দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের জীবন ধারণের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কৃষি উন্নয়নের জন্য নিবেদিত, তাই মৎস্য উন্নয়নের জন্য এগুলিকে উপেক্ষা করাও অসম্ভব। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের মৎস্যের প্রধান উৎস যেখান থেকে ৯৫ শতাংশ মৎস্য উৎপন্ন হয় তার উৎপাদনের পরিমান অবশ্যই হ্রাস পাবে।

উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যের গুণগত ও সংখ্যাগত মান বিভিন্ন মৎস্যের সংমিশ্রণ, বিভিন্নপ্রজাতির মৎসের প্রজননের জন্য ও অন্যান্য উপাত্তের অভাবে এই অঞ্চলের মৎস্যের ভবিষ্যত সম্বন্ধে মূল্যায়ন করা অত্যন্ত দূরূহ ব্যাপার। তাই ভবিষ্যতে যে কোন প্রকারের আঞ্চলিক বা জাতীয় পানি উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি মৎস্য উন্নয়নের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান অবশ্য করণীয়।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস্য শিল্পের অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় গুলি নিম্নরূপ ঃ-

১। প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, বাওর প্রভৃতিতে প্রতি বৎসর পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে জলাশয়ের আয়তন ক্রমান্বয়ে কমে মৎস্য উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। তাছাড়া, নদীর গতি পথ পরিবর্তন, বন্যা, খরা প্রভৃতি মৎস্যের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২। দেশের মুক্ত জলাশযেগুলিতে প্রাকৃতিক নিয়মে যে সব পোনা তৈরী হয় সেগুলি বড় হতে না হতেই ধরে ফেলার ফলে মাছের বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় মাছ প্রায় থাকেই না।

৩। অনেক প্রাকৃতিক জলাশয় যেমন বিল হাওর ইত্যাদি শুকিয়ে যাওয়ায় সেগুলিকে ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করার ফলে মাছের বাসস্থানের পরিধি অনেক কমে গিয়েছে।

৪। বন্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে প্লাবন ভূমিতে পানির স্থায়িত্ব কমে যাওয়ার ফলে মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।

৫। বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়েছে। এই চাষের জন্য প্রচুর পানি সেচের জন্য ব্যায়িত হওয়ায় বহু জলাশয় শুকিয়ে গেছে।

৬। সমন্বিত পানি ব্যবহার ও পরিকল্পনার জন্য অন্যতম আন্ত-সংস্থা ও আন্ত-মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব রয়েছে।

৭। উন্মুক্ত জলাশয়গুলিতে মৎসের অতি সীমিত ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু মৎস্য নীতির অভাব মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে অন্যতম অন্তরায়।

৮। মৎস্য শিকারে মৎস্যের নির্দিষ্ট আকার নির্ধারণ, জালের ফাক নিয়ন্ত্রণ (মেশ সাইজ) ও মাছ ধরার নিষিদ্ধ ঋতু বা সময় প্রভৃতির উপর যে সীমিত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তা মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক নয়।

৯। কৃষিতে ফলন বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে ব্যাপকহারে রাসায়নিক সার ও কীট নাশক ব্যবহার হরা হয় তাতেও বহু মাছ মারা যায়। এতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য নষ্ট হয়

এবং মাছের মড়ক ঘটায়। অনেক ক্ষেত্রে মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়।

১০। দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে বিশেষ করে খুলনা, পটুয়াখালী, বরিশাল অঞ্চলে উপকূলীয় বাঁধের মাধ্যমে লবনাক্ত পানির হাত থেকে শস্য রক্ষা করতে গিয়ে মাছের প্রজনন ও খাদ্য সরবরাহে বাঁধার সৃষ্টি হচ্ছে।

১১। কল-কারকানা ও শহরের পরিত্যক্ত নোংরা, বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি নদী বা জলাশয়ে ফেলে দেয়ার ফলে শুধু যে মাছের মড়কই ঘটাচ্ছে তা নয় মাছের খাদ্যসহ পরিবেশও ধ্বংস হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ নারায়নগঞ্জে শীতলক্ষ্যা, ঢাকার বুড়িগঙ্গা ও চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে মৎস্যের পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে।

১২। উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যের অত্যন্ত স্বল্প পরিমান তথ্য ও উপাত্তের জন্য পানির অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে উদ্ভুত সমস্যার পরিধি চিহ্নিত করা অত্যন্ত কঠিন। তাই প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের জরুরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৩। বিভিন্ন সময়ে জলাশয়ের মালিকানার সমস্যাও মৎস্য উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে। দেশে যে অসংখ্য বদ্ধ জলাশয়, মজাপুকুর, ডোবা ইত্যাদি রয়েছে সেগুলির মানোন্নয়নের জন্য এখনও সরকারী কিংবা বেসরকারী পর্যায়ে কোন নীতি নির্ধারণ করা হয় নি।

১৪। নদী খাল সংস্কার ও বাঁধ নির্মাণের ভুল সংশোধনের মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের সহায়ক হবে।

১৫। এছাড়া মজাদীঘি, পুকুর সংস্কার করে মাছের চাষের জন্য সুষ্ঠু নিয়মে ঋণ দানের বিষয় বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে হবে।

১৬। মৎস্য জলা বার্ষিক ভিত্তিতে ইজারা দেওয়ার নীতি বদল করে জলমহালগুলি স্থায়ীভাবে প্রকৃত জেলেদের হাতে দিলে অবস্থার উন্নতি আশা করা যায়।

১৭। কৃত্রিম উপায়ে মাছের পোনা তৈরী করে মাছ চাষ করলে মৎস্যের উৎপাদন বাড়বে।

১৮। বাংলাদেশের মৎস্যজীবীর অধিকাংশই অশিক্ষিত। আধুনিক মৎস্য চাষাবাদ, মৎস্য ধরার উন্নত পদ্ধতি ও কলাকৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয় বলে এদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯। মাছ অত্যন্ত পচনশীল পণ্য। অথচ আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। ফলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছের চাষ এবং মাছ ধরা ব্যহত হয়।

২০। মৎস্য বাজারজাত করনের নানা অসুবিধা রয়েছে। পরিবহনের অব্যবস্থা, মৎস্য ব্যবসায়ের বিভিন্ন পর্যায়ে দালালদের উপস্থিতি, সংরক্ষণ, বন্টন প্রভৃতির অপর্যাপ্ত সুবিধার দরুণ আমাদের গরীব ও সরল মৎস্যজীবীরা মাছের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হয়।

২১। আমাদের দেশে এখনও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রণোদিত লোকে সমন্বয় গঠিত উপযুক্ত সংগঠনের অভাব রয়েছে। তাছাড়া , মাছ ও পোনামাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ ও অনুকরনীয় মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রতিবন্ধক স্বরূপ।

২২। আমাদের দেশের অধিকাংশ পুকুরের আকার আয়তন ও গভীরতা বিজ্ঞান সম্মত নয় এবং সেগুলিতে পানি নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই। অধিকন্ত পুকুরগুলি প্রায়ই বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত বলে সেখানে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ এবং আহরিত মাছ ঠিকমত বিক্রয় করা সম্ভব হয় না।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের উপায় সমূহঃ–

অতীতে অবহেলিত এবং বর্তমানে নানা সমস্যা জর্জরিত এ খাতকে একটি শক্তিশালী খাতে পরিণত করতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা একান্ত দরকারঃ–

১। উপরে উল্লিখিত মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার সামাধানই মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে প্রধান উপায়।

২। মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের জন্য মৎস্য উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত মৎস্য চাষ পদ্ধতি, মৎস্য আহরণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

৩। ডিমওয়ালা মাছ ও পোনা এবং এদের প্রাকৃতিক আশ্রয়স্থল সম্পর্কিত মৎস্য সংরক্ষণ বিধি সমূহ পালনে জনসাধারণকে বাধ্য ও অনুপ্রাণিত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে

বর্তমান মৎস্য সংরক্ষণ আইনের সংস্কার, প্রচার ও প্রয়োগ অভিযান পরিচালনা করা দরকার।

৪। প্রজননের জন্যে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান মাছের প্রজনন কেন্দ্রগুলিতে রক্ষাস্থান ঘোষণা করে ঐগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। দেশের অসংখ্য পুকুর-পুষ্করিণীতে মাছের চাষ করতে হবে। পল্লীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক, নারী, ভূমিহীন কৃষক প্রভৃতিকে নিয়ে গঠিত সমবায়ের মাধ্যমে খাস পুকুরগুলির সুষ্ঠুতম ব্যবহার করে সেখানে মৎস্য জীবীদেরকে মৎস্য চাষের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। মৎস্যের বংশ বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে সরকারী খামারগুলির উন্নয়ন সাধন এবং এখানে বেসরকারী উদ্যাগ গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।

সামুদ্রিক মৎস্য সমপদের উৎপান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজনঃ-

১। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রচালিত নৌকা, লঞ্চ ও ট্রলারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এগুলির যথার্থ ব্যবহারের প্রয়োগ বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান দিতে হবে। মৎস্যজীবীদেরকে মৎস্য সম্পদ আহরণের জন্য আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি, উন্নতমানের জাল ইত্যাদি স্বল্প দামে বা কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য সুবিধায় সরবরাহ করতে হবে।

২। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী সহীসোপানস্থ মৎস্য ও চিংড়ির সুপরিচিত অবস্থানগুলি ব্যহারের জন্য সকল আবহাওয়া উপযোগী ট্রলার, বিশেষতঃ মৎস্য সংরক্ষণের জন্য হিমাগার সম্বলিত ট্রলার চালু করতে হবে। একই সাথে সমুদ্র উপকূল ব্যাপী মাছের বাজার, হিমাগার, বরফকল, মেরামত সুবিধা, তেল সরবরাহ, নৈশ নৌ চলাচলের নিরাপত্তাসহ আনুসঙ্গিক সাজ সরঞ্জাম সমৃদ্ধ মৎস্য বন্দর জেটির ব্যবস্থা করা অতি প্রয়োজন।

৩। ধৃত মৎস্য দ্রুত বাজারজাত করনের জন্য মৎস্য বন্দরের সংগে বিভিন্ন প্রকারে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা দরকার।

মৎস্য বিষয়ক পরিকল্পনা ও লক্ষ্য

গত তিনটি পরিকল্পনার অধীনে মৎস্য সম্পদের উৎপাদনের হার শতকরা ২ ভাগের কম ছিল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে ১৯৮৯–৯০ সনে ১০ লক্ষ টন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রত্যাশিত অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮৪৭ লক্ষ মেঃ টন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত লক্ষ্য এবং কৌশল সংক্ষেপে আলোচিত হোল।

দ্বিতীয় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রকৃত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ব্যবধান ছিল।

সারণীঃ ৬

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদন

	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮৪–৮৫)	প্রকৃত উৎপাদন (১৯৮৪–৮৫)
মৎস উৎপাদন (লক্ষ টন)	১০.০০	৭.৭৪
আভ্যন্তরীণ (লক্ষ টন)	৮.২০	৫.৮৮
সামুদ্রিক (লক্ষ টন)	১.৮০	১.৮৬
মৎস্য চাষ (লক্ষ একর)	৬.৪৪	২.২১
মৎস্য রপ্তানী (টন)	২০,১০০	২৩,৩৮২
চিংড়ি	১৭,০০০	১২,৬৮০
ব্যাংগের পা	১,৬০০	১,৩৬৫
মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য	১,৫০০	৬,৩৩৭

উৎসঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বাংলাদেশ সরকার।

যদিও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভন হয়নি কিন্তু উৎপাদনের ধারা ছিল উর্ধমুখী। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে (১৯৮৯–৮০) লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ ঃ

১। ১৯৮৪–৮৫ সালের উৎপাদনের পরিমন ৭.৭৪ লক্ষ টন থেকে ১০.০ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করা (৭.৭২লক্ষ টন অভ্যন্তরীণ এবং ২.২৮ লক্ষ টন সামুদ্রিক)।

২। চিংড়ি রফতানির পরিমান ৩০,০০০ টন, ব্যাংগের পা ২,০০০ টন এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যের পরিমান ৬,০০০ টনে উন্নীত করা।

৩। ১৯৯০ সাল নাগাদ অতিরিক্ত ১০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করা।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৯০–৯৫

সারণী –৭

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যয় বরাদ্দের বিভিন্ন খাতের মধ্যে বন্টন ঃ–

কর্মসূচীর নাম	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১। জরিপ অনুসন্ধান, সম্ভাব্যতা যাচাই ও গবেষণা	৫৬.০০
২। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কমুনিটি ডেভলপমেন্ট	১২৫.০০
৩। মৎস্য চাষ ও উন্নয়ন	৫১২.০০
৪। মৎস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত করণ ও বন্টন সুবিধা	৪২.০০
৫। নুতন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ	১৪.০০
সর্ব মোট	৭৪৯.০০

সারণী-৮

ওপরোক্ত বরাদ্দের আলোকে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ধার্য্যকৃতঃ-

উৎপাদনের উৎস	১৯৮৯–৯০	১৯৯৪–৯৫
(ক) অভ্যন্তরীণ মৎস	৬১২.৫০	৯৩৮.০০
(১) পুকুর	১৬১.০০	৩০৮.৯০
(২) বাওড়	১.৫০	৫.৫০
(৩) উপকূলীয় এলাকা	২৭.০০	৮১.০০
(৪) নদী ও মোহনা	১৯০.০০	২১০.০০
(৫) বিল ও হাওড়	৫০.০০	৬৭.০০
(৬) কাপ্তাই লেক	৫.০০	৭.৫০
(৭) প্লাবন ভূমি	১৭৮.০০	২৩৭.৫০
(৮) চাষাধীন এলাকা	—	২০.০০
(খ) সামুদ্রিক মৎস	২৩৪.৫০	২৬২.০০
(ক+খ) সর্বমোট	৮৪৭.০০	১২০০.০০

উৎসঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ঃ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (খসড়া)।

সারণী-৯

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে প্রকৃত উৎপাদন এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

উৎপাদনের উৎস	প্রকৃত উৎপাদন ১৯৮৪–৮৫ (হাজার টনে)	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১৯৮৯–৯০ (হাজার টনে)
অভ্যন্তরীণ মৎস্য	৫৮৮.৪	৭৭২.৪
পুকুর	১২৫.৫	১৯২.০
হাওর	১.১	২৮
উপকূলীয় মৎস্যচাষ	৯.০	৩৪.২
নদী ও খাড়ি	২০৭.১	২০৫.৪
বিল ও হাওর	৫১.৭	৭৫.০
কাপ্তাই হ্রদ	৫.০	৮.০
প্লাবন ভূমি	২০২.০	২১০.০
সামুদ্রিক	১৮৫.৬	২২৮.০
মোট	৭৭৪.০	১০০০.৪

উৎসঃ পূর্বোক্ত

সারণী-১০

মৎসজাত দ্রব্যাদি থেকে রপ্তানি আয়

রপ্তানিকৃত দ্রব্য	১৯৮৪–৮৫ পরিমাণ মেট্রিক টন/মূল্য		১৯৮৯–৯০ পরিমাণমেট্রিক টন/মূল্য	
	মেট্রিক টন	কোটি টাকা	মেট্রিক টন	কোটি টাকা
চিংড়ি	১২,৬৮০	১৯৯.৪৫	৩০,০০০	৫০০.০
মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য	৬,৩৩৭	২১.০৯	৬,০০০	৩০,০
ব্যাংগের পা	১,৩৬৫	১০.২৭	২,০০০	২.৪০
মোট	২০,৩৮২	২৩০,৮৯	৩৮,০০০	৫৩২,৪০

সারণী–১০ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৮৪–৮৫ সালে প্রকৃত মৎস্য রফতানির পরিমান এবং তা থেকে আয় পরবর্তী ৫ বছরে অর্থ্যৎ ১৯৮৯–৯০ সালের লক্ষ্যমাত্রার প্রায় অর্ধেক ছিল। দেশের বর্তমান আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন খুবই কষ্টসাধ্য হবে।

মৎস্য রোগের কারণ ও প্রতিকার

বাংলাদেশে মৎস্য রোগের কারণ প্রধানতঃ (ক) পরিবেশগত এবং (খ) জীবানু গঠিত এই দুই প্রকার।

ক) পরিবেশগত কারণ সমূহ

পরিবেশগত অসুবিধায় মাছের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, মাছ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে রোগাক্রান্ত হয় এমনকি মৃত্যুবরণ করে থাকে কোন কোন সময়। আমাদের দেশে সচরাচর দেখা যায় এমন অসুবিধার মধ্যে ঃ

(১) **অক্সিজেন জনিত ঃ**– উৎপাদনশীল স্বাভাবিক পানিতে দ্রবভূত অক্সিজেন এর পরিমনি ৮.৬–১১.৫ মিঃগ্রামঃ/লিটার থাকার কথা[১]। কোন কারণে এই মাত্রা যদি খুব কমে যায় তবে মাছের অসুবিধা সৃষ্টি হয়। মাছ এই দ্রবভূত অক্সিজেন শ্বাসপ্রশ্বাসে ব্যবহার করে বেঁচে থাকে। আবার মাছের অক্সিজেন গ্রহণের মাত্রাও পানির তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে কমবেশী হতে পারে। যে মাছ ১৫ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রায় ৪৩.৫ মিঃ গ্রামঃ অক্সিজেন গ্রহণ করে, আবার সেই মাছই ৩০ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রায় ২১৬ মিঃ গ্রাম গ্রহণ করে[২]।

আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই পুকুরে অক্সিজেন য়এর ঘাটতি দেখা দিলে মাছের অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় মাছ উলট পালট করে চলে এবং পানির উপর ভেসে খাবি খায় এমনকি মারা যেতে পারে। এই অবস্থা হলে পানিতে অক্সিজেনের পরিমান বাড়াতে হবে। পানিতে বাঁশ পিটিয়ে বা ছেলে মেয়েদের সাঁতার কাটিয়ে অথবা আধুনিক এয়ারেটার ব্যবহার করে অক্সিজেনের বৃদ্ধি ঘটানো যেতে পারে।

(২) **কার্বন-ডাই-অক্সাইড জনিতঃ** যে সব জলাশয়ে দিনের বেলায় ফটোসিনথেসিসের ফলে কার্বন–ডাই–অক্সাইড এবং কার্বনিক এসিড দূর না হয়, সে সকল জলাশয়ে কাবর্ন–ডাই–অক্সাইড জনিত বিষক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। এ অবস্থার সৃষ্টি হয়

১ ও ২. ডঃ ইসলাম, মাছের রোগ, ৪৮ পৃষ্ঠা।

সাধারণতঃ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে এবং জলাশয়ে পঁচা কিংবা পঁচনশীল জলজ উদ্ভিদের আধিক্য থাকলে। ফটোসিনথেসিস বাধাগ্রস্থ হওয়ায় অক্সিজেনরও ঘাটতি দেখা যায়। অক্সিজেনের ঘাটতি জনিত কারণে মাছ ভেসে উঠে শ্বাস প্রস্বাস ঘন ঘন নিয়ে থাকে এবং ভারসাম্য হারিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পানির উপরে উঠে আসে। যেহেতু পি, এইচ, বাড়ালে কার্বন–ডাই–অক্সাইড কমে সেহেতু চুন প্রয়োগে পি, এইচ, মান বাড়াতে পারলে সমস্যা দূর হতে পারে।

(৩) **লৌহ জনিতঃ** পানিতে যদি লৌহের পরিমান বেড়ে যায় তবে জমাট হাইড্রক্সাইড অবস্থায় তা মাছের ফুলকায় বসে যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটায়। যখন পানির পি, এইচ, ৬.৫–৭.৫ এর মধ্যে থাকে তখন যদি প্রতি লিটার পানিতে ০.৯ মিঃ গ্রাঃ লৌহ থাকে তবে মাছ মারা যেতে পারে। এই সমস্যার সমাধানের সহজ এবং নির্ভরযোগ্য পন্থা তেমন একটা নেই তবে চুন প্রয়োগে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

(৪) **অত্যধিক উদ্ভিদ জনিতঃ** পানিতে অতি মাত্রায় উদ্ভিদ থাকলে সেখানে রাত্রে এত কার্বন–ডাই অক্সাইড তৈরী হয় যে, পানির পি, এইচ, মান ৫.০ এর নীচে নেমে যেতে পারে। আবার পরিষ্কার দিনে এতই অক্সিজেন তৈরী হয় যে পানির পি, এইচ মান ৮.৫ বা তার অনেক উপরে উঠে। এই উভয় অবস্থা মাছের জন্য ক্ষতিকর, এবং মাছের মৃত্যুর কারণ। আগাছা দমনকারী ঔষধ প্রয়োগ অথবা যে কোন উপায়ে এই উদ্ভিদকে বাঞ্ছিত নিয়ন্ত্রণে রাখাই এর সমাধান[৩]।

(৫) **পুকুরের তলদেশে সৃষ্ট বিষাক্ত গ্যাস ঃ–** এই ক্ষেত্রে এক নম্বর অসুবিধার মতই লক্ষণ দেখা যাবে। তবে এই গ্যাস সৃষ্টি হলে ইট বা শক্ত কোন কিছু পুকুরের তলায় ছুড়ে ফেললে বুদ বুদ উঠবে এবং মাটি দুর্গন্দময় হবে। এই অবস্থায় কোন কোন সময় মাছ মারা যেতে পারে। প্রতিকার হিসাবে রৌদ্রের সময় পুকুরে হররা টেনে অথবা বিঘাপ্রতি ১/২ মন চুন প্রয়োগ করতে হবে।

(খ) জীবানু ঘটিত কারণ সমূহ

পানিতে মাছ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পরজীবি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রজাতির কীট ও জীবানুর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত মাছে যে সব লক্ষণ দেখা যায় তার প্রতিকার সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হোলঃ–

---

৩. মৎস্য খামার স্থাপন ও ব্যাস্থাপনা–৬১ পৃষ্ঠা।

(১) **ড্রপসিঃ**- মানুষের ডাইরিয়া সদৃশ এই রোগ, মাছের পুকুরে পরিবেশ অপরিস্কার থাকা, অনুপযোগী খাবার প্রদান ইত্যাদি কারণে দেখা দিতে পারে এবং ইহা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মহামারী আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় আক্রান্ত মাছ অনবরত পায়খানা ও বমি করতে থাকে। রং ফেকাশে দেখায় , একা একা উলটে পালটে চলা, চোখ বসে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। প্রতিকার হিসাবে আক্রান্ত মাছকে অন্যত্র সরিয়ে পুকুর থেকে পানি সেচে নতুন পানি ঢুকাতে হবে অথবা ০.৫ নিযুতাংশ ডিপটারেক্স প্রয়োগ করে পুকুরটি রোগ মুক্ত করে পুনরায় মাছকে ঐ পুকুরে ছেড়ে যত্ন নিলে সুস্থ্য হয়ে উঠবে। আক্রান্ত মাছকে ষ্ট্রেপটোমাইসিন ইনজেকসন দিয়ে (মাংসে) সুফল পাওয়া যায় [৪]।

(২) **বসন্ত ঃ**- মানুষের মত মাছেরও বসন্ত হয় এবং তা হলে মাছকে দুর্বল দেখায়, সাদা গোলাকার ঘা সৃষ্টি হয়, গতি কমে আসে এবং একা একা উলটে পালটে চলে। তাছাড়া স্বাভাবিক রং বদলে যায়। প্রতিকার হিসাবে আক্রান্ত মাছকে ৩% লবন জলে ৪/৫ মিনিট গোসল করিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে অথবা পুকুরটি ০.৫ নিযুতাংশ ডিপটারেক্স প্রয়োগে রোগ জীবানু মুক্ত করে আক্রান্ত মাছকে পুনরায় ঐ পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে।

(৩) **মাছের উকুন ঃ**- পরিবেশ অপরিস্কার কিংবা বাইরের রোগের জীবানু পুকুরে ঢুকলে মাছ উকুনে আক্রান্ত হয়। আরগুলাস নামক এই উকুন আক্রান্ত মাছের গা থেকে রক্ত শোষণ করে মাছকে ক্রমশ দুর্বল করে ফেলে। আক্রান্ত মাছ মন্থর গতিতে পুকুরের উপরিভাগে বিচরণ করে থাকে। শুষ্ক মৌসুমে যখন পুকুরের পানির স্তর নেমে আসে তখনই উকুনের আক্রমণ ব্যাপক হলে তা মহামারী আকারে দেখা দেয়। বাংলাদেশে চাষ করা মাছে উকুনই সব চাইতে ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। আক্রান্ত পুকুরে ৫ নিযুতাংশ হারে ডিপটারেক্স ব্যবহার করে মহামারী রোধ করা সম্ভব।

(৪) **পাখনা পঁচা রোগ ঃ**- এই রোগে মাছের পাখনা পঁচে যায় এবং অন্যান্য লক্ষণ বসন্তের মতই। প্রতিকার হিসাবে বসন্তের ব্যবস্থাই এখানে সুফল দেবে।

(৫) **আইস উঠা রোগ ঃ**- এই রোগে মাছের আইস উঠে যায় এবং অন্যান্য লক্ষণ বসন্তের মতই। প্রতিকার হিসাবে বসন্তের ব্যবস্থাই এখানেও সুফল দেবে।

---

৪. পি, তেন, ডুইজন এর (১৯৭৩) ডিজিজেজ অব ফিসেস- পৃষ্ঠা-১৭০

(৬) **ফুলকা পঁচা রোগঃ**– মারাত্মক রোগ। সাইকোমাইসেটিস জাতীয় ছত্রাক দ্বারা এই রোগের সৃষ্টি। এই রোগে ফুলকার অংশ রক্তনালী থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং পঁচে খসে পড়ে। অক্সিজেন নিতে না পেরে মাছ মারা যায়। এই অবস্থায় পুকুরে ০.৫ নিযুতাংশ ডিপটারকৃস অথবা মেলাকাইটগ্রীণ ব্যবহার করতে হবে। আক্রান্ত মাছকে ২.৫% লবন জলে গোসল করাতে হবে[৫]।

(৭) **জোক ঃ**– মাছের গায়ে লেগে থেকে রক্ত খেয়ে মাছকে দুর্বল করে ফেলে এবং আহত জায়গায় ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে নতুন রোগ সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় আক্রান্ত মাছকে পুকুরের বাইরে এনে ২.৫% লবন জলে গোসল দিতে হবে।

(৮) **এ্যানেমিয়াঃ**– খাবারে ভিটামিন যেমন বইয়োপ্লোরিন, পেন্টাথেনিক এসিড, পাইরিডোক্রিম ইত্যাদির অভাবে এই রোগ হয়। এই রোগে আক্রান্ত মাছের ফুলকা ফেঁকাশে বা বাদামী হয়ে যায় এবং মাছের মৃত্যু ঘটে। আক্রান্ত মাছের চিকিৎসা হিসাবে মাছের খাবারের সাথে ভিটামিন সমূহ খাইয়ে দিলে কিছুটা সুফল পাওয়া যায়।

(৯) **সেপ্রলেগনিয়া ঃ**– প্রজননের পর মাছের ডিম ফোটাবার সময় এই রোগ দেখা দেয়। যে সব ডিম মরে যায় এই রোগ ঐ ডিমেই বেশী সৃষ্টি হয় যা পরক্ষণেই ভাল ডিমকে আক্রমণ করে। ডিম ফোটানোর সময় মরা ডিম ও ডিমের খোলস ঘন ঘন সরিয়ে ফেললে সুফল পাওয়া যায়।

(১০) **ইপিজুটিক আলসারেটিভ সিনড্রোম বা ক্ষত রোগঃ**– ক্ষত রোগ বর্তমানে বাংলাদেসে মৎস্য সম্পদের নিকট হুমকি স্বরূপ। তাই এর ইতিহাস, সম্ভাব্য কারণ, লক্ষণ আর প্রতিকার কিম্বা বিস্তার সম্ভাব্যতা নিয়ে বহু আলোচনা হচ্ছে। সংক্ষিপ্তভাবে নিচে এই রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হোল ঃ–

রোগ বিস্তারের ইতিহাস

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাছের এই কঠিন সংক্রামক ক্ষতরোগ বিস্তারের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ইহা প্রথম ১৯৭২ সনে অষ্ট্রেলিয়ায়, ১৯৭৫–৭৬ সনে পাপুয়া নিউ গিনি, ১৯৮০ সালে ইন্দোনেশিয়া, ১৯৮০–৮৫ সালে থাইল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশে এবং ১৯৮৪ সনে বার্মায় বিস্তার লাভ করে। ১৯৮৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি নদ–নদী এমনকি খান বিলেও মহামারী রূপে দেখা দেয়।

---

৫. মৎস্য খামার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা (১৯৮৭)–৬৩ পৃষ্ঠা

এই আলসারেটিভ রোগটির সঠিক কারণ এখনো নির্ণীত হয় নাই। ১৯৮৬ সনে ক্ষতিগ্রস্ত ক'টি দেশের বিশেষজ্ঞদের এক সেমিনারে সিদ্ধান্ত হয় যে আধা লোনা হ'তে মিঠা মাছ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মিঃ রাজ এটাকে রেবডোভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট রোগ বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ময়মনসিংহ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাগার পরীক্ষায় কৃষি জমিতে অতি মাত্রায় সার ও কীট নাশক দ্রব্যের ব্যবহারে সৃষ্ট পরিবেশ ও ভারসাম্যহীনতাকে এই রোগের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়। যে সকল কীট নাশক পানিতে অদ্রবনীয় বিষাক্ত অনু থাকে সে সকল কীট নাশক ব্যবহারে ঐ বিষাক্ত অনুগুলি দিনের পর দিন পানিতে জমতেই থাকে এবং মাছের বাসযোগ্য পরিবেশ বিনষ্ট করে থাকে। সার ও কীট নাশকেই হোক বা অন্য ভাবেই হোক এটা যে পানিতে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা থেকে সৃষ্ট তা সবাই স্বীকার করেন।[৬]

রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষণঃ এই আলসারেটিভ বা ক্ষত পচারোগে আক্রান্ত মাছে প্রথমে ঘাড়ের নিকটে ও পরে সারা দেহে ফোলা লালচে গুটি দেখা যায় এবং ক্রমান্বয়ে তা হলদে হয়ে ভাসা থেকে গভীরতর ঘা এর সৃষ্টি করে থাকে। আর এই ঘা আবার হাড়ে ও দেখা দিতে পারে।আক্রান্ত মাছ শ্বাস কষ্টে ভোগে এবং ভাসতে ভাসতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একক থেকে মহামারী আকারে মারা যায়।[৭]

প্রতিকার ও প্রতিরোধঃ-

সংক্রামক ও দুরারোগ্য এই আলসারেটিভ বা ক্ষত রোগের সফল চিকিৎসা এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে পরিবেশ ও মাছের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় পানির পি, এইচ, মান অনুযায়ী প্রতি ডেসিমেলে কম/বেশী ১ কেজি চুন ব্যবহার ও পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এই রোগের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে।

---

৬. **মৎস্য খামার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা** (১৯৮৭-৬৩) পৃষ্ঠা।

৭. মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত— **বাংলাদেশে মাছের ক্ষতরোগঃ** ডঃ নুরুজ্জামান এর ২রা জুন ১৯৮৮ এর বাংলাদেশ অবজার্ভার এ প্রকাশিত নিবন্ধ; ডঃ এম, এ, ওহাব এর ৯ই আগষ্ট, ১৯৮৮ তারিখে 'নিউ নেশান' পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ; ৬ ই এপ্রিল, ১৯৮৮ জেলা মৎস্য দপ্তর মৌলভীবাজার থেকে প্রকাশিত—**আলচারেটিভ বা পঁচা রোগ পুস্তিকা।**

রোগের বিস্তার সম্ভাব্যতাঃ

বাংলাদেশে সাগর মোহনা অঞ্চল থেকে শুরু করে সারাদেশে এর বিস্তার সম্ভাব্যতা আছে। আর ছোট বড় সকল ধরনের মাছই অল্প বিস্তর এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

(৬) বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও প্রজাতি ঃ-

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলে কয়েকটি জেলায় যেমন চাঁদপুর, ভোলা, কুমিল্লা, কক্সবাজার ও ব্রাক্ষ্মণবাড়ীয়া জেলার বিভিন্ন জলাশয়ে ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে এবং পরবর্তীতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি জেলা যেমন সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা জেলায় একই বছর জুন মাসে দেখা দেয় বলে মৎস্য বিভাগীয় পরিচালক তার এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে এ পর্যন্ত শোল, গজার, টাকি, মাগুর, শিং, বাইন, টেংরা মারাত্মকভাবে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। রুই–কাতলাও আক্রান্ত হবার খবর পাওয়া গেছে বিভিন্ন এলাকা থেকে।

মৎস্য রোগ প্রতিরোধ কল্পে জলাশয়ের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যাতে জীবানুর বংশ বিস্তারের মাধ্যমে রোগ সৃষ্টির সুযোগ না থাকে। বাইরে থেকে পানি প্রবেশ করতে না দিয়ে বাইরের রোগ জীবানুর অনুপ্রবেশ রোধ করতে হবে; বিষাক্ত দ্রব্যাদি যাতে পুকুরে না পড়ে তারও ব্যবস্থা নিতে হবে; কৃষি জমিতে নির্বাচিত কীট নাশকের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং সর্বোপরি রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে তার প্রতিকারের মাধ্যমে পরবর্তী বিস্তার রোধ করতে হবে[৮]।

জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমঃ-

মৎস্য রোগ সংক্রান্ত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা– নিরীক্ষা, সুপারিশ ও নীতি মালা প্রণয়ন এবং মাঠ পর্যায়ে এগুলোর বাস্তবায়ন কাজ সফল করার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় পর্যায়ে ট্রাস্কফোর্স গঠন করেছেন। এতত্তিন্ন উম্মুক্ত জলাশয় অর্থাৎ নদীতে পোনামাছ ছাড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

---

৮ মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ আমসান উল্লাহ এবং উক্ত অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক ও ৮-ম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী জনাব শামসুদ্দিন এর সহিত ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে।

সুপারিশ মালাঃ-

মৎস্য রোগ প্রতিকার শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত বিষয়াদির প্রেক্ষিতে নিম্নের সুপারিশ সমূহ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ—

(১) পুকুরে পানির পি, এইচ, মাছ আশানুরূপ পর্যায়ে রাখার নিমিত্তে পুকুরে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ ;

(২) বাইরে থেকে যাতে রোগ জীবানু পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া ;

(৩) পুকুরে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ;

(৪) পুকুরের পানি যাতে দুষিত না হয় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা ;

(৫) উপযুক্ত পরিবেশে উপযুক্ত সংখ্যক মাছ ছাড়ার ব্যবস্থা নেওয়া ;

(৬) আক্রান্ত মাছকে শতকরা ২.৫ ভাগ লবন জলে ৪/৫ মিনিট গোছল দেওয়া ;

(৭) মুক্ত জলা সহ সকল জলাশয় থেকে রোগাক্রান্ত মরা মাছ তাৎক্ষণিক তুলে মাটিতে পুতে ফেলা।

উপসংহারঃ-

জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণে মৎস্য সম্পদ খুবই সহায়ক এবং এই দেশ নদী মাতৃক বিধায় মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রচুর। জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ৫ভাগ ও রপ্তানি আয়ের ১১ ভাগ এই উপখাত থেকে আসে। এই দেশের জনগণের অতি প্রয়োজনীয় প্রাণীজ আমিষ খাদ্যে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী আসে মাছ থেকে। এখানকার খাল, বিল, পুকুর, দীর্ঘ হাওর, নদী, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও খাড়ি অঞ্চলে মোট জলাশয়ের পরিমাণ ১,০৮,০২,২০০ একর। ওপরোক্ত জলাশয় সমূহে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ করলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে মৎস্যজাত পণ্য সামগ্রী রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সহ দেশের বেকার সমস্যা সমাধান, খাদ্য ঘাটতি পূরণ এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মুক্তির বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। মৎস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্রে উৎপাদন ৭২০ হাজার মেট্রিক

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

টন খেকে ৫৯৭ হাজার মেট্রিক টনে এসেছে অর্থাৎ গত ২০ (বিশ) বৎসরে মৎস্য ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রযুক্তি প্রয়োগের পরও ১৯৬৫-৬৬ সালের তুলনায় ১৯৮৬-৮৭ সালে ১২৩ হাজার মেট্রিক টন অভ্যন্তরীণ মৎস কম উৎপাদিত হয়েছে। তবে অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র একত্রে এই উৎপাদন গত ২০ বৎসরে ৮০১ হাজার মেট্রিক টন থেকে ৮১৪ হাজার মেট্রিক টনে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ সামুদ্রিক মৎস ক্ষেত্রের উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দাবী করা হলেও গত ২০ বৎসরে মাত্র ১৩ মেঃ টন বেড়েছে।

অপরদিকে জনপ্রতি মৎস্য খাবারের পরিমাণ ১০৬৫-৬৬ সালে ছিল ৩৩ গ্রাম, ১৯৭৯-৮০ সালে তা কমে আসে ২০ গ্রামে এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে সামান্য বেড়ে প্রায় ২২ গ্রামে এসে দাঁড়ায়। মৎস্যের উৎপাদন এবং মাথাপিছু মৎস্য ব্যবহারের পরিমাণের প্রবণতা যদি ক্রমান্বয়ে এইভাবে কমতে থাকে তাহলে বাংলাদেশের মৎস্য এবং মৎস্য জাত সামগ্রী আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আদৌ পাবে কিনা সন্দেহ।

প্রকৃতির এমন উদার অবদান সত্বেও মৎস্য উৎপাদনে আমরা আমাদের দেশের চাহিদা মেটাতে পারছিনা। সরকারী সুষ্ঠু মৎস্য নীতি প্রণয়ন এবং অনুসৃত নীতিমালার আলোকে প্রয়োজনীয় এবং লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের মৎস্য উৎপাদন বাড়িয়ে শুধু দেশের চাহিদা মেটানো নয়- চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন বিদেশে বপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে হবে। তাহলেই দেশে বিদ্যমান সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। মাহবুব হাসন, **প্রকৃতি ও সম্পদ,** বাংলা একাডেমীঃ ঢাকা (১৯৮৫)১৮৪-২০২।

২। পরিকল্পনা মন্ত্রাণালয়, **তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা,** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা (১৯৮৬), পৃঃ ২০৮-২১৫।

৩। প্লানিং কমিশন, **ইকোনিমিক রিভিউ ১৯৮৬-৮৭,** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,ঢাকা (১৯৮৮), পৃঃ ৫১-৫৩।

৪। অর্থ মন্ত্রণালয়, **বাংলাদেশ অর্থনেতিক জরীপ ১৯৮৭-৮৮,** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা (১৯৮৯), পৃঃ ২৯-৪০।

৫। বাংলাদেশ ব্যুরো ষ্ট্যাটিসটিকস, **বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী ১৯৮৭-৮৮,** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা (১৯৮৮)।

৬। বাংলাদেশ ব্যুরো অব ষ্টাটিসটিকস, **বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই**, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৯।

৭। মৎস অধিদপ্তর, **মৎস খামার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা**, ঢাকা (১৯৮৭), পৃঃ ৬৯।

৮। ডঃ ইসলাম, **মাছের রোগ**, ঢাকা,পৃঃ ৪৮।

৯। ডঃ সুভাষ চন্দ্র দাস, "ম্যস সম্পদ" **ভুলোগ পত্রিকা**, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা (১৯৮৬–৮৭), পৃঃ ১৬–৩২।

১০। পি, ভেন, ডুইজন, **ডিজিজেস অব ফিসেস**।

১১। সিরাজুল ইসলাম, চৌধুরী, **অর্থনৈতিক ভূগোল ঃ বিশ্ব ও বাংলাদেশ**, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৮)।

১২। প্লানিং কমিশন, **মাষ্টার প্লান অর্গানাইজেশন** (এমপিও) ১৯৮৪, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১৩। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, **চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯০–৯৫**।

ক্রমবর্ধমান প্রশিক্ষণ চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমিকা

— মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

পৃথিবীর যে কোন দেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন এবং সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ঐ দেশের সরকারের জন্য প্রাথমিক এবং সর্বাধিক প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে উন্নয়নমূখী মানসিকতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী বাহিনী। নিয়ম-তান্ত্রিক কর্মী বাহিনীর সমন্বয়ে আধুনিক রাষ্ট্রের প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে ওঠে। যে দেশ যত বেশী দক্ষ প্রশাসনিক কর্মী ও উন্নত ব্যবস্থাপনার অধিকারী সে দেশ ততটা অগ্রসর দেশ হিসেবে বর্তমান বিশ্বে বিবেচিত। উন্নয়ন অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীবাহিনী পৃথিবীর সব দেশের জন্যই দূর্লভ। যে কারণে রাষ্ট্রনায়কদেরকে বলতে শোনা যায়- আমাকে সোনার মানুষ দাও-আমি সোনার দেশ গড়ে দেবো। প্রকৃতপক্ষে দক্ষ প্রশাসনিক কর্মী ছাড়া কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা অসম্ভব।

কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা। নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা সদ্য লেখাপড়া শিখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে চাকুরীতে আসেন। চাকুরীতে প্রবেশের আগে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভিন্ন পরিমণ্ডলে কাজ করতে অভ্যস্ত থাকেন। জ্ঞানের বিস্তৃতি এ পরিমণ্ডলে থাকলেও শৃংখলাবোধ থাকে শিথিল। তাছাড়া প্রজাতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে এই নতুন নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের ধারণার অভাব থাকা স্বাভাবিক। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন শেষে কর্মকর্তারা চাকুরী করতে আসেন। তাই নতুন নিয়োগকৃতদের জন্য এবং যারা দীর্ঘকাল ধরে চাকুরী করেছেন তাঁদের জন্যও প্রশিক্ষণ অতি জরুরী। কারণ প্রশিক্ষণ আধুনিক প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্পর্কেও কর্মকর্তাদেরকে হাল নাগাদ জ্ঞান এবং তথ্য সরবরাহ করে।

আমাদের দেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিস এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস—এর অভিজ্ঞতার উত্তরসূরী আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস। দেশে একসময় যারা এ সমস্ত সার্ভিসে নিয়োজিত হতেন তাঁদেরকে ঈর্ষা এবং শ্রদ্ধা মিশ্রিত চোখে দেখা হোত। তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা নির্বাচিত হতেন। তাঁদেরকে ব্যাপক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলা হোত এবং দেশের লোকপ্রশাসন অংগণে তাঁরা একটি স্থায়ী প্রভাব রাখতে পেরেছিলেন।

পকিস্তান এবং পরাধীন ভারতে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সৌভাগ্যের শিখরে আরোহন করলেও তাদেরকে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর আওতায় কাজ করতে হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঘটনাটি প্রথম বারের মত এদেশে স্বাধীন প্রশাসনিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার তাগিদ এবং লোক প্রশাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় নতুন ধরনের প্রশিক্ষণ চাহিদার সৃষ্টি করে। এই চাহিদা পূরণে দেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে এই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

যুদ্ধ বিধস্ত বাংলাদেশে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে 'সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী '(কোটা)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাডারে নবনিযুক্ত সদস্যদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়।

বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন (নিপা) ও বাংলাদেশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ষ্টাফ কলেজ। এ ছাড়াও ছিল এস, টি, আই,—তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে এখানে দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। ওপরোক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে একত্রিত করে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় অর্ধশত কোটি টাকা ব্যয়ে এই বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়।

শুধু লোক প্রশাসন নয় সরকারী এবং বেসরকারী মিলিয়ে দেশে অন্য কোন ক্ষেত্রেই এতবড় এবং ব্যাপক সুবিধা সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয়টি নেই। একসাথে প্রায় ৪০০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই কেন্দ্র। ছোট বড় ৩৭ ধরনের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয় এখানে। এর মধ্যে দলগঠন, ব্যবস্থাপনা, আর্থবিধি, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণসহ কম্পিউটার ব্যবহার, 'গবেষণা, বুনিয়াদী, উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন, সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স পর্যন্ত রয়েছে। এ ছাড়াও ৪টি বিভাগীয় শহরে অবস্থিত আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ১৬টি বিভিন্ন ধরনের কোর্স রয়েছে।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিত কোর্স গুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ– কর্মজীবন উন্নয়ন মূলক কোর্স এবং পেশাদারী দক্ষতা উন্নয়ন মূলক কোর্স। পেশাদারী দক্ষতা উন্নয়ন মূলক কোর্সের মধ্যে ছোট ছোট বিভিন্ন পেশার সংশ্লিষ্ট কোর্সগুলো অন্তর্ভূক্ত। যেমনঃ– প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, আর্থবিধি, গবেষণা, সংক্ষিপ্ত

ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কোর্স প্রভৃতি। এ কোর্সগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া চাকুরী কালীন বিভিন্ন সমস্যা, বিধিসমূহ, চাকুরীকালীন আচরণ, জনগণের প্রতি সেবামূলক ও সহমর্মিতা সম্পন্ন মনোভাব গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে এ ধরনের কোর্স সমূহ পরিচালনা করা হয়।

কেন্দ্রে কর্মজীবন উন্নয়ন মূলক কোর্সের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং সাভারস্থ সদর সপ্তরে এই কোর্সগুলো পরিচালিত হয়। এ ধরনের তিনটি কোর্স আছে। এই কোর্সগুলো অনেক আগে থেকে আমাদের দেশের ক্যাডারভুক্ত সরকারী কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলবার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। দেশের ভৌগলিক এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে এই কোর্সগুলোর অবয়ব এবং উপকরণও পরিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

সরকারী কর্মীবাহিনীকে যারা নেতৃত্ব দেন, প্রশাসনের কাংখিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য--সেই আমলাদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলাই এই কোর্সগুলোর লক্ষ্য। যে কোন দেশের উন্নয়নে উন্নয়নমুখী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন নিয়মতান্ত্রিক আমলাবাহিনী যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সচেতন নাগরিক মাত্রই উপলব্ধি করবেন। আমলাদেরকে দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্যই প্রশিক্ষিত করে তোলা দরকার। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কোন্ লক্ষ্য নিয়ে কিভাবে এদেরকে প্রশিক্ষিত করা হবে সেবিষয়ে আমাদের কোন নীতি নির্ধারণী নেই। দেশের সিভিল সার্ভিসের প্রবীন সদস্য, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের ইকোনোমিক মিনিষ্টার, ডঃ আকবর আলী খান মনে করেন আমাদের দেশের প্রশাসনের মূল সমস্যা ৩টি-- ১. দুর্নীতি, ২ অদক্ষতা এবং ৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মন্থর গতি।[১] ডঃ খানের সাথে একমত পোষণ করে আরও একটি মনোভাবগত সমস্যার উল্লেখ করা যেতে পারে— জনগণের জন্য সেবামূলক মনোভাব আমাদের প্রশাসনে ক্রমাগত ক্ষীণতর হচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রশাসনিক অদক্ষতার কারণ সমূহ চিহ্নিত করে এখনই তার প্রতিকারের (প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে) মনোভাব গড়ে তোলা দরকার। প্রশাসনিক অদক্ষতা নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে জনগণের জন্য যোগ্য প্রশাসন গড়ে তোলা যাবেনা। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার কার্যক্রম

---

১. ৯-১২ এপ্রিল, ১৯৯০, বিপিএটিসির অনুষদর্গের উদ্দেশ্যে ডঃ আকবর আলী খানের বক্তৃতা মালা।

পরিচালনা করে যাচ্ছে। অবশ্য এই লক্ষ্য অর্জন সহজসাধ্য নয়– বিশেষতঃ আমাদের জটীল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল কোর্সগুলো প্রশাসনের সুস্পষ্ট তিনটি সোপানের প্রশিক্ষণ চাহিদার আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। নবনিযুক্ত কর্মকর্তা যারা প্রতিযোগিতা মূলক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকুরীতে প্রবেশ করেন তাদের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রণীত। সরকারের মধ্যমস্তরের কর্মকর্তা যারা ক্ষৈত্রিক পর্যায়ে প্রশাসনে নেতৃত্ব প্রদান করছেন তাঁদের জন্য – উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স এবং নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স প্রণয়ন করা হয়েছে। **বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ** কার্যক্রম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সকল ক্যাডারে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রশাসন ও উন্নয়ন সম্পর্কে একটি মৌল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী। এ প্রশিক্ষণ কোন বিশেষ ক্যাডার বা বৃত্তির ওপর গুরুত্বারোপ করে না। কর্মজীবন শুরুর পূর্বে যেসব সাধারণ এবং মৌলিক বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করা হয় সে বিষয় গুলোই এই পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশেষ দক্ষতা বৃদ্ধি এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য নয় বরং প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যক্তিত্বের সার্বিক সৃজনশীল বিকাশ ও একটি উন্নয়নশীল দেশের স্থবির আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে গতিশীল নেতৃত্বের উপযোগী মানসিকতা প্রস্তুত করা এই কোর্সের উদ্দেশ্য। দেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়াদি, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমস্যা, সম্ভাবনা, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জের সাথে নতুন দিনের প্রশাসকদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় কোর্সের পাঠ্যবিষয় ও কর্মকাণ্ডের সহায়তায়।

শিক্ষানবীশ কর্মকর্তাদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য কর্মসূচীর লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে ঃ-

১. সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে সাংবিধানিক ও আইনগত ভূমিকা উপলব্ধি করা,

২ নির্ধারিত বিষয় সমূহে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা,

৩. কঠোর শারিরীক ও মানসিক শ্রমের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হওয়া,

৪. ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও নিয়ম শৃংখলা মেনে চলার মানসিকতা সৃষ্টি করা,

৫. সিভিল সার্ভিসের সকল ক্যাডারের সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্টতর সহযোগিতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ক্যাডারের প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহিত করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব সৃষ্টি করা,

৬. প্রশাসন ও উন্নয়ন সম্পর্কে তাত্বিক ও প্রয়োগিক জ্ঞানবৃদ্ধি এবং অবাস্তব, খণ্ডিত ও কূপমণ্ডুক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা,

৭. সাধারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আচার–আচরণ, আদব কায়দার সাথে পরিচিত করা, এবং

৮. ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিষয়ে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে তোলার পদ্ধতি চালু আছে।

১৯৭৭ সালের দিকে যখন 'কোটা' (COTA) প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাংলাদেশে প্রথম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ চালু করা হয়। তখন সরকারের ধারণা ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যে রকম প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডার গঠন করতেন—সে রকম ভাবে বাংলাদেশও ক্যাডার সার্ভিস গড়ে তোলা হবে। সেই অনুসারে ধারণা ছিল পাকিস্তানে অথবা ভারতে যে রকম সবাইকে সাধারণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বাংলাদেশও সেরকম সকলকে একই ধরনেরপ্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

কিন্তু বাংলাদেশে ৩১ টি ক্যাডার গঠিত হয়েছে[২]। পাকিস্তানে বা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে এত অধিক সংখ্যক ক্যাডার নেই। সেখানে প্রাদেশিক সরকারের আওতায় অনেক গুলো সার্ভিস ন্যস্ত আছে। ফলে ঐ দেশ দুটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের মুষ্টিমেয় কতিপয় ক্যাডারের জন্য Common Training Program আয়োজন সম্ভব হচ্ছে – যা বাংলাদেশের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ যখন এই সাধারণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গৃহীত

২. বর্তমানে Senior Services Pool ভেঙ্গে দেওয়ায় ক্যাডারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০টি।

হয়েছিল তখন ধারণা করা যায়নি বাংলাদেশের বর্তমান ৩০টি সার্ভিসের বিপুল সংখ্যক সদস্যদেরকে এই প্রশিক্ষণ দিতে হলে কতটা বিশাল এবং ব্যাপক প্রশিক্ষণ সুবিধা সৃষ্টি করা আবশ্যক।

প্রথমে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল ৬ মাস, পরে সেটা করা হয় ৪ মাস। বর্তমানে এই প্রশিক্ষণ ২ মাস মেয়াদে – 'বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ' – নাম দিয়ে চালানো হচ্ছে। কারণ ইতোমধ্যেই বিভিন্ন ক্যাডারের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা মেটাতে না পারার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট অপ্রশিক্ষণের জের (Back log)।

বিপিএটিসি প্রতিষ্ঠার পূর্বপ্রস্তুতির সময় বিশ্ব ব্যাংকের পক্ষে থেকে Instititue of Public Administration (IPA) কে নিয়োগ করা হয়েছিল বাংলাদেশে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপনের জন্য। ১৯৮১ সালে আই, পি, এ, তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছিল - ''Recent entrance in to Class I of the civil service is the number between 120 and 130 per Annum. The number is not expeccted to exceed 200 during the next five years"-এই রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০০ প্রশিক্ষণার্থীর একত্রে প্রশিক্ষণ সুবিধা সৃষ্টি করা হয় এবং ৩০টি ক্যাডারের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ শুরু হয়– ১৯৮৪ সালে। প্রথমে ৪ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ শুরু হলেও Back log শুরু হওয়ায় এখন ২ মাসের বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর বিভিন্ন ক্যাডারের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্বও বিকেন্দ্রীকৃত হয়েছে। বর্তমানে বিপিএটিসি, কুমিল্লা ও বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, গাজীপুরের সার্ডি, টেলিকম ইনস্টিটিউট, সাভারের ও টি আই, শিক্ষামন্ত্রণালয়ের নিয়েয়ার, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিপসম সহ মোট ১৩টি প্রতিষ্ঠানে ২ মাসের বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ চলছে। আশা করা যায় Back log শেষ হলে আবার বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত সকল ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য সাধারণ সুবিধা সম্পন্ন ৪ মাস মেয়াদী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ শুরু করা যাবে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে প্রধান অসুবিধা হোল– এতে বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে সমঝোতা ও সৌহার্দের সূচনা হতে পারতো– তা ব্যাহত হচ্ছে। প্রবীণ প্রশিক্ষকগণ মনে করেন মেয়াদ সংক্ষিপ্ত হওয়ার

কারণে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ—প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ দুইমাস সময় পারস্পরিক বন্ধুত্ব সৃষ্টির জন্য খুবই সামান্য। অথচ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের এটিই মূল লক্ষ্য। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে প্রশিক্ষণার্থীরা যখন প্রশিক্ষণে আসেন তখন প্রথম মাসে তাদের মধ্যে পাস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাসে সম্পর্কের টানা পোড়েন চলে এবং ৪র্থ মাস থেকে পারস্পরিক সম্পর্ক দানা বাঁধতে শুরু করে।

এই বিবেচনায় বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ তার কাংখিত এবং সবচে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। পাকিস্তান/ শ্রীলংকা, ভারত, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যাবলী পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টিই বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য।

বিপিএটিসিতে বুনিয়াদী পর্যায়ে একসাথে কমবেশী ২৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী মনোয়ন দেওয়া হয়। অধিক সংখ্যা প্রশিক্ষণের লক্ষ্য অর্জনের অন্তরায়। কিন্তু তৎসত্বেও বিপিএটিসিতে যারা প্রশিক্ষণ নিতে আসেন তাদেরকে কঠোর শরীর চর্চা, খেলাধুলা. তাত্ত্বিক আলোচনা এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করতে হয়। দুই মাস কেন্দ্রে অবস্থানের পর অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীকেই বিদায়ের সময় দেখা যায় বেদনাক্লিষ্ট। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি যেন নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এই দুই মাস সময়ের মধ্যেই। মেয়াদ বাড়ানো সম্ভব হলে এই বন্ধুত্বকে হয়তো একটি স্থায়ী রূপ দেওয়া সম্ভব হোত। সরকারে লক্ষ্য অর্জনের জন্য তৈরী হোত একটি স্থায়ী আন্তঃর্ব্যক্তিক সমন্বয়।

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের নির্ধারিত ডরমিটরীতে অবস্থান বাধ্যতামূলক। প্রাত্যহিক শরীর চর্চা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও নিয়মিত অধিবেশন ও ব্যবহারিক কার্যক্রমে উপস্থিতি বাধ্যতামুলক। বাংলাদেশ চর্চা, লোক প্রশাসন ও উন্নয়ন অর্থনীতির ওপর তাত্ত্বিক ধারণা প্রদান করা হয় এই কোর্সে। অফিস ব্যবস্থাপনার নিয়মকানুন, শৃংখলা ও আপীল বিধি, নৈতিকতা– প্রভৃতি বিষয়ও প্রশিক্ষণসূচীর অন্তর্ভূক্ত। ওপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও সভা পরিচালনা, গ্রামাঞ্চলে সমীক্ষা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, মৌখিক উপস্থাপনা, কমিটি কার্যক্রম, গ্রন্থগার ব্যবহার, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের দিন অতিবাহিত হয়।

মধ্য সোপানের কর্মকর্তাদের জন্য বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যে কোর্সটি বর্তমান চালু আছে সেটির নাম **উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স** (Advanced course on Administration and Development, ACAD) —১৯৬০এর দশকে তদানিন্তন পাকিস্তান আমলে সাবেক নিপা (National Institute of Public Administration — NIPA) তে প্রণীত হয়েছিল। ১৯৬১ সালে যখন কোর্সটি প্রথম চালু হয়েছিল তখন এর নাম ছিল Advanced Development Management Program (ADMP)[৩]।

১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত নিপাতে মোট ৯টি এডিএমপি, কোর্স হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে কোর্সটির নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নাম এসিএডি রাখা হয়। পাকিস্তান আমলে ১৯৬৭ সালের ৬ জানুয়ারী থেকে ১৯৭১ সালের ১৫ মে তারিখ পর্যন্ত মোট নয়টি এসিএডি কোর্স হয়েছিল। কোর্সটিতে দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়। কোর্সটির মেয়াদ ছিল ৩ মাস।

বছরে দুইবার এই কোর্স অনুষ্ঠিত হোত এবং প্রতি ব্যাচে থাকতো ২৪ জনের মতো মধ্যসোপানের কর্মকর্তা (উপ -সচিব অথবা সমপর্যায় ভূক্ত)। নিপাতে যখন এই কোর্স শুরু হয় তখন তা আবাসিক ছিল না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৫ সালের ১৫ অক্টোবর থেকে ১৯৮৩ সালের ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ১২টি এসিএডি কোর্স পরিচালিত হয়। সব মিলিয়ে নিপাতে মোট ৩০টি এসিএডি কোর্স হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৯০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মোট দশটি এসিএডি কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মধ্যসোপানের এই প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্যসমূহ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে- কিন্তু কোর্স কাঠামো এবং প্রশিক্ষণার্থীদের পর্যায় প্রায় একই আছে। ১৯৭৫ সালে কোর্সটি -দক্ষতা উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা চিহ্নিত করণ, দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা, বিধিসমূহের সঠিক প্রয়োগ, উন্নয়ন লক্ষ্য, আধুনিক কৌশল, মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সহমর্মিতা, প্রকল্প প্রণয়ন এবং উৎপাদন সম্পর্ক বিষয়ে অবগত করা-এই ৯টি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। কোর্সটির পাঠ্যসূচীতে প্রশাসনিকঃ তত্ব ও তার প্রয়োগ,

---

৩. Md. Mozammel Haque & Mrs. Ayesha Azim, **Assesment of Training Need of Mid level officers: A research study on ACAD,** 1989, P. 10.

মধ্যসোপানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের খতিয়ান[৪] ঃ–

সময় কাল	প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
২১জুন ১৯৬২ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ পর্যন্ত	নিপা	৯	১৯০
৬ জানুয়ারী ১৯৬৭ থেকে ১৫ মে ১৯৭১ পর্যন্ত	নিপা	৯	১৯০
১ অক্টোবর, ১৯৭৫ থেকে ৩০ আগষ্ট ১৯৮৩ পর্যন্ত	নিপা	১২	২২০
৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ থেকে এপ্রিল, ১৯৯০ পর্যন্ত	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১০	২১২
	সর্বমোট	৪০	৮১২

মানবিক সম্পর্ক ও প্রশাসনিক যোগাযোগ, আর্থব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, সরকার ও রাজনীতি, গবেষণা পদ্ধতি, বাংলাদেশ চর্চা প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভূক্ত।

বর্তমানে বাংলাদেশে মধ্যসোপানের যে সমস্ত কর্মকর্তা আছেন তাঁদের অধিকাংশই বাংলাদেশ আমলে চাকুরীতে প্রবেশ করেছেন। স্বাধীনতার পরের বছরগুলোতে যুদ্ধপরবর্তী অবস্থায় এ সমস্ত কর্মকর্তাদেরকে সঠিক ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন– অথচ কর্মকর্তাদের এই স্তরটি বর্তমানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সোপানে কাজ করেন। একারণে মধ্যস্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

৪. সূত্রঃ (ক) ৩ নং পাদটীকায় উল্লিখিত গ্রন্থ,
(খ) বিপিএটিসির কর্মসূচী শাখা।

বিপিএটিসিতে সরকারের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব অথবা স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের (ক্যাডার বর্হিভূত) সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য **সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সে** আয়োজন করা হয়।

জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুসারে সরকারের যে সমস্ত কর্মকর্তা ৪,৭৫০/–টাকা বা তদুর্দ্ধ স্কেলে বেতন পান তারাই কেবল মাত্র সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণের উপযোগী বলে বিবেচিত হন। বাংলাদেশের অভ্যূদয়ের পূর্বে তদানীন্তন Pakistan Adminstrative Staff College, লাহোরে সিএসপিদের জন্য সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের আয়োজন করা হোত। স্বাধীনতার পর ১৯৭৭ সালের ৩ জুনে বাংলাদেশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ষ্টাফ কলেজ— (Bangladesh Adminstrative Staff College, BASC) স্থাপিত হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘজীবী হয়নি। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর প্রতিষ্ঠানটি বিপিএটিসির সাথে একীভূত হয়ে যায় এবং ১৯৮৫ সাল থেকে বিপিএটিসিতে নিয়মিত সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স অনুষ্ঠান শুরু হয়।

বাংলাদেশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ষ্টাফ কলেজ (বিএএসসি) – এবক্তৃতা ও আলোচনা, সিণ্ডিকেট, সেমিনার, ক্ষৈত্রিক পর্যায়ে গবেষণা, বৈদেশিক শিক্ষাসফর, কেস ষ্টাডি–প্রভৃতি প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অনুসৃত হোত। বাংলাদেশের জনগণ, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, উন্নয়ন প্রশাসন, সংগঠন তত্ব, আর্থপ্রশাসন, পরিকল্পনার কলাকৌশল প্রভৃতি কোর্সের পাঠ্য বিষয়ভুক্ত ছিল।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তৎসত্বেও ১৯৯০ সালের প্রথমার্ধ নাগাদ কেন্দ্র দশটি সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স পরিচালিত করেছে।

কেন্দ্রে পরিচালিত সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের লক্ষ্য মূলতঃ দুটি–(ক) সরকারের ক্যাডার এবং ক্যাডার বহির্ভূত সিনিয়র কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি করা, (খ) সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের কলাকৌশল সম্পর্কে কর্মকর্তাদেরকে পারদর্শী করে গড়ে তোলা।

ঐতিহ্যগতভাবে প্রতিটি সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের সামগ্রিক কার্যক্রম একটি কেন্দ্রীয় বিষয়ের (Central theme) লক্ষ্যাভিসারী হয়ে থাকে। যেমন ৮ম সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের কেন্দ্রীয় অধীত বিষয় ছিল দারিদ্র দূরীকরণ (Alleviation of Poverty), নবম কোর্সের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল কাঠামোগত সামঞ্জস্য বিধান (Structural Adjustment)। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শিক্ষা সফর এবং অন্যান্য

কর্মকাণ্ডে মূল অধীত বিষয়ের ওপর নীতি নির্ধারণী এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন।

বর্তমানে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন কেন্দ্রে কোর্সটি– (ক) শ্রেণীকক্ষ বক্তৃতা এবং আলোচনা (খ) সিণ্ডিকেট (গ) সেমিনার (ঘ) শিক্ষাসফর (ঙ) উপাত্তসংগ্রহ ও রিপোর্ট লিখন (চ) সম্প্রসারণ বক্তৃতা (ছ) খেলাধুলা এবং (জ) গ্রন্থাগার ব্যবহার কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

কোর্সের অংশগ্রহণকারীদের জন্য বাধ্যতামূলক[৫] বিষয়গুলো হোল ঃ –
১. বিপিএটিসি ডরমিটরীতে নির্ধারিত কক্ষে অবস্থান, ২. প্রতিটি অধিবেশনে উপস্থিতি, ৩. সিণ্ডিকেট এবং সেমিনার উপস্থাপনা ও রিপোর্ট লেখা, ৪. নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, ৫. আইন কানুন ও শৃংখলা মেনে চলা ,এবং ৬. কর্মকাণ্ডের জন্য বিপিএটিসি কতৃপক্ষের কাছে দায়বদ্ধ থাকা।

পাঠ্য বিষয় হিসেবে (ক) লোক প্রশাসন এবং নীতি বিশ্লেষণ (খ) সরকার ও প্রশাসন (গ) উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় সরকার (ঘ) অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৌলিক সমস্যা (ঙ) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশল (চ) আন্তজার্তিক অর্থনৈতিক সমস্যা এবং (ছ) প্রতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বর্দ্ধন প্রভৃতি বিষয় কোর্সের অন্তর্ভূক্ত।

অনেকে প্রশ্ন তুলে থাকেন—সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের পেছনে অর্থ ব্যয় হয় প্রচুর— কিন্তু সেই তুলনায় এর উদ্দেশ্যসমূহ কি ঠিক ঠিক ভাবে অর্জিত হয়? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। তবে এটুকু বলা যায় কোর্সগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিমাণ অসামঞ্জস্য এবং প্রতিবন্ধকতা থাকে– তাতে কোর্সগুলোর সফলতার মাত্রা যা হওয়া উচিত বর্তমানে ফলাফল বরং তারচে ভাল। ডঃ আকবর আলী খান মনে করেন প্রকৃত পক্ষে Senior staff course এ ওপরোক্ত বিষয়গুলোর ওপর Action Research করা উচিৎ। কারণ সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে কর্মকর্তা আসেন– Business Executive, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, যুগ্মসচিব ইত্যাদি—তাঁদের কর্মপরিধিও আলাদা। অথচ তাদেরকে একই কেন্দ্রীয় বিষয়ের (Central Theme) ওপর কাজ করতে দেওয়া হয় – ফলে পুরো প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি কেন্দ্রীয় বিষয়ের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যাভিসারী হয়না। এটা প্রায়শইঃ ঘটে থাকে অবহেলা এবং খামখেয়ালীপূর্ণ মনোয়ন পদ্ধতির কারণে। আবার

---

৫. ৮ম সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের পরিচিতি পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

যারা প্রশিক্ষণে আসেন তাঁরাও সেমিনার, Syndicate —এ মনোযোগী হন না অনেক সময়। প্রশিক্ষণটাকে তারা অবকাশ যাপনের সময় মনে করেন। ফলে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবার উপক্রম হয় কোন কোন ক্ষেত্রে।

Policy Formulation সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের আরেকটি মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য ওই কাজটি করে থাকে বিশ্বব্যাংক। প্রকৃত পক্ষে আমরা প্রশাসনিক দিক থেকে এখনও প্রাদেশিক মনোভাব সম্পন্নই রয়ে গেছি। ডঃ খানের মতে আমরা আগে ছিলাম বিদেশের উপনিবেশ আর এখন বিশ্বব্যাংকের। কাজেই সিনিয়র কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা শিখিয়ে তাকে অর্থবহ করতে হলে এবং সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সকে সাফল্য মণ্ডিত করতে হলে সবচে বড় প্রয়োজন আমাদের দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিজের হাতে নেওয়া। মনোনয়ন পদ্ধতির এুটি দূরকরা এবং কোর্সটি বাস্তবতার আলোকে ঢেলে সাজানো।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশসমূহের অন্যতম।এ দেশের জনগণ দারিদ্র সীমার নীচে দিনাতিপাত করে। সামাজিক বাস্তবতার প্রতি খেয়াল রেখে তাই আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাতে হবে এবং কর্মকর্তাদেরকে এমন ভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে–যাতে জাতীয় ঋণের বিনিময়ে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তারা জাতিকে উপযুক্ত সেবা প্রদান করতে পারে, ঔপনিবেশিক মনোভাব কাটিয়ে উঠে স্বাধীন দেশের উপযোগী প্রশাসন গড়ার মনোভাব যেন তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যখন গড়ে ওঠে তখন এর সামনে সুবিস্তৃত লেক, নির্মাণাধীন ইমারত আর বাহ্যিক আলোর ঝলকানি দেখে প্রতিষ্ঠানটিকে প্রশিক্ষণের তাজমহল বলে আখ্যায়িত করেছিলেন জনৈক সমালোচক। তাঁর মতে তাজমহলের সৌকর্যে শাহজাহানের প্রেমের সমাধি রচিত হয়েছিল, আর তার সামনে ছিল যমুনা নদী।

সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তার পূর্ণক্ষমতা নিয়ে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশ বিদেশের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকর প্রশিক্ষণ কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। আন্তঃক্যাডার সমঝোতা, প্রশাসনে নতুন প্রাণের সঞ্চার আর লোক প্রশাসনে জনগণের প্রতি সেবামূলক মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে কেন্দ্রটি তার সমস্ত মেধা ও শ্রম নিয়োজিত রেখেছে। বিপিএটিসির বর্তমান কর্মতৎপরতা এবং প্রাণচাঞ্চল্য আজ একথাই প্রমাণ করে এই প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণের সমাধিস্থল নয়—এই প্রতিষ্ঠান স্বাধীন বাংলাদেশে গণমুখী প্রশাসন গড়ার সূতিকাগার। স্বাধীন দেশের

একনজরে বিপিএটিসির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের খতিয়ান [৬]

(ক) বিপিএটিসি সদর দপ্তরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (এপ্রিল ১৯৮৪ থেকে মে, ১৯৯০ পর্যন্ত)

কোর্সের নাম	কোর্সের সংখ্যা	কোর্সের লক্ষ্য মাত্রা	প্রকৃত অংশ- গ্রহণকারীর সংখ্যা
১. বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স	১৯	৩৪৩৫	৩০৫৭
২ উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স	১০	২৮৫	২১২
৩. সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স	১০	২৩০	১৮৩
৪. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	১১	২১০	১৬৯
৫. অন্যান্য কোর্স	৭১	২৬২৯	২৩৯১
মোট	১২৪	৬৬২৬	৬০১২

অর্জিত প্রশিক্ষণার্থী লক্ষ্যমাত্রা = ৯০.৭৩%

(খ) আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম (মার্চ ১৯৯০ পর্যন্ত)ঃ কোর্সের সংখ্যা ৬১৭, প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৪০২৯, আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোর জন্য এসময়ে প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২১,৭৬০ জন এবং কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৫৬ টি। অর্জিত প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা ঃ ৬৪.৪৭%।

লোক প্রশাসনে সাবলীল প্রাণসঞ্চারের শ্রমসাধ্য এবং প্রাণান্ত সংগ্রাম চলছে এখানে। আগামী দিনের প্রশাসনে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব প্রসবের জন্য যন্ত্রণায় ভুগছে এই বিশাল প্রতিষ্ঠান।

এই প্রতিষ্ঠানের সমস্যা আছে, জটীলতা আছে কিন্তু তার পেছনে সম্ভাবনারও ইঙ্গিত আছে। কারণ দেশের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধি না পেলে কোন অবস্থাতেই সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে না। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায়ও উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হোক আধুনিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতির দিক নির্দেশক। সুদক্ষ প্রশাসক গড়ে তোলার কর্মপ্রবাহ এখান থেকেই হোক শুরু।

৬. সূত্রঃ বিপিএটিসির কর্মসূচী শাখা।

বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণা ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের সমস্যা

—আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান

অন্যান্য প্রকার গবেষণার তুলনায় সামাজিক গবেষণায় ক্ষৈত্রিক পর্যায়ে এবং জনগণের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বেশী দেখা যায়। কারণ, সামজিক গবেষণায় যে কোন সামাজিক সমস্যার কার্য–কারণ সম্পর্ক, পারস্পরিক তুলনা কিংবা কারণ ও সমাধান নির্ণয়ের প্রচেষ্টা বিদ্যমান থাকে, তাই এসব বিষয়ে জনমতের যেমন ব্যাপক গুরুত্ব থাকে, তেমনি ক্ষৈত্রিক পর্যায়ের তারতম্য প্রাধান্য লাভ করে।

এক কথায় বলা যায় যে, সামাজিক গবেষণার তথ্য/কাঁচামাল বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে আহরিত হয়। যেহেতু সামাজিক গবেষণায় ব্যক্তিমতের প্রধান্য বেশী, সেহেতু ব্যক্তির মত যথার্থভাবে আহরিত ও বিশ্লেষিত না হলে প্রতিবেদনের যথার্থতা বিচার্য বিষয়ে পরিণত হয়।

বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণার তথ্য সংগ্রহের দুটি পর্যায়ে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। প্রথম পর্যায়কে " প্রাক তথ্য সংগ্রহকালীন সমস্যা" এবং দ্বিতীয়টিকে "তথ্য সংগ্রহকালীন সমস্যা" বলে অভিহিত করা যায়। প্রাক তথ্য সংগ্রহকালীন সমস্যা সমূহের সমাধানে গবেষক নানা প্রকার প্রয়াস চালাতে পারেন। অনেক সময় সেগুলো বহুলাংশে দূর করতে পারেন। কিন্তু তথ্য সংগ্রহকালীন সমস্যার খুব সামান্য অংশই সমাধানের ক্ষমতা গবেষকের থাকে, বিপুল অংশই তার আয়ত্বের বাইরে অবস্থান করে।

১। প্রাক তথ্য সংগ্রহকালীন সমস্যার মধ্যে (ক) সংজ্ঞা নির্ধারণ জনিত সমস্যা (খ) নমুনায়ন জনিত সমস্যা (গ) পরিমাপের স্কেল নির্ধারণ জনিত সমস্যা ও (ঘ) 'একক' নির্বাচন জনিত সমস্যা অন্যতম বলে বিবেচিত হয়।

১। প্রাক তথ্য সংগ্রহকালীন সমস্যাবলী বিশ্লেষিত অবয়বে আলোচনা করা যেতে পারেঃ

ক) সংজ্ঞা নির্ধারণঃ সামাজিক গবেষণায় প্রতিটি প্রত্যয় (Concept) কে একটি নির্দিষ্ট ও বাস্তব সংজ্ঞা দ্বারা সীমায়িত করতে হয়, যাতে ঐ প্রত্যয় দ্বারা নির্ধারিত একটি বিষয়কে অনুধাবন করা সম্ভব হয়। যেমন 'শিক্ষক' একটি প্রত্যয়। গবেষণার ক্ষেত্রে এই

প্রত্যয়টিকে ব্যবহার করতে হলে শিক্ষক অর্থে (১) ব্যক্তিটি কি পরিমাণ শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হবে, (২) আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক– কোন্ প্রকারের শিক্ষাদানে রত থাকবে, (৩) খণ্ডকালীন, সাময়িক বা নিয়মিত শিক্ষাদান কর্ম চালু রাখবে, (৪) বেতন গ্রহণকারী নাকি অগ্রহণকারী হবে, (৫) প্রাথমিক/মাধ্যমিক/উচ্চতর–কোন পর্যায়ে শিক্ষাদান করবে, (৬) শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করবে নাকি ব্যক্তিগত পর্যায়ে (টুইশনি) শিক্ষকতা করবে, (৭) কত বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হবে–ইত্যাদি সম্ভাব্য সকল প্রকার সীমা নির্ধারণ করতঃ 'শিক্ষক' প্রত্যয়টির কার্যকরী সংজ্ঞা (Working definition) পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। তা যদি না করা হয়, তাহলে কেবলমাত্র সংজ্ঞার অভাবে প্রত্যয়টিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভবপর হবে না। শুধু তাই নয়, প্রদত্ত সংজ্ঞাটির সঙ্গে বাস্তবতার এবং অন্যান্য গবেষকদের প্রদত্ত সংজ্ঞার সামঞ্জস্য থাকতে হবে। অন্যথায় প্রত্যয়টিকে কেন্দ্র করে পরিচালিত গবেষণার মাঝে তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেওয়া যথার্থ হবে না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ১৯৬১ সালের আদম– শুমারীর সময় 'শিক্ষিত' প্রত্যয়টির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় যে, "যে ব্যক্তি যে কোন ভাষায় কিছু পড়তে পারে তাকে শিক্ষিত বলে গণ্য করা হবে" সেই সংজ্ঞা অনুসারে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিতের হার শতকরা ২৩ ভাগ বলে গণনা করা হয়। ঐ একই সংজ্ঞা অনুসারে ১৯৬৯ সালে পরিচালিত এক জরীপে শিক্ষিতের হার নির্ধারিত হয় শতকরা ২৬ভাগ। ১৯৭৪ সালের আদম শুমারীকালে বাংলাদেশে "শিক্ষিত" প্রত্যয়টিকে এভাবে পুনঃ সংজ্ঞায়িত করা হয় "যে ব্যক্তি বাংলা ভাষায় নাম ঠিকানা লিখতে ও পড়তে পারে, সেই শিক্ষিত"। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী গণনায় শতকরা ১৯ ভাগ শিক্ষিত এদেশে পাওয়া যায়। ১৯৮১ সালের আদম শুমারী কালে পুনরায় সংজ্ঞা পরিবর্তন করে ধার্য হয় যে, "যে ব্যক্তি বাংলাভাষায় কমপক্ষে একটি চিঠি লিখতে ও পড়তে পারে, তাকেই শিক্ষিত ধরা হবে" এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শিক্ষিতের হার গণনায় শতকরা ২৩ ভাগ পাওয়া গেছে।

এখন যদি কেউ এদেশের শিক্ষার হার বিশ্লেষণ করেন, তাহলে তিনি ১৯৬১ ও ১৯৮১ সালের হারের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে না পেয়ে হতাশ হবেন। এখানে যে "শিক্ষিত" প্রত্যয়টির সংজ্ঞা তিনবার পরিবর্তিত হয়েছে, তা তিনি মূল জরীপের দলিল না খুঁজে কিছুতেই জানতে পারবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণে ও তুলনামূলক পর্যালোচনায় মারাত্মক ভ্রান্তি দেখা দিয়ে থাকে। ঠিক তেমনি বাড়ী বা খানা, পরিবার, গ্রাম, পাড়া, প্রভৃতি প্রত্যয়গুলোর সংজ্ঞা পরিবর্তনে এদেশের আদমশুমারী প্রতিবারই করিৎকর্মতার পরিচয়

দিয়ে থাকে। ফলে দেখা যায় এদেশে গ্রামের সংখ্যা ৬৮ হাজার না ৮৪ হাজার, নাকি ৯০ হাজার, তা নিয়ে পাঠকদের মাঝে দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি এক দফায় এই প্রত্যয়গুলোর কার্যকরী সংজ্ঞা নির্ধারণে সেমিনার বা কর্মশালার আয়োজন করে ঐকমত্য সৃষ্টি করা হতো, তাহলে এরূপ বিভ্রান্তি বার বার দেখা দিতো না।

সামাজিক গবেষকের পক্ষে একটি দুরূহ বিষয় এই সংজ্ঞা নির্ধারণ। যেমন-'আয়' প্রত্যয়টির সংজ্ঞা নির্ধারণে গৃহে পালিত হাঁস-মুরগী, ছাগল-গরু ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত আয় কিংবা গৃহিণীদের সাময়িক কোন হস্তশিল্প থেকে প্রাপ্ত আয়কে যোগ করা হয় না। অনেক অর্থনীতিবিদ তাই বাংলাদেশের মানুষের বর্তমান "মাথা পিছু গড় আয়" কে যথার্থ বলে মেনে নিতে রাজী হন না। তাঁদের মতে জাতীয় আয় গণনায় এরূপ বহুপ্রকারের সংজ্ঞা নির্ধারণ ও তথ্য প্রাপ্তির ত্রুটি বিচ্যুতি এদেশে বিদ্যমান রয়েছে।

(খ) **নমুনায়নঃ-** বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণার জন্য সঠিক ও যথার্থ নমুনায়ন বেশ কষ্টসাধ্য বিষয়। প্রধানতঃ নমুনায়নকে দুটি প্রকারে ভাগ করা হয়, (i) সম্ভাবনা নির্ভর নমুনায়ন, যেমন ঃ-দৈব চয়ন, স্তরিত নমুনায়ন, গুচ্ছ নমুনায়ন ও পদ্ধতিগত নমুনায়ন।

(ii) সম্ভাবনাহীন/উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন, যেমন অংশ মাফিক নমুনায়ন (Cota) আকস্মিক নমুনায়ন (Accidental) ও ইচ্ছা মাফিক নমুনায়ন (Purposive)। কাগজে কলমে বেশীর ভাগ সামাজিক গবেষক 'দৈব নমুনায়নের' কথা বললেও প্রকৃত পক্ষে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 'ইচ্ছা মাফিক (Purposive) নমুনায়ন' ব্যবহার করে থাকেন। এভাবে (Non-probability) সম্ভাবনাহীন নমুনায়নের অধিক ব্যবহারের ফলে "Sampling Eror" বা নমুনাজনিত বিচ্যুতি সামাজিক গবেষণায় অনেক বেশী অনুপ্রবেশ করে।

জানা গেছে যে, সামাজিক গবেষকগণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ সম্ভাবনা নির্ভর নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে চান।কিন্তু বাংলাদেশে সামজিক গবেষণার চাষ মাত্র কিছুদিন আগে আরম্ভ হওয়ায় এখনও গবেষকের অর্থ ও জনবল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে খুবই কম থাকে। এরূপ অবস্থায় দৈব চয়নে নির্ধারিত নমুনা ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়ার বিড়ম্বনা ও অনুপস্থিতি জনিত বিলম্ব মেনে নেয়া প্রায়শঃই গবেষকের পক্ষে সম্ভব হয়না। যার ফলে তাদের অধিকাংশই দৈব নমুনায়নের কথা প্রতিবেদনে লিখলেও উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন দ্বারা তথ্য সংগ্রহে বাধ্য হন। এক্ষেত্রে গবেষকের সহায়তায় নিযুক্ত তথ্য সংগ্রহকারীগণ অনেক সময় নির্দিষ্ট নমুনা ব্যক্তিকে খুঁজবার কষ্টটুকু স্বীকার না করে হাতের কাছে যাকে পান, তারই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করেন।

আরেকটি সমস্যা নমুনায়নের সঙ্গে জড়িত থাকে, তা হলো—এদেশে রাস্তাঘাট তেমন সুগম নয় এবং অনেকস্থানে যাতয়াত দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে দৈব নমুনায়নে বান্দরবনের লামা বা কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার নাম আস্‌লে সুকৌশলে তাকে এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া গবেষকের গত্যন্তর থাকে না।

(গ) **পরিমাপের স্কেল নির্ধারণঃ**– পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সম্প্রতিকালে এদেশে সামাজিক গবেষণা কর্মকাণ্ড চালু হয়েছে। তাই এখন পর্যন্ত গবেষকদের তেমন কোন শক্তিশালী সমিতিও নেই, যারা মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করে বিভিন্ন প্রত্যয় পরিমাপের স্কেল নির্ধারণ করবেন। ফলে এদেশে 'বিত্ত' বিভাজন জনিত প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে কেউ ১২টি, কেউ, ৯টি, কেউ ৫ টি এবং কেউ ৩টি শ্রেণী নির্ধারণ করেন। একটি তালিকায় বাংলাদেশে ব্যবহারকৃত বিত্তের শ্রেণী বিভাগ দেখানো হলোঃ–

বিত্তের শ্রেণী বিভাগ

১। উচ্চ বিত্ত	১। উচ্চ বিত্ত	১। উচ্চ উচ্চ বিত্ত
	২। নিম্ন উচ্চ বিত্ত	২। মাধ্যম উচ্চ বিত্ত
		৩। নিম্ন উচ্চ বিত্ত
২। মধ্য বিত্ত	১। উচ্চ মধ্যবিত্ত	১। উচ্চ মধ্যবিত্ত
	২। নিম্ন মধ্য বিত্ত	২। মধ্যম মধ্যবিত্ত
		৩। নিম্ন মধ্যবিত্ত
৩। নিম্ন বিত্ত	১। উচ্চ নিম্নবিত্ত	১। উচ্চ নিম্নবিত্ত
	২। নিম্ন নিম্নবিত্ত	২। মধ্যম নিম্নবিত্ত
		৩। নিম্ন নিম্নবিত্ত
		১। সাধারণ বিত্তহীন
		২। চরম বিত্তহীন
		৩। প্রকট বিত্তহীন

এরূপ বিভিন্ন প্রকার শ্রেণী বিভাগ বা পরিমাপের স্কেল নির্ধারণের ফলে সমাজের স্তর বিন্যাসের যথার্থতা কঠিন প্রশ্নের মাঝে নিপতিত হয়। শুধু তাই নয়, বিত্তের পরিমাপক স্কেলে শুধুমাত্র ভূমিকে পরিমাপক ধরা হবে, নাকি উপার্জন বা আয়কে ধরা হবে সেটাও

নির্ধারণ করা যায়না। যেমন ধরা যেতে পারে যে, শহরের একজন রিক্সাচালকের কোন জমি নাই, এমনকি রিক্সাখানাও ভাড়া করা। কিন্তু তার মাসিক আয় ৩–৪ হাজার টাকা। অপর পক্ষে গ্রামের একজন নিম্নবিত্ত, যার জমি ২ .৫০ একর রয়েছে। কিন্তু তার মাসিক আয় ১ হাজার টাকাও নয়। এক্ষেত্রে রিক্সাওয়ালাকে সামজিক স্তর বিন্যাসে "ভুমিহীন" দেখালে তা কিরূপ যথার্থ হবে? বাংলাদেশে পরিমাপক স্কেল নির্ধারণে কোন প্রকার ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় একেকজন একেকভাবে এসব প্রত্যয়ের পরিমাপক নির্ধারণ করে থাকেন।

(ঘ) একক (Unit of Analysis) নির্বাচন ঃ সামাজিক গবেষণায় কোন বিষয়ের একক নির্বাচন করতঃ বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করতে হয়। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সেই একক থেকেই তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। বাংলাদেশে একক নির্বাচন যে কোন গবেষকের নিকট বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, **'পরিবার'** নামক এককটি কিভাবে গঠিত হবে, সে বিষয়ে কোন ঐকমত্য নেই। কেউ শুধু স্বামী–স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে নিয়ে, কেউবা স্বামী– স্ত্রী ও ছেলে মেয়ের সংগে বাবা–মা ও ভাই বোন জুড়ে দিয়ে, কেউ আবার এগুলোর সঙ্গে অন্যান্য পোষ্য জুড়ে দিয়ে **'পরিবার'** নামক একক গঠন করেন। এর ফলে একটি গবেষণায় প্রাপ্ত পরিবারের তথ্যাদির সঙ্গে অন্য গবেষণায় প্রাপ্ত পরিবারের তথ্যাদি তুলনীয় হয়না। একজন নবীন গবেষক কোন্‌টিকে একক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করবেন–সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হিমসিম খান।

দ্বিতীয় প্রকারের সমস্যার চরিত্র কিছুটা ভিন্নতর বলে প্রারম্ভেই উল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ এই সমস্যাগুলো তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রিক পর্যায়ে উদ্ভুত হয়। এগুলো দূর করার ক্ষমতা প্রায়শঃই গবেষকের থাকেনা। বাংলাদেশে দ্বিতীয় প্রকারের সমস্যাগুলো পর্যায় ক্রমে আলোচনা করা হলোঃ—

(১) **উত্তর দাতাদের মূল্যবোধঃ** বাংলাদেশে এমন কিছু মূল্যবোধ প্রচলিত রয়েছে, যা সামাজিক গবেষণার তথ্য সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটায়। যেমন, এদেশে যৌনজীবন সম্পর্কে আলোচনা বা তথ্য প্রদানকে প্রায় সকলেই লজ্জাজনক কাজ বলে মনে করে। তাই জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রাপ্তি দুস্কর হয়। বাংলাদেশে প্রয়োজনের তাগিদে এই ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে সামাজিক জরীপ ও গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রায় বেশীর ভাগ গবেষণায় প্রকৃত তথ্য বের করে আনা সম্ভব হয়নি। সেজন্য নিরোধক সামগ্রী ব্যবহারকারীর প্রকৃত সংখ্যা অনেকটা কল্পনা প্রসূত হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপ ভাবে কোন বিষয়ে প্রচলিত প্রথা বা পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য

চাওয়া হলে নৈর্ব্যক্তিক উত্তর পাওয়া যায়না। উত্তরদাতাগণ বিষয়টিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে ফেলেন এবং সেভাবে প্রকৃত তথ্য গোপন করে যান।

(২) **উত্তর দাতাদের নিরক্ষরতা ঃ** নিরক্ষরতার ফলে উত্তরদাতাগণ সঠিক উত্তর দিতে পারেন না। তাই প্রাপ্ত তথ্য সঠিক হয়না। যেমন "মাসিক আয় নির্ধারণ" বা "বয়সের হিসাব" প্রদানে নিরক্ষর উত্তরদাতাগণ তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। যারফলে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ সঠিক পথে প্রবাহিত হয়না। বেশ কিছু প্রশ্নপত্রের প্রাপ্ত উত্তরে দেখা গেছে যে, উত্তরদাত্রী (মহিলা) তার বয়স ও তার ছেলের বয়স এক করে ফেলেন বা অবিশ্বাস্য কোন অংক বলে ফেলেন। নিরক্ষরতার ফলে উত্তরদাতাগণ তাদের কল্যাণকর কোন মতামতও রাখতে সক্ষম হন না।

(৩) **সঠিক উত্তর না দেয়ার প্রবনতাঃ** ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে এদেশের জনগণ প্রাশাসক বা সরকারী লোকদেরকে বিশ্বাস যেমন করেন না, তেমনি যথেষ্ট ভয় করেন। তাই যখন তাদের আয় বা জমির হিসাব জানতে চাওয়া হয়, তখন তারা প্রকৃত তথ্য না দিয়ে কম বলে থাকেন। তাদের ভয় থাকে যে, না জানি নতুন কোন বিপত্তি দেখা দেয়। ফলে কৃষি শুমারী বা অনুরূপ গবেষণা চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে।

প্রকৃত তথ্য না দেবার আরেকটা কারণ এই যে, জনগণের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী ও সাহায্য প্রাপ্তির প্রবনতা খুব বেশী থাকে। ফলে তারা যে কোন দুর্যোগ/ দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতিকে বাড়িয়ে বলেন, এবং প্রাপ্ত ত্রাণ/ সাহায্যকে কমিয়ে বলে আরও ত্রাণ/সাহায্য পাবার পথ সুগম করতে চান। এরূপ তথ্য সংগ্রহ করে সরকারী সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা গ্রহণ জটিল অবস্থা ধারণ করে। গ্রামাঞ্চলে ডিপ-টিউবওয়েল বসানো বা রাস্তা নির্মাণ জনিত গবেষণার তথ্য সংগ্রহে এরূপ ভ্রান্ত তথ্য চরম ক্ষতির কারণ হয়। যেমন—১ টি ডিপ-টিউবওয়েলের ২ মাইলের মধ্যে আরেকটি ডিপ-টিউবওয়েল বসানো নিরাপদ নয়। কিন্তু ভ্রান্ত তথ্য প্রদানের ফলে বহুস্থানে আধা মাইলের মধ্যে দুটি ডিপটিউবওয়েল বসানো হয়েছে। স্কুল/কলেজ নির্মাণের তথ্যও এভাবে ভুল পথে পরিচালিত করে।

(৪) **গবেষণা কর্মকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে না করা ঃ** কেবল অশিক্ষিত নয়, শিক্ষিত জনগণও এদেশে সামাজিক গবেষণাকে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করেন না। চাকরিজীবীগণ এক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে থাকেন। তারা সময় ও মনোযোগ দিয়ে কোন তথ্য দিতে চান না। কোন বিষয়ে সুপারিশ বা মন্তব্য তো সর্বতোভাবে পরিহার করেন।

তার ফলে দিনের পর দিন তথ্য প্রাপ্তির জন্য ঘোরাঘুরি করতে হয় এবং তথ্য পাওয়া গেলেও তা লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে না।

অনেক শিক্ষিত লোক এরূপ মন্তব্য করেন যে,—"এত খাটুনী করে এবং আমাদেরকে বিরক্ত করে তথ্য নেবার দরকার কি? ঘরে বসে পূরণ করে নিলেই পারেন" —বস্তুতঃ এদেশে "ঘরে তৈরী তথ্য বা "Manufactured data"-র খুব একটা অভাব দেখা যায়না। যার জন্যে সামাজিক গবেষণার সকল সেক্টর, বিশেষ করে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ভ্রান্ত তথ্য দ্বারা পরিচালিত হবার সুযোগ পায়। বাংলাদেশে এমনকি জেলা প্রশাসক পর্যায়েও বেশ ক'জনের নিকট থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণী বিষয়ে তথ্য দিনের পর দিন ঘুরেও পাওয়া যায়নি।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তথ্য প্রদানের জন্য নথি-পত্র পর্যালোচনার কষ্টটুকু স্বীকার করতে আগ্রহী থাকেন না। তারা গবেষণা কর্মকে 'মুল্যহীন কর্ম' বলে মনে করেন এবং তাদের নিকট তথ্য চাওয়াকে "বিরক্তিকর আবেদন" বলে বিবেচনা করেন। এরূপ মানসিকতার কারণে 'জাতীয় বেতন কমিশন' বা 'জাতীয় শিক্ষা কমিশনের' মত গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণের তথ্য সংগ্রহ দুরূহ কার্যে পরিণত হয় এবং বহুদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কাঙ্খিত লক্ষ্য মাত্রার তথ্য প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়না।

(৫) মধ্যম মানে অবস্থান- প্রবণতাঃ এদেশের উত্তরদাতাদের মধ্যে 'মধ্যম মানে অবস্থানের প্রবণতা' এত বেশী থাকে যে, কোন বিষয়ে যথার্থ ও নির্ভুল উত্তর তারা দিতে চান না। যেমন বলা যায়— "উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী আদালত স্থাপন জনগণের জন্য কতটা উপকার বয়ে এনেছে?" এরূপ একটি প্রশ্নের উত্তরে যদিঃ

(ক) প্রভূত উপকার বয়ে এনেছে

(খ) মোটামুটি উপকার বয়ে এনেছে

(গ) তেমন একটা উপকার বয়ে আনেনি

এরূপ ৩টি উত্তর দ্বারা 'রীতিবদ্ধ' বা Closed করা হয়, তাহলে ১০০জন উত্তরদাতার প্রায় ৯০ জনই 'মোটামুটি' এই উত্তরে টিক চিহ্ন দিবেন। ১ বা ৩ নম্বরের উত্তরটি তার মনের কথা হলেও "পাছে লোকে কিছু বলে" প্রক্রিয়ায় মধ্যম মানে টিক চিহ্ন দিয়ে থাকেন। এরূপ মানসিকতার ফলে প্রকৃত সত্য উদঘাটন সামাজিক গবেষকের পক্ষে সম্ভব হয়না।

সামাজিক গবেষণা সমাজের যে কোন সমস্যার কারণ, যে কোন বিষয়ের মূল্যায়ন এবং যে কোন বিষয়ের ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেক্ষেত্রে গবেষকের প্রকৃত তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার ভ্রান্তি থাকলে বা সংজ্ঞার ভুল থাকলে যেমন কাঙখিত তথ্য পাওয়া দূর্লভ হবে, তেমনি উত্তরদাতাদের মানসিকতা ও সততার অভাবেও সামাজিক গবেষণা বিপথগামী হতে বাধ্য। বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণা আরম্ভ হয়েছে বলতে গেলে মাত্র তিন দশক আগে। বিগত ২ দশক ধরে এই প্রকার গবেষণার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। প্রারম্ভ কালেই যদি তথ্য সংগ্রহের পূর্ববর্তী ও তথ্য সংগ্রহকালবর্তী সমস্যাবলী দূরীকরণে গবেষক ও সচেতন ব্যক্তিবর্গ একাত্ম হয়ে প্রচেষ্টা চালান, তাহলে তথ্য সংগ্রহ জনিত ভ্রান্তি দূর করা সম্ভবপর হবে।

পর্যালোচিত গ্রন্থপঞ্জী

১। আব্দুস সালাম আনসারী, "Social Rescarch in National Development", পাকিস্তান একাডেমী অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট, পেশোয়ার ১৯৬৩।

২। সৈয়দ আলী নকী— "সমাজ বিজ্ঞানে পরিসংখ্যান পদ্ধতি", বাংলা একাডেমী, ঢাকা–১৯৭৬।

৩। বেগম নাজমীর নূর, " সামাজিক গবেষণা পরিচিতি ", নলজ ভিউ, ঢাকা–১৯৮৪, পৃষ্ঠা–১৫৪।

৪। বাংলাদেশ ব্যুরো অব ষ্টাটিসটিকস, "শিক্ষা জরীপ–১৯৮৮", বিবি এস, ঢাকা, ১৯৮৯,

৫। মিঞা/মিয়্যান, " পরিসংখ্যান পরিচিতি ", আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা–১৯৮৮ পৃষ্ঠা ৯৫২।

৬। Seltiz, claire and others, "Research methods in Social Relations", Halt Rinehart and Winstar, New york, 1962.

কেন্দ্র পরিক্রমা-১

(৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী প্রবন্ধমালা)

[বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রের অনুষদবর্গ—প্রশিক্ষণ এবং ভৌতসুবিধাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনাগুলোকে একত্রিত (১৪৫ পৃষ্ঠা থেকে ১৮৮ পর্যন্ত) করেছেন কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক নাসির উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। 'কেন্দ্র পরিক্রমা-১' শিরোণামে প্রতিবেদনটি উপস্থাপিত হোল।

-- সম্পাদক]

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে কিছু তথ্য

-এ, জেড, এম,শফিকুল আলম

৩ মে, ১৯৯০ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হয়। দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হলেও কেন্দ্রটি বয়সে নবীন। ১৯৮৪ সালের ২৮ এপ্রিল কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। মাহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ৩ মে, ১৯৮৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে কেন্দ্রের অবকাঠামো এবং প্রশিক্ষণ পরিধি ক্রমাগত বিস্তৃতি লাভ করেছে। একই সাথে কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের গুণগতমানেরও উন্নয়ন ঘটেছে। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দেশ এবং জনগণের প্রতি সেবার মনোভাব সম্পন্ন দক্ষ গণপ্রশাসক গড়ে তোলার কাজে ব্যাপৃত।

২. কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উন্নয়ন প্রশাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দেশের সর্ববৃহৎ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এই কেন্দ্রে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন

ক্যাডারের সদস্য, স্বায়ত্বশাসিত এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

৩. কেন্দ্রের অবস্থানঃ

কেন্দ্রটি রাজধানী ঢাকা মহানগরীর প্রায় ২৫ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন রেডিও ষ্টেশনের মাঝামাঝি ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে অবস্থিত। লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আয়তন ৫৪.২৪ একর। প্রশিক্ষণার্থী, কেন্দ্রের অনুষদ এবং কর্মচারীদের আবাসিক সুবিধাসহ এখানে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ভৌত সুবিধাদি বিদ্যমান।

৪. কেন্দ্রের প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

- বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি ;
- প্রশাসনে বিভিন্ন ক্যাডার ও ক্যাডার বহিভূর্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয়, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার মনোভাব সৃষ্টি ;
- প্রশাসনকে জনগণের সেবা ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করার ব্রতে কর্মকর্তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং
- উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় কর্মকর্তাদের মনে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৫. প্রয়োজনীয়তাঃ

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার স্বাধীন দেশের উপযোগী লোক প্রশাসন পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য লোক প্রশাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্দ্ধি করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ চাহিদা পুরনের সেই আকাঙখারই বাস্তব রূপ আজকের বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)। অধ্যাদেশ (নং xxvi, ১৯৮৪)—বলে সাবেক Bangladesh Administrative Staff College, National Institute of Public Administration, Civil Officers Training Academy এবং Staff

Training Institute বিলুপ্ত ঘোষণা করে সমন্বিত আকারে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬. পরিচালনাঃ

লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনার কর্তৃপক্ষ এর শাসক পর্ষদ। সরকারের মনোনয়ন প্রাপ্ত একজন মন্ত্রী শাসক পর্ষদের সভাপতি। পদাধিকার বলে সদস্য হলেন— (১) মন্ত্রী পরিষদ সচিব, (২) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব, (৩) অর্থ বিভাগের সচিব, (৪) শিক্ষা বিভাগের সচিব, (৫) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, (৬) সরকারী মনোনয়ন প্রাপ্ত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য, (৭) কমাণ্ড্যান্ট, ডিফেন্স সার্ভিসেস কমাণ্ড এণ্ড ষ্টাফ কলেজ, (৮) সভাপতি, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব চেম্বারস অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ, (৯) পর্যায়ক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের সভাপতি, (১০-১২) সরকারী মনোনয়ন প্রাপ্ত একজন মহিলা সহ তিনজন সদস্য এবং (১৩) রেক্টর, বিপিএটিসি। সভাপতিসহ সর্বমোট ১৩জন সদস্য নিয়ে শাসক পর্ষদ গঠিত।

৭. মর্যাদা ঃ

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান রেক্টর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। তিনি শাসক পর্ষদের নির্দেশনা মোতাবেক দায়িত্ব নির্বাহ করেন।

৮. সংগঠনঃ

এই কেন্দ্র (১) ব্যবস্থাপনা ও লোক প্রশাসন, (২) উন্নয়ন অর্থনীতি, (৩) কর্মসূচী ও পাঠ্যক্রম এবং (৪) গবেষণা ও উপদেশনা-এই ৪টি প্রধান বিভাগ নিয়ে সংগঠিত।

বিভাগীয় প্রধান বা পরিচালন পর্ষদ সদস্য (এম ডি এস) বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব বা তদুর্ধ পদ মর্যাদা সম্পন্ন একজন কর্মকর্তা। প্রতিটি বিভাগকে কয়েকটি অনুবিভাগ এবং প্রতিটি অনুবিভাগকে কয়েকটি অধিশাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। অনুবিভাগ প্রধান হচ্ছেন একজন পরিচালক যিনি সরকারের একজন উপ-সচিব বা সম-পর্যায়ের কর্মকর্তা। অধিশাখা প্রধান হিসাবে উপ-পরিচালকগণ দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিটি অধিশখাকে একাধিক শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। শাখা প্রধান একজন সহকারী পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা।

৯. আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ

লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শুধু ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদেরকেই নয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদেরকেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় শহরে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন চারটি আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। আঞ্চলিক কেন্দ্র সমূহ স্ব-স্ব এলাকার সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। প্রতিটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান একজন উপ-পরিচালক।

১১. বিভিন্ন মুখী কর্মসূচী ঃ

প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা ও সার্বিক মনোন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্র বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে —

(ক) উর্ধ্বতন সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে গতিশীল, উন্নয়ন মুলক ও সমাজে যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্ষম হতে সহায়তা প্রদান ;

(খ) প্রজাতন্ত্রের এবং স্থানীয় সরকারের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের চাকরীকালীন প্রশাসন ও উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ;

(গ) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান ;

(ঘ) সরকারের ক্যাডার বর্হিভূত কর্মকর্তাদেরকে বুনিয়াদী এবং নবায়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ;

(ঙ) লোক প্রশাসন এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা ও ঘটনা সমীক্ষা পরিচালনা করা ;

(চ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারকে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ;

(ছ) প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, এবং

(জ) অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইত্যাদি।

১২. প্রশিক্ষণ কর্মসূচীঃ

কেন্দ্রে পরিচালিত কোর্স সমূহকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়ঃ—

(ক) কর্মজীবন উন্নয়ন মূলক কোর্স এবং

(খ) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক সংক্ষিপ্ত কোর্স।

কর্মজীবন উন্নয়ন কোর্সসমূহ দীর্ঘমেয়াদী। এর কলেবরও বিস্তৃত। তিন ধরনের কর্মজীবন উন্নয়ন মূলক কোর্স কেন্দ্রে পরিচালিত হয়, যথাঃ-

(১) **বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স**-বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সকল ক্যাডারের নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ কোর্স ;

(২) **উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স**-মধ্য সোপানের (সরকারের উপ-সচিব বা সম-পর্যায়ের) কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজ্য ;

(৩) **সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স**-নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের (সরকারের যুগ্মসচিব বা সম পর্যায়ের) কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য।

১২. বিবিধ প্রশিক্ষণ কোর্সঃ

এছাড়াও কেন্দ্রে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে আচরণ ও শৃংখলা কোর্স, আর্থবিধি ও পদ্ধতি কোর্স, মানবিক সম্পর্ক কোর্স, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে সহমর্মিতা ও সমন্বয় কোর্স, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স, কম্পিউটার ব্যবহার কোর্স, নবায়ন কোর্স এবং গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্সসহ বিভিন্ন ধরনের সংক্ষিপ্ত কোর্স অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

১৩. আঞ্চলিক কেন্দ্রে পরিচালিত কোর্স সমূহঃ

আঞ্চলিক কেন্দ্র সমূহে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য মৌল অফিস প্রশাসন, বাংলা মুদ্রাক্ষরে ভাষান্তর ও অফিস যন্ত্র সংরক্ষণ, অফিস তত্ত্বাবধান, আচরণ ও শৃংখলা, রাজস্ব প্রশাসন, তহশীলদার প্রশিক্ষণ, আর্থ

প্রশাসন, মানবিক সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য নবায়ন কোর্সসহ বিভিন্ন কোর্স পরিচালিত হয়।

১৪. সেমিনার / কর্মশালাঃ

প্রশিক্ষণ কোর্স ছাড়া কেন্দ্র নিজস্ব উদ্যোগে এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সহযোগিতায় জাতীয়/ আন্তজার্তিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের উপর সেমিনার, কর্মশালা, ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে। এ সমস্ত সেমিনার এবং কর্মশালা সমূহে মত বিনিময়ের সুযোগ এবং নতুন চিন্তা ভাবনার উপাদান থাকে।

১৫. গবেষণা ও ঘটনা সমীক্ষাঃ

কোর্স মডিউল সমূহ হালনাগাদকরন অনুষদ উন্নয়ন লোক প্রশাসনে সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন ও তার সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কেন্দ্র উন্নয়ন প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা প্রকল্প, ঘটনা সমীক্ষা ইত্যাদি পরিচালনা করে থাকে।

১৬. প্রকাশনা ঃ

কেন্দ্র চারটি সাময়িকী (দুইটি বাংলা ও দুইটি ইংরেজী), একটি পাক্ষিক মুখ পত্র (লোক প্রশাসন বার্তা), প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থাদি প্রকাশ করে থাকে।

১৭. গ্রন্থাগার ঃ

কেন্দ্রের গ্রন্থাগারটি আধুনিক পাঠ কক্ষ, পুনর্মুদ্রণ সরঞ্জামাদি, রেফারেন্স গ্রন্থ, সাময়িকী, জার্ণাল এবং সংবাদ পত্র সুবিধা সম্পন্ন। বর্তমানে গ্রন্থ সংগ্রহের সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। দেশী ও বিদেশী সাময়িকী সংগ্রহের সংখ্যা ৩৯৩। প্রশিক্ষণে সহায়তা দানের জন্য গ্রন্থাগারটি আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত।

১৮. কম্পিউটার কেন্দ্র ঃ

প্রশিক্ষণ, পুস্তক সংরক্ষণ, হিসাব ও নিরীক্ষা এবং ওয়ার্ড প্রসেসিং সুবিধা সম্পন্ন কম্পিউটার কেন্দ্রে আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক সমৃলিত ২০টি মাইক্রো কম্পিউটার আছে। ভবিষ্যতে কেন্দ্রে একটি মিনি কম্পিউটার সংস্থাপনের পরিকল্পনাও কেন্দ্রের রয়েছে।

১৯. ক্রীড়া ও শরীর চর্চাঃ

কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ফুটবল, টেনিস, বাস্কেটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি বহিরাঙ্গন ক্রীড়া ও শরীর চর্চা সুবিধা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার আন্তঃকক্ষ ক্রীড়ার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন প্রকার সেবা নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রে ব্যাংক, পোষ্ট অফিস রেঁস্তোরা সেলুন লন্ড্রী ইত্যাদির বন্দোবস্ত আছে।

২০. কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ ক্ষমতাঃ

ভৌত অবকাঠামো এবং বিদ্যমান সুযোগ সুবিধার বিচারে কেন্দ্র দেশের সর্ববৃহৎ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এতদসত্বেও আমরা বুনিয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা পুরণে সক্ষম হইনি। প্রতি বছর ৩০টি ক্যাডারের বিরাট সংখ্যক (প্রতি বছর ২০০০–২৫০০)কর্মকর্তা সিভিল সার্ভিসে যোগদান করছেন। কিন্তু আমাদের প্রশিক্ষণ ক্ষমতা সীমিত (বছরে দুই মাসের সংক্ষিপ্ত কোর্সে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ ১০০০)। ফলে বুনিয়াদী পর্যায়ে সৃষ্টি অপ্রশিক্ষণের জের (Back Log) হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধান কল্পে অচিরেই কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ ক্ষমতা দ্বিগুণ করা দরকার। কেন্দ্রের জন্য প্রণীত তৃতীয় পর্যায়ের প্রকল্প পরিকল্পনায় এ বিষয়ে ব্যবস্থা রাখা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সামান্য অতিরিক্ত ভৌত সুবধাদি সৃষ্টি করে কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ ক্ষমতা দ্বিগুণ করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভৌত সুবিধাদি

--মোহাম্মদ আলী

১. ৫৪.২৪ একর ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত পুষ্পশোভিত প্রাংগণ এবং সুদৃশ্য ভবন সম্বলিত বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, এদেশের শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

২ এই প্রতিষ্ঠানটির বিস্তৃত কর্ম-পরিধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে উঠেছে এর ভৌত অবকাঠামো।

৩. কেন্দ্রটিকে মোটামুটি দু'টি এলাকায় ভাগ করা চলে- প্রশাসনিক এলাকা ও আবাসিক এলাকা। প্রশাসনিক ভবন, দু'টি অনুষদ ভবন, সিণ্ডকেট ভবন, লেকচার থিয়েটার, গ্রন্থগার, সাধারণ সুবিধাদি ভবন, ক্যাফেটারিয়া, তিনটি ডরমিটরী, মসজিদ এবং মিলনায়তন সহ প্রশাসনিক এলাকায় মোট ১৪টি ভবন রয়েছে।

৪. কেন্দ্রের একটি প্রশাসনিক ভবন এবং দু'টি অনুষদ ভবনের পরিসর ৩৮,৯১৬ বর্গফুট। প্রশাসন অনুবিভাগ ও অর্থ অধিশাখার কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং অনুষদ সদস্যগণ উক্ত তিনটি ভবনে বসেন।

৫. লেকচার থিয়েটার ঃ কেন্দ্রে ৪৪৬৬ বর্গফুট পরিসর বিশিষ্ট একটি লেকচার থিয়েটার রয়েছে। লেকচার থিয়েটারটি মূলতঃ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের অধিবেশন কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৬. সিণ্ডিকেট ভবন ঃ কেন্দ্রের সিণ্ডিকেট ভবনের পরিসর ১৭,৮১৬ বর্গফুট। এতে চারটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষসহ মোট ১১টি ছোট ও মাঝারী কক্ষ রয়েছে।

৭. গ্রন্থগার ভবন ঃ কেন্দ্রে ৩৩,৭৫৩ বর্গফুট পরিসর বিশিষ্ট একটি আধুনিক গ্রন্থগার রয়েছে। এতে ৮০ হাজার পুস্তক সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি বড় আকারের কক্ষে ১০০ জন পাঠকের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া ডুপ্লিকেটিং ফটোকপিসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ সহায়ক কার্যক্রম এ ভবন থেকে পরিচালিত হয়। এ ভবনে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে।

৮. মসজিদ ঃ কেন্দ্রে ৬,৩৫০ বর্গফুট পরিসর বিশিষ্ট একটি সুরম্য সমজিদ রয়েছে। এখানে প্রায় ৭০০ জন নামাজি নামাজ আদায় করতে পারেন।

৯. মিলনায়তন ঃ কেন্দ্রে ১৭,৭০০ বর্গফুট পরিসর বিশিষ্ট একটি মিলনায়তন রয়েছে। বিভিন্ন কোর্সের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানসহ কেন্দ্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান এ ভবনে পরিচালনা করা হয়। এখানে সর্বাধিক ৭০০ জন দর্শক-শ্রোতা আসন গ্রহণ করতে পারেন।

১০. সাধারণ সুবিধাদি ভবনঃ কেন্দ্রে ৬,৯০০ বর্গফুট পরিসর বিশিষ্ট একটি সাধারণ সুবিধাদি ভবন রয়েছে। এতে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ব্যাংক, ডাকঘর, মনোহারী দোকান, কনফেকশনারী দোকান এবং লন্ড্রী রয়েছে।

১১. অতিথি ভবনঃ কেন্দ্রে আগত অতিথিবৃন্দের জন্য ১৫ জনের আবাসিক ও খাবার সুবিধা সম্বলিত একটি দ্বিতল অতিথি ভবন রয়েছে। এর পরিসর ৫,৪১৭ বর্গফুট।

১২. ক্যাফেটারিয়াঃ কেন্দ্রের ক্যাফেটারিয়ার পরিসর ১২,৭০৮ বর্গফুট,এর মূল আহার কক্ষে ২৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে আহার গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়াও এখানে

মধ্যসোপানের কর্মকর্তাদের জন্য আরেকটি মাঝারী আকারের নিবাহী ভোজন কক্ষ আছে। এতে ৯০ জন কর্মকর্তা একত্রে আহার গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আহার এবং নাশতার সুবিধার জন্য এখানে একটি ক্যান্টিন চালুকরা হয়েছে।

১৩. চিকিৎসা কেন্দ্র ঃ কেন্দ্রে ২,৭৫০ বর্গফুট আয়তনের একটি চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। একজন অভিজ্ঞ এম,বি,বি,এস, ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা কেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছে। এখানে সাধারণ রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। রাত ১০টা পর্যন্ত চিকিৎসা কেন্দ্রটি খোলা থাকে।

১৪. ডরমিটারীঃ প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য তিনটি ডরমিটরী রয়েছে। ১নং ডরমিটরী আয়তন ৩৮,৪০০বর্গফুট। এর ১০০ টি দ্বিশয্যা বিশিষ্ট কক্ষে মোট ১৬৮ সীট আছে। এটি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বরাদ্দ হয়ে থাকে, এছাড়াও এই ডরমিটরীর প্রতি তলায় ২টি করে মোট ৮টি শয্যা বিশিষ্ট কক্ষ আছে।

২নং ডরমিটরীর পরিসর ২১,২৫২বর্গফুট। কক্ষ সংখ্যা ৯০টি। তন্মধ্যে একক শয্যা বিশিষ্ট কক্ষ সংখ্যা ৮৪টি। এছাড়া প্রতি তলায় একটি করে টি ভি কক্ষ আছে। এ ডরমিটারীতে প্রশিক্ষণে আগত উপ-সচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অবস্থান করেন। ৩নং ডরমিটরীর পরিসর ১৭,২৮০ বর্গফুট। এতে মোট ৫১ টি কক্ষ রয়েছে। এখানে এক শয্যা বিশিষ্ট কক্ষের সংখ্যা ৪০ টি। সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ এই ডরমিটরীতে অবস্থান করেন। অংশগ্রহণকারীদের ব্যবহারের জন্য এই ডরমিটরীতে একটি ছোট্ট ভোজন কক্ষ এবং একটি বিনোদন কক্ষ রয়েছে।

১৫. খেলাধুলা ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের খেলাধুলার জন্য কেন্দ্রে একটি ফুটবল মাঠ, একটি বাস্কেট বল মাঠ, তিনটি ভলিবল মাঠ, একটি টেনিস অনুশীলন দেয়াল, একটি হ্যান্ডবল ও তিনটি লন টেনিস মাঠ রয়েছে।

১৬. আবাসন ঃ কেন্দ্রের আবাসিক এলাকায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ২৪৭টি ফ্লাট নির্মিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'এ' শ্রেণীতে ১টি, বি-১ শ্রেণীতে ৫টি, বি-২ শ্রেণীতে ৭টি,

'সি' শ্রেণীতে ২৪টি, 'ডি' শ্রেণীতে ৪৮টি, 'ই'শ্রেণীতে ৭২টি এবং 'এফ' শ্রেণীতে ৯০টি ফ্লাট রয়েছে। আবাসিক চত্বরে কেন্দ্রের ৫৭ভাগ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আবাসন সুবিধা প্রদান সম্ভব।

১৭. বিদ্যালয় ঃ কেন্দ্রের আবসিক এলাকায় নির্মিত হয়েছে প্রায় ৮,৫৮০ বর্গফুট আয়তনের বিদ্যালয় ভবন। এখানে শিশু শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছ। মূলতঃ কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পোষ্যদের জন্য বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৮. শপিং সেন্টার ঃ কেন্দ্রের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং প্রশিক্ষণার্থীদের নিত্যদিনের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়ের সুবিধার্থে আবাসিক এলাকায় প্রায় ৩,১০০ বর্গফুট পরিসর বিশিষ্ট একটি শপিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এতে মোট ১৪ টি দোকান রয়েছে।

১৯. ক্লাব ঃ কেন্দ্রে প্রায় ১,৭৫৪ বর্গফুট পরিসর বিশিষ্ট একটি ক্লাব আছে। কেন্দ্রের কর্মকর্তা এবং তাঁদের পোষ্যদের বিনোদন ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ক্লাবটিকে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কর্মচারীদের জন্যও অনুরূপ একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আপাততঃ শপিং সেন্টারে দু'টো কক্ষ কর্মচারীদের ক্লাব হিসেবে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০. অভ্যর্থনা কক্ষ ঃ কেন্দ্রের প্রশাসনিক এলাকায় একটি সুসজ্জিত অভ্যর্থনা কক্ষ রয়েছে। এখানে টেলিফোন সুবিধা আছে। এছাড়া কেন্দ্রে আগমনকারী পরিদর্শক, প্রশিক্ষণার্থী এবং অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানো এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

২১. অন্যান্য ঃ কেন্দ্রে প্রায় ২৩,০০০ বর্গফুট আচ্ছাদিত বারান্দা রয়েছে। এর দ্বারা প্রশাসনিক এলাকার মোট ১৫টি ভবনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে রোদ এবং বৃষ্টির সময়ও কেন্দ্রের কর্মচাঞ্চল্য ব্যাহত হয় না। এছাড়া কেন্দ্রে গাড়ী রাখার জন্য দুটো গ্যারেজ, ১টি পার্কিং শেড, পানি সরবরাহের জন্য দু'টো পাম্প হাউজ এবং [illegible] সরবরাহের জন্য একটি পাওয়ার হাউজ রয়েছে এবং বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার গাছ, ফুলের টব ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য একটি গ্রীণহাউজ নির্মাণাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে উন্নয়ন অর্থনীতির উপকরণঃ দেশজ প্রেক্ষিত

—ডঃ মোহাম্মদ তারেক

১.১. বাংলাদেশে আমাদের জাতীয় কর্মকাণ্ড এ দেশের আর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত, উৎসারিত এবং নিয়োজিত। সাংবিধানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রের কার্যক্রমে নিযুক্ত প্রতিটি কর্মকর্তা/কর্মচারী রাষ্ট্র যন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে জাতীয় প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর সাথে সাথে সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। চুক্তি–আবদ্ধ অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন করতে জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন করতে এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করতে (সংবিধান,ধারা, ১৪–২৪) তাই আজ আমাদের দেশের প্রশাসনে যাঁরা কাজ করছেন এবং করবেন, তাঁদের ভূমিকা হবেঃ—

ক. দেশের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সহায়তা করা ;

খ. সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপনায় পারদর্শিতা অর্জন করা ; এবং

গ. প্রবৃদ্ধিকে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর কাজে পৌঁছে দেবার দক্ষ বাহন হিসাবে কাজ করা।

১.২. সাংবিধানিক ভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার স্বার্থে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের প্রশাসনকে উন্নয়নমুখী ও জনকল্যানমুখী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় স্বাধীনতা লাভের পরপর এবং তা সরকারী পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করে। এ অনুভব আর স্বীকৃতি খেকেই ১৯৮৪ সালে জন্ম নেয় বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় প্রশিক্ষণ পরিষদ (ন্যাশনাল ট্রেণিং কাউন্সিল, ১৯৮১) এবং তৈরী হয় সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ নীতিমালা (১৯৮৫ সালে)। এ নীতিমালার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয় ঃ বাংলাদেশের প্রশিক্ষণকে এমনভাবে উন্নত করা যাতে আর্থনীতিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণ একটি প্রধান উপকরণ হয়ে ওঠে (প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুচ্ছেদ—৭)।

১.৩. বাংলাদেশে লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণকে আর্থনীতিক উন্নয়নের একটি প্রধান প্রকরণ হিসেবে চিহ্নিত করা এবং প্রশিক্ষণকে সে লক্ষ্যে কার্যকরী করার পদক্ষেপসমূহের

প্রয়োজনীয়তা ও সাফল্য অনেকটা নিহিত আমাদের লোক প্রশাসনের ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে।

২. বাংলাদেশ লোক প্রশাসনের ঐতিহাসিক চরিত্র ঃ

২.১. আমরা যে ঔপনিবেশিক প্রশাসন উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করছি, তার লক্ষ্য ছিলো ত্রিবিধ ঃ

ক. আইন শৃংখলা বিধান করা ;

খ. রাজস্ব আদায় করা; এবং

গ. সম্পদ পাচার করে কেন্দ্রের উন্নয়ন সাধন করা।

বৃটিশ ও পাকিস্তানের শাসনকালে দেখেছি, প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করা হয়েছে দেশ থেকে সম্পদ হস্তান্তরের লক্ষ্যে। প্রথম লক্ষ্যটি নিশ্চিত করা হয়েছে যাতে অন্য লক্ষ্য দু'টোকে সহজেই পূরণ করা সম্ভব হয়।

২.২ একটি ঔপনিবেশিক সরকারও একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক উন্নয়নমুখী সরকারের প্রশাসনিক চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঔপনিবেশিক প্রশাসন নির্ভর করে ঋণাত্মক নিরীক্ষা ও পাল্টা নিরীক্ষা নীতির ওপর। আর উন্নয়নমুখী প্রশাসন নির্ভর করে ধণাত্মক নেতৃত্ব, ইতিবাচক ও বলিষ্ঠ কার্যক্রমের ওপর। ঔপনিবেশিক প্রশাসন কেন্দ্রানুগ, বহু-স্তর ভিত্তিক, স্থবির ও গণবিচ্ছিন্ন। উন্নয়নমুখী প্রশাসন গতিশীল, কেন্দ্রাতিক, কার্যক্রমাভিমুখী ও জনগণ নির্ভর।

৩. বাংলাদেশে লোক প্রশাসনের আদর্শিক রূপ ঃ প্রশিক্ষণের ভূমিকা

৩.১. দীর্ঘকাল ধরে শোষিত একটা সমাজ ব্যবস্থা শুধু যে আর্থনীতিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে তা নয়। সাথে এসব সমাজ ব্যবস্থা চিন্তা-চেতনায়, মননে ও মূল্যবোধে, আচার ও আচরণে পরজীবী হয়ে পড়ে। এ কারণেই স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচী ও বিষয়বস্তু নির্ধারিত হতে দেখি পাশ্চাত্য দেশের অনুসরণে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রশাসনকে শুধু উন্নয়নমুখী হলে চলবে না, সাথে হতে হবে দেশজ চিন্তা- চেতনার ধারক ও বাহক। আমাদের প্রশাসনকে জন্ম দিতে হবে গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর ও নেতৃত্বের। সত্তর দশকের শেষের দিকে অধুনালুপ্ত অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী ও জাতীয় লোক প্রশাসন প্রতিষ্ঠানে

এ উদ্দেশ্যে কিছু কার্যক্রম হাতে নিতে শুরু করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সে ধারাকে নতুনভাবে প্রবাহমান করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

৩.২ গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত একজন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে হতে হবে উৎপাদনমুখী ও সেবামুখী (ধারা ২১(২), সংবিধান)। এ লক্ষ্যে যেমন প্রশাসনে ইতোমধ্যে নিয়োজিত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে, তেমনি ভাবে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে নবীন কর্মকর্তা/কর্মচারীর, যিনি নতুন যোগ দিচ্ছেন প্রশাসনে। যদিও, এটা অনস্বীকার্য যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা ভিন্ন হতে বাধ্য।

৩.৩. কেন্দ্রের কাঠামো, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও প্রশাসনিক উন্নয়নকে কেন্দ্রের অধ্যাদেশে যেভাবে প্রত্যায়িত করা হয়েছে, তা নিম্নের মডেলে দেখানো হোল ঃ-

কেন্দ্রের কাঠামো, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক উন্নয়নের সংযোগ মডেল

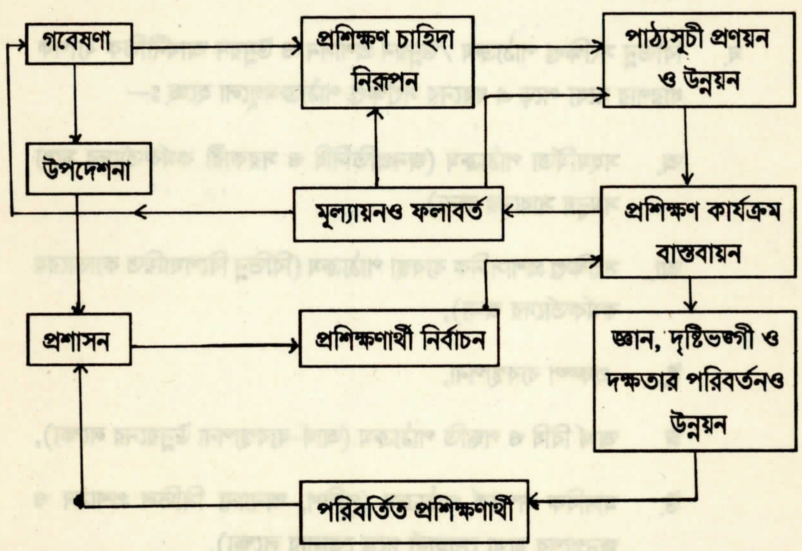

প্রশাসনিক উন্নয়ন (উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের লোক প্রশাসনকে দক্ষ করে তোলা) এবং সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের উন্নয়ন- এ দু'টি কার্যক্রমই ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই ধারাবাহিকতা উপরোক্ত মডেলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান। তবে, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শুধুমাত্র উন্নত প্রশিক্ষণই প্রশাসনিক অক্ষমতা কমাবে না যদি না প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন ও তাঁদের যথাযথ ব্যবহার করায় দুরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়।

৪. বিভিন্ন প্রশিক্ষণে উন্নয়ন অর্থনীতি ও উন্নয়ন প্রশাসন

৪.১. বাংলাদেশের প্রশাসনকে জনকল্যানমুখী ও উৎপাদনমুখী করার ব্রতেই এ কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্ভাবিত ও পরিচালিত। কেন্দ্র যে সমস্ত প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, সেগুলোকে মোটামুটিভাবে চারভাগে ভাগ করা যায় ঃ–

ক. বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে যোগদানকারী নবীন কর্মকর্তাদের জন্য)।

খ. উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন পাঠ্যক্রম (উপ–সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য)।

গ. উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পাঠ্যক্রম (যুগ্ম–সচিব ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য)। এবং

ঘ. বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রম /উন্নয়ন প্রশাসন ও উন্নয়ন আর্থনীতিক ব্যাপক ধারণার মধ্যে পড়ে এ ধরনের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রমগুলো হচ্ছে ঃ—

অ. সহমর্মিতা পাঠ্যক্রম (জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য),

আ. সংক্ষিপ্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা পাঠ্যক্রম (বিভিন্ন বিশেষায়িত ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য),

ই. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা,

ঈ. আর্থ বিধি ও পদ্ধতি পাঠ্যক্রম (আর্থ–ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে),

উ. মানবিক সম্পর্ক পাঠ্যক্রম (পুলিশ, অন্যান্য সিভিল প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সোহার্দ্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে),

ঊ. কম্পিউটার পরিচিতি পাঠ্যক্রম, ও

ঋ. গবেষণা পদ্ধতি।

৪.২ প্রধান তিনটি পাঠ্যক্রম (ক, খ ও গ) এবং অধিকাংশ সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রমের পাঠ্যসূচী এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মূল্যায়নলব্ধ জ্ঞান পরিশীলিত করা হচ্ছে, যাতে আমাদের প্রশাসনকে সত্যিকার অর্থে উন্নয়ন প্রশাসনে রূপান্তর করা যায়। আর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য কোন সহজ অনুকরণীয় মডেল আমাদের মত দেশের সামনে নেই। উন্নয়নের মাল-মসলা, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধের মাঝ থেকে আহরণ করতে হবে। কেন্দ্রে প্রশাসনের এ উত্তরণ প্রক্রিয়াকে যেভাবে প্রত্যায়িত করা হয়েছে, তা সংক্ষেপে নীচের প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো সম্ভবঃ—

উন্নয়ন উপকরণ ও প্রশাসনের দেশজায়ন

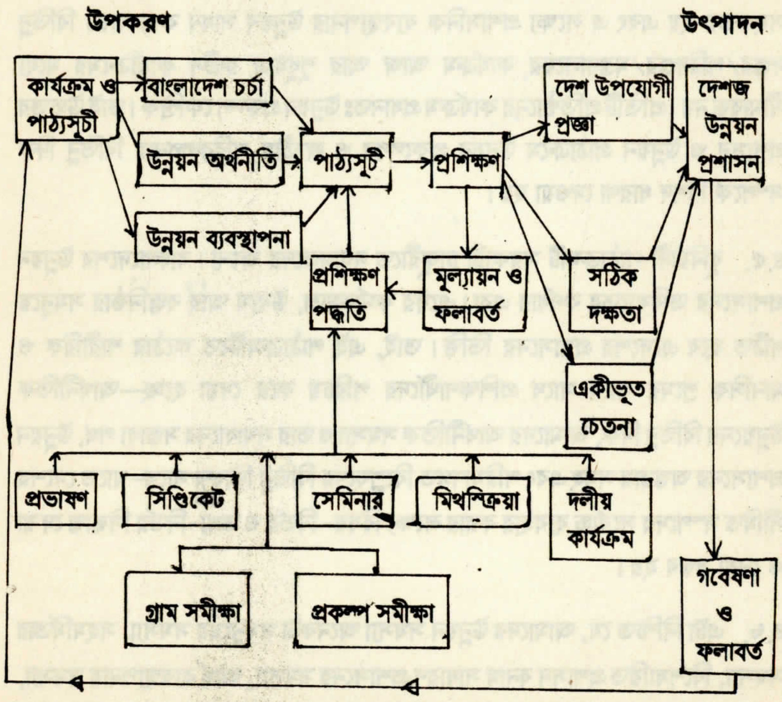

৪.৩. উর্ধতন পাঠ্যক্রম, উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন পাঠ্যক্রম এবং বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের পাঠ্যসূচীকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক. বাংলাদেশ চর্চা, খ. উন্নয়ন অর্থনীতি, ও গ. উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

কিন্তু, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা বিভিন্ন হওয়ায় প্রতিটি পাঠ্যক্রমের পাঠ্যসূচীর জোর ভিন্ন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পাঠ্যক্রমে জোর দেয়া হয়েছে নীতি বিশ্লেষণে ও নীতি প্রণয়নে। সমকালীন নীতি নির্ধারণের বিতর্কিত ইস্যু নিয়ে প্রায় প্রতিটি পাঠ্যক্রমের ফোকাস পরিবর্তন করা হয়। যদিও পাঠ্যক্রমের কোর্স মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত থাকে। গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে কোর্সকে পরিশোধিত ও পরিমার্জিত করা হয় মাত্র।

৪.৪. উচ্চতর প্রশাসনও উন্নয়ন পাঠ্যক্রমের পাঠ্যসূচীতে জোর দেয়া হয়েছে উন্নয়ন অর্থনীতি ও উন্নয়ন প্রশাসনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকে–যাতে করে উন্নয়ন সমস্যাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যায়, এ সব সমস্যাকে দূরীভূত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া সহজতর হয় এবং এ লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন করা যায়। বিভিন্ন দপ্তর/পরিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আজ আর শুধুমাত্র রুটিন কার্য্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম প্রধানতঃ উন্নয়ন প্রকল্প কেন্দ্রিক। তাই উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন প্রাঠ্যক্রমে উন্নয়ন প্রকল্পের ও জাতীয় পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশদ ধারণা দেওয়া হয়।

৪.৫. বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমটি সরকারী চাকুরীতে নবাগতদের জন্যে। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রশাসনের ভবিষ্যতের কর্ণধার এরা। এদেঁর কর্মক্ষমতা, উদ্যম আর বস্তুনিষ্ঠার সমন্বয়ে গঠিত হবে এদেশের প্রশাসনের ভিত্তি। তাই, এই পাঠ্যক্রমটিতে কঠোর শারীরিক ও মানসিক শ্রমের সাথে সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচয় করে দেয়া হচ্ছে—আর্থনীতিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক, আমাদের আর্থনীতিক সমস্যা ও তার সমাধানের সম্ভাব্য পথ, উন্নয়ন প্রশাসনের অন্তরায় সমূহ এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণের বিভিন্ন দিকের সাথে– যাতে দেশের সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করার লক্ষ্যে বিষয়– নির্ভর ও তথ্য–নির্ভর সিদ্ধান্ত দেয়া ও নেয়া সম্ভব হয়।

৪.৬. এটা নিশ্চিত যে, আমাদের উন্নয়ন সমস্যা অনেকটা সমন্বয়ের সমস্যা, সহমর্মিতার সমস্যা, বিশেষায়িত প্রশাসন বনাম সাধারণ প্রশাসনের সমস্যা, আর্থ ব্যবস্থাপনায় সমস্যা, মানবিক দৃষ্টিকোন উন্নয়নের সমস্যা, সঠিক প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সমস্যা। এ বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রেখে প্রায় প্রতিটি বিষয়ের ওপর সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রমের আয়োজন করা হয় মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

৪.৭. সনাতন প্রশাসনে সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম নেয়া হয় বিশ্বাস অথবা ধারণা থেকে, গবেষণালব্ধ তথ্য বা অভিজ্ঞতা থেকে নয়। উন্নয়ন প্রশাসনে, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য, সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম হওয়া প্রয়োজন বাস্তব-নির্ভর, তথ্যভিত্তিক। এ লক্ষ্যে আয়োজন করা হয় গবেষণা পদ্ধতি পাঠ্যক্রমের।

৪.৮. বর্তমান বিশ্বের উন্নয়নকে বলা হয়ে থাকে প্রযুক্তির উন্নয়ন। তাই উন্নয়নের ধারা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সঠিক মানব-শক্তির পরই প্রয়োজন প্রযুক্তির। আধুনিক প্রযুক্তিতে কম্পিউটারের অবদান অনস্বীকার্য। তাই কেন্দ্র আয়োজন করছে কম্পিউটার পাঠ্যক্রমের।

৫. উপসংহার :

জাতীয় উন্নয়ন ধারার সাথে খাপ খাইয়ে এবং প্রশিক্ষণ চাহিদা অনুযায়ী কেন্দ্রের প্রায় প্রতিটি পাঠ্যক্রমের পাঠ্যসূচীতে উন্নয়ন অর্থনীতি ও উন্নয়ন প্রশাসনের উপকরণ সংযোজিত করা হয়েছে। কেন্দ্র গবেষণা ও প্রশিক্ষণ-মূল্যায়নের মাধ্যমে এই উপকরণ সমূহের পরিশীলন আর পরিমার্জনে বিশ্বাসী। কারণ পরিবর্তন আনে গতি। আর গতি আনে উন্নয়ন। তবে,স্মরণ রাখা প্রয়োজন প্রশিক্ষণ হচ্ছে বাহন, গন্তব্য নয়। প্রশিক্ষণ শুধুমাত্র তখনই অনড় অকেজো প্রশাসনকে সচল ও উৎপাদনশীল করতে পারে, যখন প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষণার্থীদেকে বেড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া হবে প্রশাসনের সাংগঠনিক উন্নয়নের মাধ্যমে।

কেন্দ্র দেশের লোক প্রশাসনকে উন্নয়নমুখী করার জন্য যা করেছে তা নিয়ে পরিতৃপ্ত হবার সুযোগ নেই। কারণ, উন্নয়ন একটা অব্যাহত ধারা। আমরা এ ধারার সূচনা করেছি মাত্র। কেন্দ্রের আত্ম-বিশ্লেষণ, আত্মানুসন্ধান চলবে, চলবে আত্ম-সমীক্ষা।

তথ্য-পুঞ্জিকা

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭২, বাংলাদেশের সংবিধান।

২। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫, জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অর্ডিন্যান্স নং xxiv, এপ্রিল ১৯৮৪, ঢাকা।

৪। Shams, M, Khalid , 1978 , Public Administration Training in Bangladesh : Need for a Functional Approach, in COTA bulletin, Vol. 1.

৫। Chawdhury, Lutful Haque, 1978. Social change and Development Administration in South Asia, Published by: Nationaal Institute of Public Adiminidtration, Dhaka,

৬। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, বিভিন্ন পাঠ্যক্রম, সাভার, ঢাকা।

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ চর্চাঃ একটি সমীক্ষা

-ডঃ এম, এ, জলীল

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সকল ক্যাডারে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রশাসন ও উন্নয়ন সম্পর্কে একটি মৌল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী। সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ প্রদান একটি ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থা। অবশ্য, এক সময় সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভূক্ত কর্মকর্তাগণের সংখ্যা ছিল নগণ্য; —সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ, বিচার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে মাত্র এর অন্তর্ভূক্ত করা হোত।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর এ অঞ্চলের প্রতিটি দেশেই সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ বৃটেনের পরিবর্তে স্ব-স্ব দেশে আয়োজন করা হয়। পাকিস্তান আমলে সিভিল সার্ভিসে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহ অধিকাংশই তদানিন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল।

স্বাধীনতা উত্তর কালে বাংলাদেশে সকল ধরণের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন মেটাতে বহু প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য গড়ে উঠেছিল সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী। আশির দশকের শুরুতে সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়-বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক সিভিল সার্ভিসকে ক্যাডারের আওতায় আনা হয়; ৩০টি ক্যাডার সৃষ্টি হয় এবং সকল ক্যাডার সার্ভিসের সদস্যের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়।

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচী সর্বজনীন চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তৈরী করা হয়। দীর্ঘ কর্মজীবন শুরু করার আগে যেসব সাধারণ এবং মৌলিক বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন শুধুমাত্র সে সমস্ত বিষয় বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশেষ কোন কারিগরী বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য নয়। উল্লেখ্য যে, কোন বিশেষ ক্যাডার বা বৃত্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিটি ক্যাডারের নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারে পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিত্বের সার্বিক সৃজনশীল বিকাশ ও একটি উন্নয়নশীল দেশের গতিশীল নেতৃত্বের উপযোগী দক্ষতা ও মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়তা করাই এ প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য। শিক্ষা নবীশ কর্মকর্তাদের জন্য এই পাঠ্যক্রম বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতিতে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবনের রূঢ় বাস্তবতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে, তাঁদের সামনে তুলে ধরবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমস্যা ও সম্ভাবনা, প্রতিবন্ধকতার পথ নির্দেশনা।

বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত তিনটি অবয়বের একটি হ'ল বাংলাদেশ চর্চা। অন্য দু'টি হ'ল লোক প্রশাসন ও উন্নয়ন অর্থনীতি। উল্লেখ্য যে, পাঠ্যক্রমের বিষয়সমূহ সরকারী কর্মকমিশন, জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, উর্ধতন কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই ধরনের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, আওতা, অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন এতে লক্ষ্য করা যায় এবং এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের বুনিয়াদ হোল বাংলাদেশ চর্চা। যেহেতু নবনিযুক্ত কর্মকর্তাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা পড়া করে এসেছেন, তাদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে সমধর্মী চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটাতে দেশের পরিস্থিতি, পরিবেশ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত করাই বাংলাদেশ চর্চার উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধি, ১৯৮১ অনুসারে বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য ৪ (চার) মাস ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশ চর্চার উপ-অবয়বগুলোর শিরোণাম ছিল নিম্নরূপ ঃ—

(ক) ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার
(খ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

(গ) বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন

(ঘ) সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ এবং

(ঙ) বাংলাদেশ ও বিশ্ব

প্রত্যেকটি উপ-অবয়বে ১০টি বিষয় স্থান পেত। সীমিত সময়ের মধ্যে এই ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বাংলাদেশের পরিচয় তুলে ধরা হোত, কেননা উন্নয়ন প্রশাসনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার সফল বাস্তবায়ন একদিকে যেমন নিয়ম ও পদ্ধতিকে আশ্রয় করে এগিয়ে নিতে হয়, অন্যদিকে কঠোর বাস্তব আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত অনুধাবন, জনগণের আশা আকাংখার সংগে সুবিনিড় উপলব্ধি এর পূর্বশর্ত। দেশে উন্নয়ন প্রশাসনের গতিশীলতা বৃদ্ধি কেবলমাত্র সম্পদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে না, সামাজিক চাহিদাকে সামনে রেখে উপযুক্ত নীতির আশ্রয়েই তা বাস্তাবায়িত হয়। এজন্য প্রশিক্ষণার্থীদের (যাঁদের অধিকাংশই মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত) প্রয়োজন বাস্তবমুখী ও প্রায়োগিক জ্ঞান, গভীর উপলব্ধি এবং দেশাত্মবোধ অর্জন, দেশের মাটি আর মানুষের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন। একই সংগে চলমান বিশ্ব সম্পর্কেও জ্ঞান আবশ্যক। সামগ্রিক এই ধারণা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য হবে 'বিশ্বরূপ' দর্শনের তুল্য।

প্রশিক্ষণার্থীদের মন মানসিকতা পরিবর্তন করে সুশীল সেবকের উপযোগী করে গড়ে তুলতে দীর্ঘকালীন এবং নিবিড় তত্ত্বাবধায়ক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। কিন্তু ১৯৮৪ সালের পর সিভিল সার্ভিসে অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ এবং সকল পেশা ভিত্তিক সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ আবশ্যকীয় ঘোষণায় অপ্রশিক্ষণের এক বিরাট জের সৃষ্টি হয়। এই জের মিটাবার জন্যে একদিকে প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমিয়ে মধ্য ১৯৮৮ থেকে বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয় প্রায় অর্ধেকে কমিয়ে আনতে হয়েছে। বাংলাদেশ চর্চা উপ-অবয়বের আকার ৬ থেকে ৩ এ আনা হয়েছে। এ তিনটি উপ-অবয়ব হোল ঃ—

(ক) বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ

(খ) বাংলাদেশের সম্পদ সমূহ এবং

(গ) উন্নয়ন প্রশাসন, বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় শাসন

অনেক বিজ্ঞজনের মতে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ বর্তমান দৃষ্টে একটি অনুষ্ঠান সর্বস্ব বা রেওয়াজ পালন মাত্র। কারো অভিব্যক্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে যেন ছাপ মেরে ছেড়ে

দেওয়া হচ্ছে। তাদের মূল বক্তব্য—এই স্বল্প সময়ে মন-মানসিকতার পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় অনুশীলনে বাধ্যবাধকতা ছাড়া উত্তরণ সম্ভব নয়।

উপসংহারে এ কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রশিক্ষণের ভূমিকা কারো কারো মতে প্রান্তিক। অবশ্য বর্তমান দুনিয়ায় মানব সম্পদের গুরুত্ব যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার আংগিক দেখলে প্রশিক্ষণের ভূমিকা ব্যাপক ও গভীরতর। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আয়োজিত উর্ধতন স্তরের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন বিতর্কিত, প্রান্তিক, নূন্যতম যাই বলা হোক না কেন, বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন প্রশ্নাতীত—বিস্তৃত ভাবে তা অনেকের মতেই প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়জনিত অবস্থায়, নিবিড়, কঠোর এবং দৃশ্যমান হওয়া আবশ্যক। আমাদের সম্পদ, আমাদের মাটি, মানুষ তথা দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিয়েই। বাংলাদেশের সমস্যা, সম্ভাবনা যত গভীরভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারব, প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারব, একনিষ্ঠভাবে তার বাস্তব রূপ দিতে পারব ততই দেশের অবস্থার উন্নতি সাধিত হবে। এজন্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা নয়—বড় বিঘ্ন যোগ্য কর্মী, জাতীয় ব্যবস্থাপক আর নিবেদিতপ্রাণ নেতার সংকট। আমরা বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ যদি সঠিক মেয়াদে উপযুক্ত পরিবেশে, কঠোর ভাবে দিতে পারি তবে জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ দিকে প্রয়োজনীয় জনসম্পদ সৃষ্টি করবে, উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিপিএটিসির প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচীঃ 'ব্যবস্থাপনা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ'

--মোঃ সিরাজুল ইসলাম

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য সুশীল সেবকদের (Civil Servant) প্রশিক্ষণের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিবেচনা করা সমীচীন। কেন এবং কি ভাবে এই প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হ'ল এর গোড়া পত্তন কোথায় ইত্যাদি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া বাঞ্চণীয়। তাহলে বর্তমান পাঠ্যসূচী সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

১. ঐতিহাসিক পটভূমিঃ

১৯৬৫ সালে মোগল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভের ফলে তাদের কর্মপরিধি ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যিক (Commmercial) দায়িত্ব ছাড়াও কর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায়। কর সংগ্রহে যাতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সে জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে আইন শৃংখলা বাহিনী গঠন করতে হয়। কর সংগ্রহে প্রয়োজনবোধে এ বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণ করা হত। ফলে কর ব্যবস্থাপনার সাথে আইন শৃংখলা সংরক্ষণ কার্যক্রমও তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়। ফলশ্রুতিতে প্রশাসন ব্যবস্থা ব্যাপক ও জটীল আকার ধারণ করে। সুষ্ঠভাবে এ আইন মোকাবেলার জন্য ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস (Warreen Hostings) সুশীল প্রশাসনকে পূণর্বিন্যাস করেন। তিনি সুশীল প্রশাসনকে দু টি ভাগে বিভক্ত করেনঃ—

১. বাণিজ্যিক (Commercial) এবং ২. সাধারণ প্রশাসন (General Administration)।

গ্লাডেনের (Gladden) এর মতে "He (Warren Hastings) reorganised the revenue administration, remodelled the judicial system and freed trade from its existing abuses"[১]

পরবর্তী পর্যায়ে লর্ড কর্ণওয়ালিশ (Lord Cornwallis) রাজস্ব প্রশাসনকে ঢেলে সাজান এবং ১৭৯৩ সালে "Permanent settlement" ব্যবস্থা চালু করেন। এ ব্যবস্থার ফলে সুশীল প্রশাসনকে আরো সুসংহত করার প্রয়োজন পড়ে। ও, মালের (O,Malley) মতে সুশীল প্রশাসনের অবকাঠামো নির্মাণে Warren Hastings এবং কর্ণওয়ালিশ দুজনেরই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি বলেন "The former laid the foundations on which the latter built up a superstructure"[2].

ক্রমবর্ধমান প্রশাসনিক কাঠামোর সংস্কার ও পুনঃসংস্কার, কর্ম পরিধির জটিলতা ও ব্যাপকতা, পরিবর্তনশীল সামাজিক ব্যবস্থার ফলে মেধাভিত্তিক নিয়োগ পদ্ধতি ও নিয়োগোত্তর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৮৫৩ সালের Government of India Act, এ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই আইনের সূত্র ধরে লর্ড মেকুলেকে (Lord Macaulay) চেয়ারম্যান করে

একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ১৮৫৪ সালে প্রতিবেদন পেশ করেন। উক্ত প্রতিবেদনে সুশীল সেবকদের বিশেষায়িত জ্ঞানের পরিবর্তে সাধারণ জ্ঞানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাঁরা মনে করেন সুশীল সেবকদের High powers of mind[৩] থাকা প্রয়োজন এবং সেজন্যে তারাঁ সুশীল সেবকদের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক (তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ বৃটেনে এবং প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ ভারতবর্ষে) উভয় প্রকার প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাত্ত্বিক বিষয়াবলীর মধ্যে 'History, Jurisprudence, commercial and financial science and oriental languages" অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কিন্তু এই যোগ্যতা "The best, the most liberal and the most finished education" দ্বারা অর্জন করা সম্ভব হবে না। লর্ড মেকুলের দর্শন অনুসারেই মূলতঃ নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার গোরাপত্তন শুরু হয়। এর সূত্র ধরে ১৮০০ সালে প্রথম কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামস কলেজ (Fort williams college) স্থাপিত হয়। ঐ কলেজের উদ্দেশ্য ছিল—"To provide liberal as well as specialized education and training for the recruits to covenanted civil service. The syllabus comprised the humanities, sciences and some of the native languages"।

১৮০৬ সালে রাইটারদের প্রশিক্ষণের জন্য ইংল্যাণ্ডের হেইলেবারী কলেজ (The Haileybary College) প্রতিষ্ঠিত হয়। চাকুরী স্থায়ী করণের জন্য উক্ত কলেজে দু'বছর প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল। পাঠ্যসূচীতে "European classical languages, mathematics, law, political economy, general history, and oriental languages" অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুশ বছর আগে বৃটিশ শাসক কর্তৃক ভারতবর্ষে স্থাপিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর অনুসৃত হয়। ডঃ আকবর আলী খান তাঁর Post-entry training in Bangladesh civil Service: The Challange and Response" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন "The celebrated ENA(Ecole National -d'Administration) in France was set up in 1945; the Academy for Public administration (at speyer) in Germany in 1947; the Civil Service college in 1970; the spanish civil service Training Centre in 1957"[৪]

২. বাংলাদেশ প্রেক্ষিতেঃ

প্রশিক্ষণে এ উপমহাদেশের ঐতিহ্য থাকলেও বাংলাদেশ তৎকালীন পাকিস্তানী আমলে রাজনৈতিক প্রবঞ্চনার ফলে প্রশিক্ষণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়নি। ষাটের দশকের প্রথম দিকে সীমাবদ্ধ পরিসরে কয়েকটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নব্য প্রশাসনকে সঠিকভাবে পরিচালনার নিমিত্তে কার্যকর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্ম হয়। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী ও স্ব-শাসিত সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষেই মূলতঃ এই কেন্দ্রের উদ্ভব। সঙ্গত কারণেই কেন্দ্রের সকল প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে লোক প্রশাসন বিষয়টি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। ক্রমবর্ধমান প্রশাসনিক জটিলতা, পরিবর্তনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও কৌশলের ভিন্নতা দক্ষ ও কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য লোক প্রশাসনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন প্রত্যেক কর্মকর্তার জন্য অপরিহার্য। যে জন্য কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত সকল পাঠ্যক্রমসমূহে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা, তাঁদের পর্যায় এবং পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সঙ্গতি রেখে লোক প্রশাসন বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান স্বয়ংসম্পূর্ণ উপ-অবয়বসমূহ সন্নিবেশ করা হয়েছেঃ—

১। ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ২। উন্নয়ন প্রশাসন ৩। সংগঠন তত্ত্ব
৪। সরকারী পদ্ধতি ৫। সচিবালয় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ৬। কর্মী ব্যবস্থাপনা
৭। আর্থ ব্যবস্থাপনা ৮। সংগঠন উন্নয়ন ৯।অফিস ব্যবস্থাপনা
১০।প্রশাসনিক যোগাযোগ এবং ১১। বাংলাদেশ উন্নয়ন প্রশাসনঃ কতিপয় উদাহরণ বিশ্লেষণ।

ওপরোক্ত উপ-অবয়ব ছাড়াও কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বিশেষ কোর্স সমূহে লোক প্রশাসন বিষয়ে বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালিত হয়ে থাকে।

৩. উপ-অবয়ব ঃ ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণঃ

এই প্রবন্ধে লোক প্রশাসন বিষয়ে শুধুমাত্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপ-অবয়ব 'ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ' সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এ উপ-অবয়বটি মধ্যসোপানের কর্মকর্তাদের (উপ-সচিব ও সমপর্যায়ের) জন্য প্রণীত 'উচ্চতর উন্নয়ন ও প্রশাসন' পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। এ উপ-অবয়বে মোট ১১ টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি

অধিবেশনের গুরুত্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কর্মক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রয়োগ সম্পর্কে নিম্নে আলোচিত হোলঃ—

ক) কর্ম সরলীকরণঃ

এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ বিজ্ঞানসম্মত এবং বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতিতে বিভিন্ন কর্ম–উপাদান, কর্ম পদ্ধতি ও কর্ম প্রক্রিয়া চিহ্নিতকরণ, ও বিশ্লেষণ করেন। ফলে সংগঠন পদ্ধতির উন্নয়ন ও সহজীকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে। সুনির্দিষ্টভাবে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল হনঃ

১. অপ্রয়োজনীয় কর্ম উপাদান ও কর্মপদ্ধতি অনুধাবন ও পরিহারে সক্ষম হন;

২. অপ্রয়োজনীয় কর্ম উপাদান ও কর্মপদ্ধতি পরিহারের পর অবশিষ্ট কাজগুলিকে সম্ভাব্য সর্বোত্তম পন্থায় শ্রেণীবিণ্যাস করণ এবং

৩. সর্বাত্মক দক্ষতার সাথে কাজটি সম্পাদনের নিমিত্তে সর্বাত্মক সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ।

এর ফলে সংগঠনে দক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং সাশ্রয় হবে। অংশ গ্রহণকারীগণ তাদের নিজ কর্মক্ষেত্রে বর্তমান কর্মপদ্ধতি উন্নয়নে সক্ষম হবেন।

খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকৃতি ও ধরন ঃ

এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলতে কি বুঝায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে কি কি মৌলিক উপাদান নিহিত রয়েছে প্রকৃতপক্ষে কি ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রম সংগঠিত হয়, বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতিতে কি ভাবে অতি সহজে সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়, কর্মজীবনে কত ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, কোন ধরনের সমস্যার জন্য কি ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন, কোন সিদ্ধান্তে কতটুকু ঝুঁকি রয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে আলাকপাত করা হয়। ফলে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিকতর আস্থাবান হবেন, এবং ঝুঁকি হ্রাসে তৎপর হবেন।

গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি আদর্শ মডেল সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। উন্নততর সিদ্ধান্ত গ্রহণে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ, কি ভাবে অগ্রসর হতে হবে, কি ভাবে সমস্যার অন্তর্ণিহিত কারণ উদঘাটন করা যায়, সমস্যার অন্তর্ণিহিত কারণ উদঘাটন ব্যাতিরেকে সমস্যা সমাধানের জটিলতা ও ঝুঁকি,অকার্যকারিতা ও পদ্ধতিকরণ, উদঘাটিত সমস্যার লক্ষ্যমাত্রায় রূপায়ন ও রূপায়নের গুরুত্ব উপলদ্ধি করতে সক্ষম হন। এ ছাড়াও সমস্যা সমাধানে কি ভাবে বিভিন্ন কলা কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে. কলা কৌশল উদ্ভাবনে কোন কোন উৎপাদনের উপর নির্ভর করতে হবে, বিভিন্ন কলা কৌশলসমূহকে কি ভাবে বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করতে হবে, ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে সমস্যার দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান প্রদানে সক্ষম হন।

ঘ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্বের রূপরেখাঃ

এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কি কি বিবর্তন হয়েছে, বিবর্তনের যৌক্তিকতা কি, বিবর্তনের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কি সুবিধা ও অসুবিধা হল, পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুসারে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি কি রূপ হবে, কতগুলো বিকল্প পন্থা গ্রহণ বাঞ্চনীয়, সমস্যার স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য ও আকার কিরূপ হবে ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়। এ ছাড়াও সিদ্ধান্ত গ্রহীতা হিসাবে সহজাত ত্রুটিসমূহ যেমনঃ- Preconceived Notions, cognitive nearsightedness, over-reliance on own experience, reluctance to decide, oversimpfication ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা হয়। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহীতাগণ তাঁদের সহজাত ত্রুটিসমূহ ও এর পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন এবং তা এড়িয়ে চলতে প্রণোদিত হন। উপরন্তু, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাংগ তাত্বিক ধারণা তাঁদের দৃষ্টিভংগী ও মনমানসিকতা পরিবর্তনে সহায়ক হবে। ফলে কর্মজীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিকতর আস্থাবান হওয়া সম্ভব হবে।

ঙ) ঘটনা সমীক্ষা ঃ (দুটি অধিবেশন)

ঘটনা সমীক্ষা শ্রেণীকক্ষে আলোচিত তাত্বিক ধ্যান ধারণা জটিল, সাধারণ এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে। ফলে অংশগ্রহণকারীদের আহরিত জ্ঞানকে আরো সুসংহত করবে এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগে অনুপ্রাণিত করবে।

চ) ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার ব্যবহারঃ (৫টি অধিবেশন)

কম্পিউটার ব্যবহার সম্পর্কে জনমনে বিশেষ করে কর্মকর্তাদের ধারণা সুস্পষ্ট নয়। এ অধিবেশনে কম্পিউটারে দক্ষতা ও ক্ষমতা, কাজের পরিধি, প্রয়োগের ক্ষেত্র, ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারের গুরুত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণে কম্পিউটারের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে মধ্যসোপানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত করে তুলবে। ফলে কর্মক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার সম্প্রসারিত হবে। এ ছাড়াও অংশগ্রহণকারীগণ সঠিক কম্পিউটার নির্বাচন ও ক্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবেন।

REFERENCES

1. E.N. Gladden, "A History of Public Administration", Vol.2, London: Frank cass, 1972, 246, quoted in Dr. R.K.Sapru, Civil Service Administration in India, New Delhi" Deep & Deep publications, 1985, p.109.

2. L.S.S. O'malley, General Sarvey in Modern India and the West, Oxford: Royal Institute of International Affairs, 1941, P.23, quoted in Ibid, P.109.

3. Quoted in Ibid, P. 111.

4. Fazal-ur–Raheem and Aga Iftikhar Husain. "the Civil Service System in Pakistan, edited by Amara Taksasataya and Hiinrich siededntope Asian Civil Services: Developments and Trends, Kualalampur: 1980, P.310.

5. Report on the Indian Civil Service by T.B. Macthay, (November, 1854), quoted from the "Report of the fulton Committee on the British civil Service (1966-68)" vol.1 , pp.119-128.

6. Fazal-Ur-Raheem and Aga Iftikhar Hussain, op cit.m, p. 308.

7. Ibid, p. 308.

8. Quoted in Akbar Ali Khan and Mosharraf Hossain, post Entry

Trainiong in Bangladesh Civil Service: A Survey of the Problems and Potentials, Savar: Bangladesh Public Administration Training Centre, P.3.

উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন পাঠ্যক্রম এবং সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর একটি বিশেষ দিকঃ সেমিনার প্রতিবেদন লিখন ও উপস্থাপন

–মীর ওবায়দুর রহমান

জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিলের নীতিমালা অনুসারে সরকার এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় কর্মরত মধ্যপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য তিন মাস ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শুরু থেকেই চালু আছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হোল সেমিনার প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে নিজ আগ্রহ এবং পাঠক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে একটি সেমিনার প্রতিবেদন রচনা করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ে একজন বহিরাগত বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে তা আনুষ্ঠানিক ভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

মধ্যপর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় যে কোন সমস্যারই সঠিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রাত্যহিক কাজকর্মের ব্যস্ততার কারণে একটি নির্দ্দিষ্ট সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষণ সম্ভব হয়না এবং সমস্যার অবয়ব, প্রকৃতি এবং সমাধানের সঠিক দিক নির্দেশনার জন্য যে কাঠামো প্রয়োজন, তা অনেক সময়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে অনুসৃত হয়না। সেমিনার প্রতিবেদন লেখার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ কতিপয় বিশেষ দিকের ওপর সম্যক ধারণা অর্জন করেন যা পরবর্তী সময় প্রয়োগিক ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অবস্থা ও সমস্যার নিরসন কল্পে গঠনমূলক ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

মধ্যপর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্যে উৎকর্ষতা সৃষ্টিতে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হোল যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা গৌণ থাকে। অধঃস্তন কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে যে ধরনের বিকল্প সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হয়, তা বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার তেমন একটা উদ্যোগ নেয়া হয়না। এই বিষয়ের অনঢ়তা উর্ধতন কর্মকর্তা হিসাবে পরবর্তী সময়ে দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে যে সৃজনশীলতা থাকতে পারে তা অপ্রকাশিত

থেকেই যায়। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের কোন একটি বিষয়ের ওপর বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করণীয় ও বিষয়বস্তুর ওপর সঠিক দিক নির্দেশনা, না লেখার জড়তা এবং বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট পুস্তকাদি পর্যালোচনা করার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় —যা পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষণার্থীগণ মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সময় প্রয়োগ করতে পারেন।

সেমিনার প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনের লক্ষ্য সমূহ নিম্নরূপঃ--

১) সমস্যা সনাক্তকরণ ও বিশ্লেষণের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ

২) সংশ্লিষ্ট পুস্তকাদি পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সেমিনার প্রতিবেদনে উপস্থাপনের কৌশল আয়ত্বকরণ

৩) কর্মকর্তাদের নির্ধারিত কাঠামোর মধ্যে একটি বিষয়কে উপস্থাপনের বিভিন্ন দিকের উপর বাস্তব জ্ঞান অর্জন

৪) সৃজনশীল লেখার অভ্যাস গড়ে তোলা

৫) সুনির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপনের কৌশল রপ্তকরণ

৬) প্রশাসনের সংগে সম্পৃক্ত কিছু তাত্ত্বিক বিষয়াদির প্রয়োগিক ক্ষেত্রে অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে সমন্বয় করণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে কার্যকর ভুমিকা পালনে উদ্বুদ্ধকরণ

৭) সেমিনার প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য উপাত্ত সংগ্রহের বিভিন্ন পদক্ষেপের ওপর বাস্তব জ্ঞান অর্জন এবং

৮) গবেষণা প্রবন্ধটি লিখনে পুস্তক/রেফারেন্স বিষয়াদি উদ্ধৃতির (Citation) সঠিক ধারণা অর্জন।

সেমিনার প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনের জন্য অনুসরণীয় কার্যক্রম

সেমিনার প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন পাঠ্যক্রমে সফল উত্তরণের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকেই একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর সেমিনার

প্রতিবেদন রচনা করতে হয় এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম ধারাবহিকভাবে অনুসরণ করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য–সংগ্রহ ও প্রতিবেদন উপস্থাপনার জন্য বেশ কয়েকটি অধিবেশন বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৫টি অধিবেশন এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য ২০–২৫ টি অধিবেশনের প্রয়োজন হয়ে থাকে যা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মোট অধিবেশন সংখ্যার শতকরা ১৫–২০ ভাগ হতে পারে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শুরু হবার ২/১ সপ্তাহের মধ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের একটি অধিবেশনের মাধ্যমে সেমিনার প্রতিবেদন প্রণয়নের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের একটি সমস্যাকে সামনে রেখে সেমিনার প্রতিবেদনের রূপরেখা প্রস্তুত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। কেন্দ্রের উর্ধ্বতন অনুষদ সদস্যের উপস্থিতিতে একটি পর্যালোচনা অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রস্তাবিত রূপরেখাটি বিশদভাবে আলোচিত হয় এবং সেমিনার প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু চূড়ান্তকরণ করা হয়।

সেমিনার পেপারের ওপর বিভিন্ন ধাপে উপদেশনা ও দিক নির্দেশনার জন্য কেন্দ্রের পরিচালক বা তদূর্ধ একজন অনুষদ সদস্যকে অভ্যন্তরীণ উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

কোর্স কর্তৃপক্ষ প্রতিটি সেমিনার পেপারের জন্য একজন বহিঃমূল্যায়নকারী নির্বাচিত করেন। প্রতিবেদন উপস্থাপনের নির্ধারিত অধিবেশনে বহিঃমূল্যায়নকারী এবং অভ্যন্তরীণ উপদেষ্টা উপস্থিত থাকেন এবং বহিঃমূল্যায়নকারী সেমিনার পেপারের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তার বক্তব্য তুলে ধরেন। প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিকের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং প্রতিবেদক উত্তর দিয়ে থাকেন। সাধারণতঃ বহিঃমূলায়নকারী হিসাবে সরকারের উচ্চপর্যায়ের একজন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাকে নিয়ে আসা হয় যিনি বিষয়ের ওপর তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং বাস্তবতার নীরিখে সেমিনার পেপারের দুর্বলও সবল দিকগুলো তুলে ধরেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিবেদন লিখনের জন্য কেন্দ্র থেকে একটি সহায়ক গ্রন্থ (Guide Book) দেয়া হয়ে থাকে। সেমিনার পেপারের অবয়ব, বিভিন্ন পয়েন্টস, উদ্ধৃতির (Citation) নিয়মকানুন প্রশিক্ষণার্থীগণ সেখান থেকে দেখে নেন।

মূল্যায়ন পদ্ধতি

প্রতিটি সেমিনার পেপার বহিরাগত মূল্যায়নকারী এবং অভ্যন্তরীণ উপদেষ্টা ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে থাকেন। মূল্যায়ন পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়ে থাকে ঃ—

১) প্রতিবেদনের অবয়ব, কোন কোন পয়েন্টস এবং কি ধরনের তাত্ত্বিক মডেল বিশেষভাবে লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে

২) প্রতিবেদনের ভাষার উৎকর্ষতা ও ষ্টাইল

৩) প্রতিবেদনের বিভিন্ন পয়েন্টসের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় এবং প্রতিবেদন প্রণয়নকারীর বিশ্লেষণ ক্ষমতা

৪) প্রতিবেদনে নতুন দিকনির্দেশনা অথবা নতুন ধারণার উন্মেষ

৫) প্রতিবেদনের মৌখিক উপস্থাপনা কৌশল এবং

৬) প্রতিবেদকের প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিকের উপর উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের প্রকৃতি ও প্রতিবেদকের উত্তরের উৎকর্ষ।

উৎকর্ষের মানদণ্ডে যে সমস্ত সেমিনার পেপার সন্তোষজনক হয়ে থাকে সেসব পেপার কেন্দ্রের উদ্যোগে কেন্দ্রের জার্ণালে প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বেশ কয়েকটি সেমিনার পেপার ইতোমধ্যেই কেন্দ্রের জার্ণালে প্রকাশ করা হয়েছে। যে সমস্ত সেমিনার পেপার কেন্দ্রের জার্ণালে প্রকাশ করা হয়েছে, তার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হল।

(১) Dhaka Towards the Year 2000; The Emerging Problems of Metropolitan Management, BPATC journal, Vol. 1, No, II : ১৯৮৭ প্রতিবেদন প্রণয়নকারী জনাব মোঃ ফজলুল হক চতুর্থ উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন পাঠ্যক্রমের প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।

(২) Analysis of Poverty and Its Status in Bangladesh: A Review and Some Suggestions, Vol. III No.1, 1989.

প্রতিবেদন প্রণয়নকারী জনাব এ, এন, এম, হারুন-উর-রশিদ দশম সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।

(৩) Local Level Planning and People's Participation: A Case Study of Food for Works Programm in Bangladesh, Vol. II, No.I, আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, প্রতিবেদন প্রণয়নকারী পঞ্চম সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের (July, ১৯৮৮) একজন প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।

(৪) Train Accident in Bangladesh : Causes and Remedies- Vol. I No.I, Jan., 1987, এম, এ, রহিম— তিনি দ্বিতীয় সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের একজন প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।

(৫) Public Sector Carpet Mills; A Case Study of an Industry. VoI. I, Jan. 1987, M. M. Reza, প্রতিবেদন প্রণয়নকারী প্রথম সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের একজন প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।

প্রতিটি সেমিনার পেপারে একটি নির্দিষ্ট সমস্যাকে সুস্পষ্টভাবে সনাক্ত করা হয়েছে। সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করে এর সামাধানকল্পে করণীয় দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের অনেকেরই পূর্বে এই ধরনের প্রতিবেদন প্রণয়ন করার কৌশল জানা ছিলনা। কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁরা উক্ত বিষয়ের ওপর দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন এবং কেন্দ্রের জার্ণালে একটি গবেষণা প্রবন্ধ ছাপানোর দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেন।

এই দিকটার যথাযথ অনুশীলন একজন কর্মকর্তার ভবিষ্যতের বিভিন্ন কর্মপন্থা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পাদিত কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতিঃ বিপিএটিসির জন্য একটি প্রস্তাবনা

-মোঃ মোজাম্মেল হক

অবতরণিকাঃ

বাংলাদেশের সরকারী কর্মকর্তাগণকে বিভিন্ন ধাপে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যে নিয়োজিত সর্ববৃহৎ এ প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কর্মকাণ্ড কেন্দ্রের রেক্টর মহোদয়ের তত্বাবধানে ৪টি বিভাগ

ও ১৩টি অনুবিভাগ/দপ্তর এর বিভিন্ন শাখা অনুশাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। ১৩টি অনুবিভাগ /দপ্তরের মধ্যে ৮টি প্রশিক্ষণ দানমূলক (ইনষ্টাকশনাল) এবং ৫টি ক্রিয়ামূলক (ফাংশনাল) অনুবিভাগ দপ্তর হিসাবে বিবেচিত। প্রশিক্ষণদানমূলক (ইনষ্ট্রাকসনাল) অনুবিভাগ সমূহের কার্যাবলী মূলতঃ বিভিন্ন কোর্সের মডিউল প্রস্তত করতঃ তদনুযায়ী বক্তৃতা প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অপর দিকে ক্রিয়ামূলক (ফাংশানাল) অনুবিভাগ সমূহের মধ্যে প্রশাসন অনুবিভাগ কেন্দ্রের সার্বিক কর্মীব্যবস্থাপনা আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও সেবা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। পিপিআর অনুবিভাগ কেন্দ্রের সার্বিক পরিকল্পনা কোর্স কর্মসূচী প্রণয়ন ও নথি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। মুল্যায়ন অনুবিভাগ বিভিন্ন কোর্স কার্যক্রমের দৈনিক সাপ্তাহিক ও কোর্স সমাপনী মূল্যায়ন সহ কোর্স প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রতিটি কোর্স রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং নির্দেশিত নির্দিষ্ট বিষয়ের মূল্যায়ন করে থাকে। লাইব্রেরী ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ মূলতঃ কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট গবেষণা কর্মের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়োজিত। বিভিন্ন বিভাগ অনুবিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের কর্মপদ্ধতি তরাণ্বিত করার মাধ্যমে সুফল প্রপ্তির লক্ষ্যে প্রত্যেকের সম্পাদিত কর্মের যথোচিত স্বীকৃতি সহ মুল্যায়নের দাবী রাখে।

মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তাঃ

কর্মকর্তা কর্মচারী সম্পাদিত কর্মমূল্যায়নের উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

(ক) প্রত্যেক কর্মকর্তা /কর্মচারীর নির্দিষ্ট সময়ে নিজস্ব কর্মভার (ওয়ার্কলোড) যাচাই করা

(খ) বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে কাজের সুষম বন্টন ব্যবস্থা জোরদার করা

(গ) সামগ্রিক ভাবে কাজের দ্রুত সম্পাদন নিশ্চিত করা এবং

(ঘ) নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজনীয় জরুরী কাজে কর্মকর্তা / কর্মচারীকে দায়িত্ব প্রদান সহজতর করা

প্রস্তাবিত মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ-

কেন্দ্রে প্রতিদিন প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারী সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (এমনকি অতিরিক্ত সময়েও) বিভিন্ন দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ ছাড়াও

কেন্দ্রের কিছু সংখ্যক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা / কর্মচারী বিভিন্ন কোর্স চলাকালীন কোর্স কার্যক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত অফিস সময়ের বাইরেও নানাবিধ দায়িত্ব (ভোরের শরীর চর্চা, বৈকালিক খেলাধুলা, সন্ধ্যা / রাত্রি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইত্যাদি) পালন করে থাকেন।

সার্বিক ভাবে বিভাগ / অনুবিভাগ ভিত্তিতে কেন্দ্রে সম্পাদিত কাজের বিবরণ সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নরূপ ভাবে দেখানো যেতে পারেঃ—

বিভাগ/ অনুবিভাগ	কাজের মৌল পদ্ধতি
১। প্রশাসন সংক্রান্ত	পত্র, নথি,তত্ত্বাবধান সমন্বয়, পরিদর্শন, সভা, ইত্যাদি।
২। পরিকল্পনা, কর্মসূচী ও নথি ব্যবস্থাপনা	নথি, পত্র, প্রকল্প বিষয়ক, কর্মসূচী প্রণয়ন সভা।
৩। ইনষ্ট্রাকশনাল	হ্যাণ্ড আউট তৈরী ক্লাশে বক্তৃতা পড়াশুনা উত্তরপত্র পরীক্ষণ।
৪। মূল্যায়ন	নথি পত্র, অবলোকন, তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন, প্রণয়ন তথ্য সমন্বয়, কোর্স রিপোর্ট প্রেরণ।
৫। গবেষণা	নথি, পত্র, প্রতিবেদন, প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা কর্মে ব্যবস্থাপনা সহায়তা দান।
৬। গ্রন্থাগার ও প্রশিক্ষণ উপকরণ	নথি, পত্রপুস্তক ও তথ্য ব্যবস্থাপনা ও বিতরণ মুদ্রণ দর্শন ও শ্রবন উপকরণ ব্যবস্থাপনা।
৭। শরীর চর্চা	সকাল – বিকাল শরীর চর্চা ও খেলাধুলার অনুশীলন ও মূল্যায়ন, নথি, বিভিন্ন খেলার আয়োজন

উল্লিখিত মৌল কার্যাদি বিবেচনা করে বিভাগ/অনুবিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদিত কর্ম নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা যেতে পারেঃ–

১। **কর্মকর্তাগণের দৈনন্দিন কাজের ডায়রীভুক্তকরণঃ** কর্মকর্তাগণ প্রতিদিনের সম্পাদিত (সম্ভবমত) সকল কর্ম কেন্দ্র প্রদত্ত ডায়রীতে দিন ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করবেন যাতে পরবর্তীতে ডায়রী দেখে নির্দিষ্ট সময়ের সম্পাদিত কর্ম সম্পর্কে ধারণা লাভকরা যায়। এমন হতে পারে কেউ ২০টি নথি ছাড় করেছেন, ৮টি নথিতে বড়/ছোট নোট লিখেছেন, নির্দিষ্ট বিষয়ে অনুবিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা

করেছেন, সমস্যা মোকাবেলায় পরামর্শ করেছেন ইত্যাদি। উক্ত কাজ সমূহ তিনি নিম্নরূপ ডায়রীভুক্ত করতে পারেন, ২০টি নথি, ৮টি নথিতে নোটের মাধ্যমে রাখা/সিদ্ধান্ত প্রদান, নির্দিষ্ট সমস্যা এর ব্যাপারে নির্দিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা, তিনবার রেক্টর মহোদয়ের সহিত প্রশাসনিক বিষয়ে আলাপ, নির্দিষ্ট বিষয়ের সভায় যোগদান, নির্দিষ্ট সমস্যা পরিদর্শন। পরবর্তীতে ডায়রী দেখে ফাইল পত্র এবং অন্যান্য লিপিবদ্ধ কাজের ধরন পরীক্ষা করে প্রকৃত কাজের মাত্রা নিরূপণ করা যায়। একই ভাবে, ইনষ্টকশনাল কাজের সাথে জড়িত কর্মকর্তার নির্দিষ্ট দিনের ক্লাশের নাম, হ্যাণ্ডআউট তৈরীর বর্ণনা ও পড়াশোনার ধরন দেখে – কোর্স ও লাইব্রেরী খবর সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা যাবে। অনুরূপ প্রক্রিয়ায় একজন মূল্যায়ন কর্মকর্তা একটি নির্দিষ্ট দিনে প্রণীত নথি, প্রণীত প্রতিবেদন, কোর্স কার্যক্রম অবলোকন, তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যাদি ডায়রীতে লিখে রাখলে পরবর্তীতে নথি ও কোর্স কার্যক্রমের মাধ্যমে এর সত্যতা যাচাই করা সহজতর হবে।

২। **মুদ্রাক্ষরিক ষ্টেনোগণ প্রতিদিনের সম্পাদিত কর্মকেন্দ্রে প্রদত্ত রেজিষ্ট্রি বইতে / ডায়রীতে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করবেনঃ** উদাহরণ স্বরূপ, দিনে কোন কর্মকর্তার কত পৃষ্ঠা খসড়া অথবা চূড়ান্ত ভাবে মুদ্রণ করেছেন বা ডিক্টেশান নিয়েছেন তা লিপিবদ্ধ থাকলে পরবর্তীতে মূল অফিস কপি ও নথি পর্যালোচনার মাধ্যমে তা যাচাই করা যাবে।

৩। প্রত্যেক অনুবিভাগ ভিত্তিক কাজের সুষ্ঠু, তত্বাবধান কল্পে পাক্ষিক ভাবে (মাসে ২ বার) বিভাগ/অনুবিভাগ প্রধান তাঁর অধীনস্থদের নিয়ে দিনের নির্দিষ্ট সময়ে বিগত দিনগুলিতে প্রত্যেকের সম্পাদিত কর্মসমূহ পর্যালোচনা করবেন। এরূপ তত্বাবধানের মাধ্যমে প্রত্যেকের কাজের ধরন ও চাপ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে কাজ পূণঃবন্টন করার মাধ্যমে বিভাগ / অনুবিভাগের কাজ ত্বরাণ্বিত করা যায়।

৪। প্রতিমাসে মূল্যায়ন অনুবিভাগ ২০% নমুনা জরীপ করবে এবং রেক্টর মহোদয়ের নিকট প্রতিবেদন পেশ করবে। প্রত্যেক অনুবিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা / কর্মচারীর নির্দিষ্ট সংখ্যক কমবেশী ২০% (নির্দেশমত / নমুনা হিসাবে) এর ডায়রী / রেজিষ্টার বই পর্যালোচনা করে রেক্টর মহোদয়ের নিকট পরিচালক (মূল্যায়ন) প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন। প্রণীত প্রতিবেদন রেক্টর মহোদয়কে উল্লেখিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কাজের ধরন ও চাপ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে।

প্রস্তবনার দূর্বল দিকঃ

১। কেন্দ্রের রেক্টর ও এম, ডি, এস, গণসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সম্পাদিত কর্ম এ পদ্ধিতে মূল্যায়ন অত্যন্ত জটিল।

২। এক অনুবিভাগের কাজ অন্য অনুবিভাগ (মূল্যায়ন অনুবিভাগ) কর্তৃক মূল্যায়ন—বিভিন্ন অনুবিভাগের মধ্যে আন্তঃদ্বন্দ সৃষ্টি করতে পারে।

৩। মূল্যায়ন অনুবিভাগের বর্তমান সীমিত জনবল দ্বারা এ কর্ম সম্পাদন অত্যন্ত কষ্টকর হবে।

৪। মূল্যায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক প্রতিমাসে ২০% ক্ষেত্রে নমুনা জরীপে পদ্ধতিগত ত্রুটি থেকে যেতে পারে।

বিপিএটিসিতে কম্পিউটার স্থাপন ও ব্যবহার

—মোহাম্মদ হোসেন

১৯৮৯ সালের মে মাসে কেন্দ্রে ৮টি মাইক্রো কম্পিউটার স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৭টি আইবিএম এবং একটি এ্যাপেল ম্যাকিনটোস। আইবিএম একটিতে এবং মেকিনটোস কম্পিউটারে বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসিং এর সুবিধা রয়েছে। বর্তমানে এই সংখ্যা আরও বেড়েছে।

কম্পিউটার স্থাপনের উদ্দেশ্যঃ

- বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদান
- কেন্দ্রে পরিচালিত অন্যান্য কোর্সের অংশগ্রহণকারীদেরকে কম্পিউটার সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বিষয়াদি জানানো
- প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন
- কোর্স সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদন
- কেন্দ্রের অন্যান্য কাজ কম্পিউটারে সম্পাদন

কম্পিউটার কোর্সঃ

সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা হবে। অনেকের এ প্রযুক্তি ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণা নেই বিধায় কম্পিউটার

প্রযুক্তির ব্যবহার এখনো তেমন প্রসারিত হয়নি। কেন্দ্র মনে করে যে, কেন্দ্রের সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে কম্পিউটার বিষয়ে কোর্স পরিচালনা করে সরকারী কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। তা বিবেচনা করে কেন্দ্র কম্পিউটার পরিচিতি ও কম্পিউটার ব্যবহারের ওপর কোর্স পরিচালনা শুরু করেছে। ভবিষ্যতে আরো বিভিন্ন ধরনের কোর্স পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে।

কেন্দ্র ইতোমধ্যে কম্পিউটার পরিচিতির ওপর ৪টি কম্পিউটার ব্যবহারের উপর ৩টি কোর্স পরিচালনা করেছে। এই কোর্সগুলোতে কেন্দ্রের কর্মকর্তা, বিভিন্ন সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও কর্পোরেশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ওয়ার্ড প্রসেসিং এর উপর ৩টি কোর্সে পরিচালনা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে কেন্দ্রের/কর্মচারীদের জন্য আরও কোর্স পরিচালনা করা হবে।

(খ) কম্পিউটার বিষয়ক অধিবেশন/ মডিউলঃ

কম্পিউটার বিষয়ক নিয়মিত কোর্স ছাড়াও কেন্দ্রে পরিচালিত অন্যান্য কোর্সের কম্পিউটার পরিচিতির ওপর অধিবেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ সমস্ত কোর্সে কম্পিউটার পরিচিতির ওপর মডিউল রাখার ব্যবস্থা করা হবে এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে কম্পিউটারের প্রয়োগিক বিষয়াদি দেখানোর/শেখানোর ব্যবস্থা করা হবে।

(গ) কেন্দ্রের কাজে কম্পিউটার ব্যবহার ঃ

কম্পিউটার বিষয়ক কোর্স / অধিবেশন পরিচালনা ছাড়াও নীচের কাজগুলো সম্পাদনের কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়ে থাকেঃ—

– প্রশিক্ষণ কোর্স/সেমিনার / কর্মশালা–ইত্যাদির ব্রোসিয়ার প্রস্তুতকরণ
– কোর্স/সেমিনার/কর্মশালা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ
– প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুতকরণ
– প্রশিক্ষণ সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ
– অন্যান্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ
– পরিসংখ্যানের কাজ
– প্রকাশনা শাখার বিভিন্ন কাজ

- গ্রন্থগার ব্যবস্থাপনা
- কর্মী ব্যবস্থাপনা
- হিসাব ব্যবস্থাপনা

ওপরোক্ত কাজগুলো কম্পিউটারে করার ফলে কেন্দ্রের কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বেশ পরিমাণ আর্থিক সাশ্রয়ও হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, কম্পিউটার স্থাপনের পূর্বে প্রতি বৎসর প্রায় ৩০টি কোর্স/সেমিনার/কর্মশালার ব্রোসিয়ার ঢাকাস্থ বিভিন্ন প্রেস থেকে ছাপানো হত। এর জন্য কেন্দ্রের বেশ পরিমাণ অর্থ ব্যয় হতো। প্রকাশনা শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা / কর্মচারীদের প্রায়ই ঢাকা যাতায়াত করতে হত্যে এবং নিয়মিত সময়ে কাজ পাওয়া যেত না। বর্তমানে এই নির্ভরশীলতা কমে যাচ্ছে। কেন্দ্র মনে করে যে, দাপ্তরিক কাজের জন্যও কম্পিউটারের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রকাশনা ও আরও অন্যান্য কাজ কম্পিউটারের সাহায্যে করে কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এতে আর্থিক সাশ্রয় হতে পারে এবং প্রেসের উপর নির্ভরশীলতাও কমবে।

কেন্দ্রে কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কাজ কর্মের সম্প্রসারণঃ

বর্তমানে স্থাপিত কম্পিউটার গুলি কেন্দ্রের কাজ কর্মে, প্রশিক্ষকদের জন্যে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কেন্দ্রে কম্পিউটারের সংখ্যা এবং কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট জনবল বাড়িয়ে বর্তমান সুযোগ সুবিধা যেমন লাইব্রেরী, প্রশিক্ষণ কক্ষ, প্রশিক্ষণ উপকরণ ও অন্যান্য সুবিধাদি সম্প্রসারণের সুযোগ পাবেন।

বিপিএটিসিতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ব্যাপারে সম্প্রতি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কেন্দ্রে একটি পত্র প্রেরণ করেছে। এই পত্রে বিপিএটিসিতে কম্পিউটারের সুযোগ সুবিধাদি সম্প্রসারণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ওপরোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করে কেন্দ্র প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে অব্যয়িত টাকা থেকে আরো কয়েকটি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে এবং কেন্দ্র প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের একটি মিনি কম্পিউটার ক্রয়ের ও সংশ্লিষ্ট জনবলের পদ সৃষ্টির প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

কম্পিউটার সেন্টারের জনবল ঃ

কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অন্য বিভাগের একজন কর্মকর্তা এবং ৩ জন কর্মচারী কম্পিউটার বিষয়ক কাজ কর্মের দায়িত্ব পালন করছেন। জনবল সৃষ্টির একটি

প্রস্তাব সংস্থাপন মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেছেন। এবং তা অর্থ মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাঃ

সরকারী এবং বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম কম্পিউটারের সাহায্য করার জন্য মাননীয় রাষ্ট্রপতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং তা বাস্তবায়নে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান কর্ণেল (অবঃ) এম, আজিজুর রহমানের সাথে কেন্দ্রের কম্পিউটার বিষয়ক কাজ-কর্মের সম্প্রসারণ বিষয়ে আলোচনা প্রসংগে তিনি বলেন যে, বিপিএটিসি দেশের সর্ববৃহৎ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে লোক প্রশাসন, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উন্নয়নের কাজে সহযোগিতা করছে। বর্তমানে এই কেন্দ্রে যেসমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে (স্থান, লাইব্রেরী, প্রশিক্ষণের উপকরণ ইত্যাদি) তা ব্যবহার করে কম্পিউটার বিষয়ক কাজ কর্মের সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মালয়েশিয়ার INTAN-এ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধীনে জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান জাপানের সাথে কারিগরি, অনুষদ উন্নয়ন ও অন্যান্য সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে দেশে এবং বিদেশে কম্পিউটার কার্যক্রমের সম্প্রসারণ করেছে। বাংলাদেশেও এমনি ধরনের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে কম্পিউটার কার্যক্রম উন্নয়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) বিপিএটিসির কম্পিউটার কেন্দ্র সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিসিসি ও এপিডিসি এর যৌথ উদ্যোগে ডিসেম্বর ১৭ - ২১, ১৯৮৯ ঢাকায় অনুষ্ঠিত "INFORMATION TECHNOLOGY (IT) APPLICATIONS IN GOVERNMENT ADMINISTRATION AND DECENTRALISED DEVELOPMENT" — শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের সেমিনারে কেন্দ্রের কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণের যে সুপারিশ করা হয়েছে তা নীচে উল্লেখ করা হোলঃ—

Public Administration Training Centre (PATC) should organize a computer training centre on the level of Malaysian counterpart INTAN. This training centre should be affiliated with the local university. This centre should provide both in device and formal user or managerial IT training to the Civil Servants.

কেন্দ্র মনে করে যে কেন্দ্রের সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে কেন্দ্রে জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য দায়িত্বাবলী নীচে উল্লেখ করা হোলঃ—

(ক) কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের স্বল্প / দীর্ঘ মেয়াদী কোর্স পরিচালনা

(খ) কম্পিউটার বিষয়ক ডিপ্লোমা / ডিগ্রী কোর্স পরিচালনা

(গ) কম্পিউটার বিষয়ক সেমিনার / ওয়ার্কশপের মাধ্যমে কম্পিউটার কাজ কর্মের সম্প্রসারণ

(ঘ) কম্পিউটার কাজ কর্ম উন্নয়নের জন্য গবেষণা করা

(ঙ) সরকারকে কম্পিউটার বিষয়ক পরামর্শ প্রদান।

সম্ভাব্য যে সমস্ত বিষয়ের ওপর কম্পিউটার কেন্দ্র জাতীয় প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করতে পারে তা নীচে উল্লেখ করা হোলঃ—

a. Courses targatted for the technical and professional persons:-

(1) System Programming and Operating Systems
(2) Structured Program design
(3) Software Packages
(4) Data base Programming
(5) Data Communications Programming
(6) Structured Systems Analysis and Design
(7) Systems Management
(8) Data Communication and Computer Networks
(9) Systems Design for Micro Computers

(b) Course for the personnel for the Managerial Category

(1) Information Systems Management

(2) Office Automation

(3) Management of Computer Centre

(4) EDP Project management

ওপরোক্ত দায়িত্ব পালন এবং কোর্স পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে বিদেশী সংস্থার /ব্যক্তির সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

কেন্দ্রে স্বেচ্ছাশ্রম

-মুঃ আব্দুস সালাম

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সময়োপযোগী সুশীল সেবক গড়ার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মবিমুখ অলস মানসিকতা দূরীকরণে শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধেও প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদেরকে সচেতন করে তোলার প্রতি গুরত্বারোপ করা হয়ে থাকে। স্বেচ্ছাশ্রমকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গী উন্নয়নে কেন্দ্র— আপনি আচরি ধর্ম পরে শিখাও— নীতিবাক্যে বিশ্বাসী। স্বেচ্ছাশ্রম কর্মসূচীর প্রতি প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের আকৃষ্ট করার পূর্বে রেক্টর মহোদয়ের অনুপ্রেরণায় ও নেতৃত্বে কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিজের কাজ নিজে করার মহতী উদ্যোগে সাড়া দিয়ে স্বেচ্ছাশ্রম দানের মাধ্যমে কেন্দ্রের বিভিন্ন কর্মসূচীতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা শুরু করেছেন। কেন্দ্রে ইতোমধ্যে ৩০০ কোদাল ও ১০০ নিড়ানী ক্রয় করা হয়েছে।

বিগত ২৯ মার্চ, ১৯৯০, পহেলা রমজানের দিনে— চৈত্রের দাবদাহ ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে কেন্দ্রের প্রায় ২০০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী, (অধিকাংশই রোজা অবস্থায়), বেলা ৩টা হতে ৪টা অবধি মাটি কেটে রাণিং ট্রাক প্রস্তুতির মাধ্যমে স্বেচ্ছাশ্রমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

কেন্দ্রের ভূমি উন্নয়নে অদুরদর্শী পরিকল্পনার ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রের আবাসিক এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় সামান্যতম বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হোত। কেন্দ্রে বৃষ্টির পর ৫/৬ ইঞ্চি পানিতে জুতা শুদ্ধ পা ডুবিয়ে চলার অভিজ্ঞতা কমবেশী আমাদের সবার হয়েছে। বহু অনুরোধে গণপূর্ত বিভাগ কিছু কিছু এলাকার রাস্তা দুই এক ইঞ্চি করে উচু করেছিলেন। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। কারণ পাশের মাঠ যে আরো উঁচু!

সমস্যাটি নিয়ে যখন আমরা বিব্রত আর পূর্বসূরীদের অদূরদর্শী পরিকল্পনায় ক্ষুব্ধ তখনই এর সুন্দর সমাধান দিলেন রেক্টর মহোদয় স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে। তার ভাষায় "তোমার বাড়ীর দরজার পানি সরাতে গণপূর্ত বিভাগ কেন? নিজেরা কিছু করো। শুধু হাপিত্যেশ আর পরের সমালোচনা ছেড়ে নিজে যা পারো তাই করো।" রেক্টর মহোদয়ের উদ্বুদ্ধকরণের ফলে নিজ হাতে কোদাল নিয়ে কাজে লাগলেন ডি টাইপ ভবনের বাসিন্দা সহকারী পরিচালক জনাব আহমেদুর রহিম। রেক্টর মহোদয় নিজে সরেজমিনে যেয়ে তাঁকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করলেন। যারা হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন, তাঁরাও এবার হাত লাগালেন। কয়েক ঘন্টার পরিশ্রমেই জলাবদ্ধ এলাকা হতে নালা কেটে জলনিস্কাশনের ব্যবস্থা করা হল। দূরীভূত হল দীর্ঘকালীন এক সমস্যা।

ক'দিন পরেই দেখা গেল বি টাইপ ভবনের বাসিন্দা পরিচালক সর্বজনাব অরবিন্দ কর ও হীরালাল বালা কাক ডাকা ভোরে কোদাল হাতে নালা কাটছেন। তাঁদেরকে সহযোগিতা করছেন সহকারী পরিচালক জনাব আহমেদুর রহিম ও কম্পট্রোলার জনাব আইনুল হক। অফিস সময়ের পূর্বেই দেখা গেল তাঁরা বেশ দীর্ঘ নালা কেটে বি-৪ ভবনের সামনের জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধান করেছেন নিজেরাই। বিকেলে দেখা গেল রেক্টর মহোদয় সরেজমিনে এলাকাটি ঘুরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজের প্রশংসা করলেন।

এভাবেই কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ রাস্তায় জলাবদ্ধতার সমস্যা, যা দীর্ঘ দিনের দরকার এবং তদবীরে সমাধা হয়নি, রেক্টর মহোদয়ের অনুপ্রেরণায় আর উদ্বুদ্ধকরণে স্বেচ্ছাশ্রমের সোনার কাঠির পরশে তা ধীরে ধীরে সমাধা হয়েছে। গামবুট পরিহিত কোন সহকর্মীর কেন্দ্রের রাস্তায় চলাফেরা করার নয়ন মুগ্ধকর দৃশ্যটি হতে হয়তো আমরা চিরতরেই বঞ্চিত হয়েছি।

আল্লাহ পরিচ্ছন্নতা ভালবাসেন। তাই কেন্দ্রকে সর্বোতভাবে পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি রেক্টর মহোদয় সর্বদা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ এলাকা মাত্র ২২ জন ঝাড়ুদারের পক্ষে পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব নয়। একথা অনুধাবন করেই এব্যাপারে স্বেচ্ছাশ্রমের আদর্শের উদাহরণ সৃষ্টির উদ্যোগে প্রথমেই এগিয়ে এলেন রেক্টর মহোদয়। ফজরের নামাজের পর রাস্তায় মাঠে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাগজ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন রেক্টর মহোদয় স্বয়ং এদৃশ্য আমাদের স্মৃতিপটে এখনও অমলিন। বার বার ঝুঁকে পড়ে কাগজ কুড়াতে অসুবিধার কারণে ক্রয় করা হল কাগজ কুড়াবার কোচ।

একদিন ভোরে রেক্টর মহোদয়কে দেখা গেল কোদাল হাতে ক্যাফেটেরিয়া ভবনের পিছনের ডাষ্টবিনের পাশে বদ্ধ নর্দমা পরিস্কার করতে। স্কুলের শিক্ষক ছাত্রদের নিয়ে স্কুলের মাঠের কাগজ কুড়াবার দৃশ্য- স্কুলের ছেলেমেয়েরা এখনো ভূলেনি।

রেক্টর মহোদয়ের কার্যাবলী তার ইপ্সিত ইতিবাচক দ্রুত প্রভাব ফেললো কেন্দ্রের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যেও। অফিসে যাবার বা আসার পথে বা রাস্তার চলাচলের পথে রাস্তার পাশ বা মাঠ হতে বিক্ষিপ্ত কাগজ কর্মকর্তা / কর্মচারীগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেরাই কুড়াচ্ছেন ও বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত পাত্রে ফেলে দিচ্ছেন– এ দৃশ্যে আর কোন নুতনত্ব থাকলো না। পাশাপাশি—"কেন্দ্রকে পরিচ্ছন্ন রাখবো"—এই মন্ত্রে বিশ্বাসী সকলেই যত্রতত্র কাগজ / ময়লা ফেলার ব্যাপারেও যথেষ্ট সতর্ক হয়ে উঠেলেন। ফলশ্রুতিতে অচিরেই কেন্দ্র প্রকৃত অর্থেই পরিচ্ছন্ন সবুজ রূপে আত্মপ্রকাশ করলো।

ঝাড়ুদারদের ওপর বহু আদেশ/নির্দেশ তর্জন গর্জনে যে কাজ সমাধা হয়নি, স্বেচ্ছাশ্রমে সকলেই ঐকান্তিক অংশ গ্রহণে তা সম্ভব হল। কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরে আপনি কোন কাগজের টুকরা বা ময়লা পড়ে থাকতে দেখবেন না একথা আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি।

কেন্দ্রকে ফুলে ফলে সবুজে শ্যামলে সুশোভিত করে গড়ে তোলার স্বপ্ন আমাদের দীর্ঘদিনের। এ স্বপ্নের বাস্তব রূপায়নে এতকাল আমরা প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টার ওপরই গুরুত্ব আরোপ করে এসেছি। কেন্দ্রে বৃক্ষারোপন কর্মসূচীর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল গণপূর্ত বিভাগের আরবরিকালচার ডিপার্টমেন্টের ওপর। কেন্দ্রের ভূমি উন্নয়ন, ঘাস রোপন ও বৃক্ষরোপনে ৬৪ লক্ষ টাকা খরচ করে কেন্দ্রে ৬৮৬৯ টি গাছ লাগানোর পর ১৯৮৮ এর প্রলয়ঙ্করী বন্যায় কেন্দ্রের শতকরা ৯৫ ভাগ এলাকা ৭ হতে ১৫ দিন পানিতে নিমজ্জিত থাকার ফলে—রোপিত বৃক্ষের সিংহভাগই মারা যায়। বন্যার পুনরাবির্ভাবের আশঙ্কায় ১৯৮৯ সনে কার্যতঃ নতুন করে গাছ লাগানোর তেমন কোন কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়নি। ১৯৯০ এ আবার কেন্দ্রকে বৃক্ষশোভিত করার কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়। তবে এবার শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নয়। কারণ ইতোমধ্যেই আরবরিকালচার ডিপার্টমেন্ট কেন্দ্রে তাদের অর্পিত দায়িত্ব শেষ করে বিদায় নিয়েছে। কেন্দ্রের মাত্র দশজন মালীর পক্ষে এই বিরাট কর্মযজ্ঞ এককভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই এর পাশাপাশি স্বেচ্ছাশ্রম দানে রেক্টর মহোদয় সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। একাধিক সভায় ও বিজ্ঞপ্তিতে তিনি আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের প্রত্যেকের স্বেচ্ছাশ্রমের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এক ব্যক্তিগত আবেদনে তিনি প্রত্যেককে এ ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে অনুরোধ জানান। তাঁর ভাষায় প্রত্যেককে— "মালী হয়ে কাজ করতে-হবে"। ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রধান মালী হিসাবে কাজ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত আছেন বলেও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। আবেদনের পাশাপাশি এব্যাপারে কর্মোদ্যমীদের পুরস্কৃত করার

কথাও তিনি ঘোষণা করেন। রেক্টর মহোদয়ের নির্দেশনা, অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহ প্রদান এক্ষেত্রেও দ্রুত ইপ্সিত ফল প্রদান করেছে।

কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের উদ্যোগে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে প্রতিটি অফিস ভবনের চারপাশে কুঞ্জ বন সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে ইতোমধ্যেই ক্যাফেটারিয়া ও ডরমিটরীর কর্মচারীবৃন্দ ২নং ডরমিটরী ভবনের সামনের লিচু গাছ সমূহের পরিচর্যা ও সার প্রদানের কাজ সম্পন্ন করেছেন। এমনিভাবেই প্রশাসন অধিশাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ প্রশাসন ভবনের চারপাশে বৃক্ষরোপনের প্রাথমিক কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন করেছেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমে। কেন্দ্রের চত্বরকে ২০টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে এবং এই ২০টি ব্লকের গাছপালার সুস্থু পরিচর্যা ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে স্বেচ্ছাশ্রমদানকারী বিভিন্ন কর্মকর্তার ওপর, যারা নিজ নিজ দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাভিত্তিতে।

আশা করা যায়, নিজের কাজ নিজে করার মহতী আদর্শে অনুপ্রাণিত কেন্দ্রের ৪০৬ জন কর্মকর্তা কর্মচারীর ৮১২টি বলিষ্ঠ হাতের কর্মোদ্যোগ কেন্দ্রকে নতুন সাজে সাজাতে সুদুর প্রসারী ভুমিকা রাখবে। আর এই উদ্দীপনা ও উদ্যোগের বাস্তব উদাহরণ অনুপ্রাণিত করবে কেন্দ্রে আগত প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদেরও। কোন কাজই ছোট নয় এবং নিজেদের কাজ নিজেরা করার মধ্যে কোন হীনমন্যতার অবকাশ নেই। এদৃষ্টান্ত কেন্দ্রে প্রশিক্ষণে আগত হাজার হাজার কর্মকর্তাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লাঞ্ছিত ভাগ্যাহত মানুষের সেবক হিসাবে দায়িত্ব পালনে ও কায়িক মর্যাদা দানে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে আরো বেশী ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে এ প্রত্যাশা একেন্দ্রের প্রত্যেক কর্মকর্তা কর্মচারীর।

কেন্দ্র পরিক্রমা–২

ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের স্বপ্নদ্রষ্টাদের সমাবেশ

—মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

১৯ বৈশাখ ১৩৯৭ (৩ মে ১৯৯০) বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল – আগামী দশকে দেশের শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন কেন্দ্রের ভূমিকা –শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থাপন মন্ত্রনালয়ের সচিব জনাব কে, এম, রব্বানী।

কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকারী ভূতপূর্ব রেক্টর, পরিচালন পর্ষদ সদস্য এবং প্রকল্প পরিচালকগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। দেশের এ সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং প্রধান প্রশাসক গণ আমাদের প্রশিক্ষণে অসুবিধা সমূহ, নিজনিজ কর্মকালীন সময়ে পিএটিসিকে তারা কিভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন—সেক্ষেত্রে তাদের সাফল্য এবং ব্যর্থতা কি ছিল এবং আগামী দশকে প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিপিএটিসি কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই অনুষ্ঠানটি বিপিএটিসির স্বপ্নদ্রষ্টাদের এক সম্মিলনীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এতে অংশ নিয়েছিলেন কেন্দ্রের প্রথম রেক্টর ডঃ শেখ মাকসুদ আলী, প্রথম প্রকল্প পরিচালক জনাব এইচ, টি, ইমাম, কেন্দ্রের প্রাক্তন রেক্টরের দায়িত্বপালনকারী জনাব এম, আনিসুজ্জামান (অবসরপ্রাপ্ত সচিব), জনাব হেদায়েতুল হক (বর্তমান জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত), জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান (বর্তমানে প্রতিরক্ষা সচিব)—প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ।

উদ্বোধনী অধিবেশন

সকাল ১০ঃ৩০ মিঃ

স্বাগত ভাষণের সংক্ষিপ্ত সার ঃ

কেন্দ্রের রেক্টর জনাব এ, জেড, এম, শামসুল আলম ষষ্ঠপ্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে আগত প্রধান অতিথি, স্থানীয় সংসদ সদস্য, বোর্ড অব গভরণর্সের সদস্য বৃন্দ, সংস্থাপন

মন্ত্রনালয়ের সচিব, কেন্দ্রের প্রাক্তন রেক্টর, এম, ডি, এস, বৃন্দ, প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ, গণ মাধ্যমের প্রতিনিধিবর্গ, অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ও কেন্দ্রের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রতি সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

তিনি কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সুযোগের একটি খতিয়ান তুলে ধরে জানান যে, বিগত ৬ বছরে কেন্দ্র ১২০টি বিভিন্ন কোর্সের মোট ৫৭৫১ জন কর্মকর্তাকে এবং ৪টি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৬১৭ টি কোর্সের মোট ১৪,০২৯ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এছাড়া লোক প্রশাসনে অনুভূত বিভিন্ন বাস্তব সমস্যা সমাধানে কেন্দ্র এ যাবৎ ৩৩টি গবেষণা কর্ম পরিচালনা ও বিভিন্ন বই পত্র ও জার্ণাল প্রকাশ করেছে। তিনি বর্তমানে সরকারী চাকরিতে মেধাবীদের অন্তর্ভুক্তির স্বল্পতা এবং নিয়োগ বৃদ্ধির ফলে সরকারের ব্যাপ্তির কথা উল্লেখ করেন। কেন্দ্রের বর্তমান অবয়বে যথাসময়ে ক্যাডার সার্ভিসের নব নিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভবপর নয় বলে তিনি জানান— ৪ মাস মেয়াদী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সকে ২মাস মেয়াদী করা এবং কেন্দ্রের স্বাভাবিক লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩ গুণ লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করেও বছরে ১ হাজারের বেশী কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া কেন্দ্রের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছেনা। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এ কারণে আরও ১১টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব অর্পন করেও অপ্রশিক্ষণের জের কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। ফলে অনুর্ধ ৪৫ বছর বয়স্ক ৮৪৫৪ জন বি,সি,এস কর্মকর্তা এখনও প্রশিক্ষণ পাননি। এজন্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে কেন্দ্রের ভৌত অবকাঠামো লোকবল ও আনুসঙ্গিক প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা কামনা করেন।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানটিকে নিছক আনন্দানুষ্ঠানে পরিণত না করে কেন্দ্রের সাবেক রেক্টর, এম, ডি,এস, ও প্রকল্প পরিচালক বৃন্দকে তাঁদের আমলের সাফল্য ও ব্যর্থতার খতিয়ান এবং আকাংখা ও ভবিষ্যত দিক নির্দেশনা সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য আহবান করে রেক্টর মহোদয় বলেন এভাবে আমরা সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও দিক নির্দেশনা নিয়ে আগামী দশকে কেন্দ্রটিকে সাফল্যের উন্নত শিখরে স্থাপন করাতে চাই। তিনি প্রাক্তন এম, ডি, এস, ডঃ আকবর আলী খানের (বর্তমানে ইকনমিক মিনিষ্টার , বাংলাদেশ দূতাবাস, ওয়াশিংটন) বিগত এপ্রিল মাসে কেন্দ্রে আগমন ও সুদীর্ঘ আট ঘন্টা প্রদত্ত পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা মূলক ভাষণের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

সাবেক, রেক্টর এম,ডি, এস, ও প্রকল্প পরিচালকদের প্রদত্ত শ্রম ও ত্যাগের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে রেক্টর মহোদেয় তাঁদের সকলকে অভিনন্দন জানান ।

প্রধান মন্ত্রী জনাব কাজী জাফর আহমদঃ

প্রধান মন্ত্রী ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কাজী জাফর আহমদ, কেন্দ্রের রেক্টর মহোদয়, সংসদ সদস্য ও উপস্থিত সুধীবৃন্দকে সম্বোধন পূর্বক বাংলাদেশের সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারার জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি কেন্দ্রের বর্তমান কর্মকর্তা / কর্মচারী বৃন্দকে এবং অতীতে যাঁরা এই কেন্দ্রকে শ্রম দিয়ে তিলে তিলে গড় তুলেছেন, তাঁদের সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ও মন্ত্রীত্বের সময়ে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন ইংরেজী "এডমিনিষ্ট্রেশন" শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ প্রশাসন নয়। বাংলা অনুবাদে 'Administration' অর্থে সেবা শব্দটি বাদ চলে গেছে। বিভিন্ন সময়ে পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ থাকার ফলে জনগণের সেবা করার মানসিকতাপ্রশাসকদের অর্জিত হয়নি। ফলে সাধারণ জনগণের সাথে তাঁদের দূরত্ব বেড়ে গেছে। সাধারণ মানুষ প্রশাসকদেরকে তাই তাদের সেবক বা বন্ধু মনে না করে বরঞ্চ প্রভু বলে ভাবে এবং দূরত্ব বজায় রাখে। অবশ্য কতিপয় ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দৃষ্টিগোচর হয়।

সচিবালয়ের দীর্ঘসূত্রিতা ও আমলা তান্ত্রিকতার কথা উল্লেখ করে প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, সাধারণ মানুষ বাংলাদেশ সচিবালয়কে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে। কেননা, বিগত ৮৮ সালের মহা প্লাবনের সময় সচিবালয়ের পরিবর্তে জেলা সমূহ প্রশাসনের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছিল। তার ফলে বন্যাপীড়িত মানুষের নিকট সাহ্যায্য ও নির্দেশাবলী দ্রুত পৌছেছে, আমলা তান্ত্রিকতার লাল ফিতায় সিদ্ধান্ত গুলো বিলম্বিত হবার সুযোগ পায়নি। এই প্রসংগে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা হতে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক বিলম্বএবং মংলা বন্দরের কর্মচারীদের জন্য ৪টি বাস কেনার সিদ্ধান্তের দীর্ঘ সুত্রিতা উল্লেখ করে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বাংলাদেশে প্রশাসকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কালক্ষেপন ও প্রলম্বিত দীর্ঘ সূত্রিতায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে প্রশাসনকে সুশৃংখল ও চরম নিয়মতান্ত্রিক করার নামে বর্তমানে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া আমাদের দেশে চালু আছে তার ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়, তাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়না। অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বাংলাদেশে— বিভিন্ন দেশ যখন এগিয়ে চলেছে— তখনও আমরা দীর্ঘ সূত্রিতা নীতি আঁকড়ে ধরে বসে আছি। তাই এর পরিবর্তন প্রয়োজন এবং আরো প্রয়োজন সঠিক ব্যবস্থাপনার।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দিয়েই প্রশাসন গড়ে উঠেছিল। কতিপয় বিদেশী এদেশকে শাসন করতো তাদের সুবিধার্থে শৃংখল—আবদ্ধ রেখে। তখন তারা এদেশীয় প্রশাসকদের অবিশ্বাস করতো বলে বজ্র আঁটুনী দ্বারা প্রশাসন তৈরী করেছিল। সময় পাল্টেছে, আমরা স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু প্রশাসনের সেই ধারা আজও চালু আছে। সুতরাং প্রশাসনের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। তবে সেই পরিবর্তন প্রশাসকদেরকে বাদ দিয়ে নয়। তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে সবাই মিলে এই কাংখিত পরিবর্তন আনতে হবে। প্রধান মন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর যে কোন দেশের তুলনায় এদেশে যথেষ্ট যোগ্য প্রশাসক রয়েছেন। কিন্তু প্রশাসনিক নিয়ম নীতির জটিলতার কারণে জনগণ তাদের কাংখিত প্রশাসনিক সুফল পাচ্ছেনা। তিনি নিজেকে সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত করে দাবী না করে আহবান জানান যে, এই ৫৫ হাজার বর্গমাইলে কাংখিত উন্নয়ন ও কল্যান প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের লোক আজও যুথবদ্ধ ভাবে বাস করতে ভালবাসে। তাদের মধ্যে খুব একটা ভেদাভেদ বা সম্পর্কের প্রাচীর নেই। 'এরিসটোক্রেসি' বাংলাদেশে খুব একটা বেশী নেই। তাই এদেশে প্রচেষ্টা চালালে প্রশাসন কে গতিশীল করা সম্ভব। যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে উপজেলা পদ্ধতি সৃষ্টির মাধ্যমে। প্রথমে অনেকেই জনপ্রতিনিধির অধীনে প্রশাসকদের কাজ করার পরিমণ্ডল সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। বর্তমানে সে সব সন্দেহের অবসান হয়েছে এবং উপজেলা প্রশাসন স্বাভাবিক গতিতে চলছে। ঠিক সেই ভাবে সচিবালয়কেও সচল করার উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত করতে হবে। দীর্ঘ সূত্রিতার অবসান ঘটাতে হবে। ৭ দিনের পথ পরিক্রমাকে কমিয়ে ১দিনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে উম্মুক্ত একটি হল ঘরের মধ্যে সচিবালয় স্থাপনের মত দূরত্ব কমানোর উপায় বের করতে হবে।

তিনি বলেন বদ্ধঘরে আলোচনা বা বিতর্ক করে লাভ নেই। জনকল্যানে প্রশাসনকে আনতে হলে দীর্ঘ সূত্রিতা পরিহার করার এই বিশ্বাস সকল প্রশাসকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাদেরকে দ্রুত গতিতে চলতে হবে। আজ আমরা আর কেউ বিদেশী নই, কারও নীল রক্ত নেই। আমরা সবাই এই দেশের সন্তান। দেশকে গড়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করার উদাত্ত আহবান জানিয়ে তিনি বলেন "আমরা ভাবতে শিখি যে, আমরা প্রশাসক নই, আমরা জনগণেরই একজন।"

প্রধান মন্ত্রী পরিশেষে বলেন যে, প্রশাসনকে সচল করার এবং জনগণের কল্যান করার মানসে প্রশাসকগণ যদি কাজ না করেন, তাহলে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এরূপ

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে কোন লাভ হবেনা। বরঞ্চ তা এই গরীব দেশের ঋণের বোঝাকেই আরও বাড়িয়ে তুলবে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনঃ

প্রথম অধিবেশনের শেষে কেন্দ্রের পরিচালন পর্ষদ সদস্য ডঃ ইকরামুল আহসান উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ও সমবেত সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন

দুপুর ঃ ১২ঃ৪৫ – ১৪ ঃ ৩০ মিঃ

সভাপতিঃ জনাব কে, এম, রব্বানী, সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

বিষয়ঃ 'আগামী দশকে প্রশিক্ষণে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমিকা '।

বক্তাঃ জনাব এ, কে, এম, হেদায়েতুল হক
(জাপানে নিযুক্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
মাননীয় রাষ্ট্রদূত ও বিপিএটিসির প্রাক্তন রেক্টর)

সভার সভাপতি, কেন্দ্রের রেক্টর ও অন্যান্য অভ্যাগতদের সম্বোধন করে বলেন যে, আড়াই বছর পরে বিপিএটিসি চত্বরে এসে তিনি অভিভূত হয়েছেন। তাঁর ৩১ বছরের চাকরি জীবনের সবচেয়ে ভাল সময় কেটেছে এই কেন্দ্রে এবং তিনি সবচেয়ে নিবেদিত প্রাণ কর্মকর্তা/কর্মচারী পেয়েছিলেন এই কেন্দ্রে। তিনি কেন্দ্রের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

– তিনি এই কেন্দ্রকে বাংলাদেশে লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, চাকুরীতে এই কেন্দ্রের রেক্টর হয়ে আসার পূর্বে তাঁর দীর্ঘদিনের চাকুরীগত প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজের প্রথম সুযোগ বি পি এ টি সিতেই পান।

– প্রশাসনের সংগে মানুষের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের মাঝে বিরাজমান শূন্যতাকে পূরণ করাই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য। তিনি বিপিএটিসিতে এসে দেখতে পেয়েছেন

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

আমাদের জাতীয় জীবনেও আমাদের প্রশাসনের সাথে যোগাযোগের ব্যবধান রয়ে গেছে। এই সত্যটি তিনি এখানে এসে উপলব্ধি করেন। একজন প্রশাসকের সংগে অপর একজন প্রশাসকের সহমর্মিতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রশাসনকে গতিশীল করা সম্ভব। এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি এই কেন্দ্রে সরকারী কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। তিনি প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণের ফলাফল সম্পর্কে ফলো – আপ প্রক্রিয়া চালু রেখেছিলেন। কেননা তিনি মনে করেন ফলো–আপ ছাড়া কোন প্রশিক্ষণ হয় না। তাঁর সময় এক বছর পর প্রশিক্ষণার্থীগণ ৩ দিনের একটি 'রিফ্রেসার্স কোর্সে' কেন্দ্রে আসতেন। তখন তাঁদের নিকট থেকে প্রশিক্ষণের ফলপ্রসূতা, মাঠ পর্যায়ে অনুভূতি, প্রশিক্ষণ চাহিদা ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে নিয়ে প্রশিক্ষণের পরবর্তী কৌশল নির্ধারণ সহজতর হ্যেত। তিনি আনন্দিত যে এখনও সেই প্রক্রিয়া কেন্দ্রে চালু রয়েছে।

– প্রশিক্ষণার্থীদের খুব কাছাকাছি থেকে তাদের সংগে না মিশলে প্রশিক্ষণের উষ্ণতা অনুভব করা সম্ভব হয় না। এজন্য তিনি সপ্তাহে ৫ দিন এই কেন্দ্রে অবস্থান করতেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এভাবে কেন্দ্রে কর্মকর্তাদের অবস্থান প্রশিক্ষণকে আরো অর্থবহ করবে। বিপিএটিসিতে যে সমস্ত কোর্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেগুলো প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত কিনা তা দেখা প্রয়োজন। সরকারের ধ্যান – ধারণা, প্রশাসনের নিয়ম নীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে জ্ঞাত করে তুলতে হবে। সেই সংগে জনগণের আকাংখা এবং সরকারের নিয়ম নীতি এই দু'য়ের সমন্বয় ঘটাতে হবে। এ বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মের প্রসার ঘটাতে হবে। তিনি আনন্দিত যে, বর্তমান রেক্টর এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ এবং ১৯৮৫–৮৬ সালে আরম্ভকৃত গবেষণা কর্ম এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে গবেষণা প্রতিবেদন এদেশের কর্মকর্তারা তেমন একটা পড়তে চান না। তাই গবেষণা গুলোকে আকর্ষণীয় প্রাণবন্ত ও পাঠোপযোগী করে তোলার ওপর তিনি জোর দেন।

– প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থী সম্পর্ক মধুর করতে হবে। এবং প্রশিক্ষণ বিষয়টিকে 'টু ওয়ে চ্যানেলে' পরিণত করতে হবে। এজন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীর ভাব বিনিময় থাকতে হবে। তাঁর আমলে তিনি 'প্রশিক্ষণার্থী' শব্দটির পরিবর্তে অংশগ্রহণকারী শব্দটি চালু করেছিলেন, যাতে সহজে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষকদের সংগে মিশতে পারেন।

– ফিল্ড ষ্টাডি বা মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ প্রশিক্ষণে অত্যন্ত অর্থবহ ভূমিকা পালন করে। এই বিষয়টি জোরদার করা প্রয়োজন এবং ধীরে সুস্থে এর

আয়োজন করতে হবে।

– তাঁর আমলে কেন্দ্রের লাইব্রেরীটি কিছুটা এলোমোলো ছিল। বর্তমানে সমস্ত বইয়ের ক্যাটালগিং হয়ে গেছে। তিনি তাঁর আমলে প্রায় ২৫ হাজার পুস্তক ক্রয় করেছিলেন এবং লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, এটি তাঁর গর্বের বিষয়। তৎকালে লাইব্রেরী ও কেন্দ্রের খাবার ব্যবস্থা সকল প্রশিক্ষণার্থীর মূল্যায়নে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করতো। এ বৃহৎ লাইব্রেরীটি ব্যাপক ব্যবহারের বিষয়ে ভেবে দেখতে হবে। লাইব্রেরীতে 'পুস্তক পাঠ আবশ্যিক করার বিষয়ও চিন্তা করা যেতে পারে, যাতে ভবিষ্যতে সরকারী কর্মচারীদের পাঠ্যভাস বজায় থাকে।

– যে ধরনের প্রশিক্ষণে প্রশাসক ও জনগণ একাত্মবোধ করবে, সেরূপ প্রশিক্ষণই দেয়া উচিৎ। রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তথা গণপ্রতিনিধিদেরকে (যেমন এম, পি, নির্বাচিত চেয়ারম্যান) প্রশাসকদের সংগে একত্রে প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। প্রশাসকদের পাণ্ডিত্য যেন জনগণের নিকট থেকে ওদেরকে দূরে না সরিয়ে দেয়। অন্ততঃ পক্ষে প্রশাসক ও গণ প্রতিনিধিদের এই কেন্দ্রে আলোচনা সভা বা ভাব বিনিময় করার মত সুযোগের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দরকার। এর ফলে দেশের অনেক সমস্যা, অনেক জটিলতা দূর হতে পারে।

– তিনি সংস্থাপন সচিবের প্রতি এই কেন্দ্রের সকল সমস্যা সহানুভূতির সংগে দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি এই কেন্দ্রে তাঁর অবস্থান কালকে জীবনের সবচেয়ে সুখকর সময় আখ্যায়িত করেন। কেন্দ্রের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জীবনের সাফল্য কামনা করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বক্তা ঃ ডঃ শেখ মাকসুদ আলী
(কেন্দ্রের প্রথম রেক্টর)

– শেখ মাকসুদ আলী এই দিনটিকে তাঁর জীবনের মহা আনন্দের দিন বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি এই কেন্দ্রের জন্ম লগ্নে যখন রেক্টর নিযুক্ত হন, তখনকার স্মৃতি চারণ করে বলেন যে, নিপা, কোটা ও ষ্টাফ ট্রেণিং কলেজের প্রায় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীই তখন সাভারে নির্মিত এই কেন্দ্রে আগমনে বিমুখ ছিলো। তিনি ১৯৮৪ সালের ২৭শে এপ্রিল রেক্টর পদে নিযুক্তি লাভ করে এ তিনটি

প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে সাভারের এই কেন্দ্রে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করেন। কিছুটা আপত্তি থাকা সত্ত্বেও (মূলতঃ এ কেন্দ্রটি ১৯৮৫ সনের ডিসেম্বরে সাভারে আসার পরিবর্তে ১৯৮৪ সনের মে মাসে আসে) সবাই আসলেন এবং এই কেন্দ্রে কাজ আরম্ভ করলেন। তিনি আজ সুগভীর আনন্দ অনুভব করছেন যে, ঐ তিনটি প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা / কর্মচারী আজ একযোগে / একাত্ম হয়ে কাজ করছেন।

– তিনি প্রশিক্ষণ প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে,তাঁর জীবনের ১৪টি বছর প্রশিক্ষণ কার্মক্রমের সংগে অতিবাহিত হয়েছে। তবে তিনি বর্তমানে নিজেকে একজন ব্যর্থ প্রশিক্ষক মনে করছেন। কেননা, আজকাল বাংলাদেশে প্রশাসকদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমন্বিত করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া আরও অনেক বিষয় যা তিনি পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেন–সেগুলো পর্যালোচনা করে তিনি হতাশ হচ্ছেন যে, এত দীর্ঘকাল প্রশিক্ষণ দিয়েও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে সহনশীলতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যেমনঃ–

ক) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গিয়ে অপ্রতুল অর্থের মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তাবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যাচ্ছে না। অথচ প্রশিক্ষণে সমন্বয়ের কথাই বার বার শিক্ষা দেয়া হয়। বিভিন্ন সেক্টর বা দপ্তরের মধ্যে আন্তঃসমন্বয় ও আন্তঃ নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। ফলে দেশের সম্পদের অপচয় হয়।

খ) উপজেলা পর্যায়ে "ডিসেন্ট্রেলাইজড পারটিসিপেটরি প্লানিং" করার কথা সরকার থেকে বহুবার বলা হচ্ছে। কিন্তু কার্য্যত তা হচ্ছে না। মৎস্য বিভাগ, কৃষি বিভাগ, পশু সম্পদ বিভাগ এগুলোর মধ্যে কোন প্রকার সমন্বয় নেই। ফলে সম্পৃক্ত কার্যক্রম ও প্রকল্প গ্রহণ হচ্ছে না।

গ) প্রাইভেট সেক্টর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কোন্ নীতি ও কৌশলে এই সেক্টরকে পরিচালনা করার অধিকতর যৌক্তিক ও কল্যানকর করা যাবে সে বিষয়ে কর্মকর্তারা কোন প্রকার তথ্য বা পরামর্শ দিচ্ছে না।

ঘ) গ্রামাঞ্চলের বেশীর ভাগ উন্নয়ন এন, জি, ও, (বেসরকারী প্রতিষ্ঠান) –র হাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য সকল মহল থেকে জোর তাগিদ আসছে। কেননা

সরকারী কর্মকর্তাগণ সুচারুরূপে গ্রামোন্নয়নের দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না—এই অভিযোগ সর্বত্র। কিন্তু সরকারী কর্মকর্তাগণ দুঃসাহস নিয়ে এগিয়ে এসে বলছেন না যে, আমরাই গ্রামোন্নয়নে সর্বতোভাবে সক্ষম। বা তাঁরা এন, জি, ও, দের তুলনায় সার্থক ভাবে কাজ করতে পারবেন– এরূপ অংগীকার দেখা যাচ্ছেনা।

ঙ) মহিলাদের উন্নয়নের কথা বারবার আসছে। কিন্তু কিভাবে দেশের সর্ব পর্যায়ে মহিলাদের উন্নয়ন করা যাবে– সে বিষয়ে কেউ কোন স্বচ্ছ বক্তব্য পেশ করেন না। এমনকি মন্ত্রী পরিষদ থেকে সুস্পষ্ট কোন নীতিমালা বা নির্দেশ আসেনা।

– তিনি বলেন, উপরোক্ত বক্তব্য থেকে সহজেই ধারণা করা যাবে যে বাংলাদেশে কিরূপ প্রশাসনিক ধারা বিরাজমান। প্রশাসকগণ যদি উৎপাদনের উপাদান জনসাধারণের নিকট পৌছে দেয় এবং জনগণের অন্তর্নিহিত গতিশীলতাকে পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গণ্য করে, তবে যেরূপ প্রশাসন প্রয়োজন, বর্তমানে সেরূপ প্রশাসন নেই। তাহলে আকাংখা বাদ দিতে হবে অথবা প্রশাসন পাল্টাতে হবে। এরই ভিত্তিতে বিপিএটিসি'র লক্ষ্য রাখা উচিৎ যে, কি ধরনের পশিক্ষণ পাঠ্যক্রম গড়ে তুলতে হবে এদেশের সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য।

বক্তাঃ জনাব এইচ, টি, ইমাম
(কেন্দ্রের প্রথম প্রকল্প পরিচালক)

কেন্দ্রের জন্মের ৬ বছর পর প্রাক্তন সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে একত্রে আহবান জানানোর জন্য তিনি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাঁর আলোচনা আরম্ভ করেন। জনাব ইমাম মূলতঃ তাঁর স্মৃতিচারণা দিয়ে বক্তব্য আরম্ভ করেন এবং কেন্দ্রের মাঝে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন। তিনি বিপিএটিসির জন্মের পূর্বে১৯৭৭ সাল থেকে এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রথমে এই কেন্দ্রটিকে "পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন ট্রেণিং কমপ্লেক্স" হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং নিপা, কোটা ও ষ্টাফ কলেজের নিজস্ব সত্তা বজায় রেখে একই কমপ্লেক্সের মধ্যে অবস্থান করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানের বিপিএটিসির রেক্টর ভবন, অনুষদ ভবন-১ ও অনুষদ ভবন-২ এই ৩টি ভবন উক্ত ৩টি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ভবন হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিলো।

এ তিনটি প্রতিষ্ঠানের তখন কেউই এখানে আসতে রাজী ছিলেন না। অনেক আলাপ আলাচনার পর নিপা ও কোটা এখানে আসতে রাজী হলেও ষ্টাফ কলেজ বহুদিন পর্যন্ত রাজী হয়নি। ১৯৮৩ সালে 'মার্শাল ল' জারী হবার পর একবার 'পিএটিসি' র প্রকল্প বাতিল করার কথা উঠে। পরে প্রকল্পটি টিকে থাকে এবং 'এনাম কমিটি' উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক পদ সৃষ্টি করে।

যে স্থানে আজকে কেন্দ্রটি অবস্থিত, এটি মূলতঃ সরকারী খাস জমি ছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এই জমি জবর দখল করে রাখে। শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পুর্বক এই জমি হস্তান্তর করে। তখন এই এলাকা বেশ উঁচু নীচু ছিল। দেখতেও ছোট মনে হতো। এলাকার উঁচু নীচু জমি সমতল করার পর বেশ বড় স্থান হয়।

পরিকল্পনা গ্রহণে ও স্থপতি নির্বাচনে প্রথম দিকে বেশ জটিলতা ছিল। শেষাবধি দেশী স্থপতি দ্বারা নকশা নির্মিত হোল। তবে রেক্টরের বাসা নির্মাণে কিছুটা রদবদল হয়ে গিয়েছিলো। প্রচুর আলো বাতাস অবাধে বিচরণ করার নিমিত্তে দূরে দূরে ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল। ফলে বড় বড় করিডোর দ্বারা সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। নাহলে সবুজ মাঠ ও উম্মুক্ত এলাকা রাখা যেতো না। বিদ্যুৎ বিভগকে অনুরোধ করে একটি সাব ষ্টেশন নির্মাণ, গ্যাস বিভাগের নিকট থেকে গ্যাস লাইন এবং টেলিফোন বিভাগকে অনুরোধ করে সরাসরি ঢাকা–সাভার টেলিফোন লাইন সংযোগ হয়। সরকারী অর্থে প্রতিটি বাসায় ফ্যান ও গ্যাসের চুলা লাগানো হয়। এসব বিষয়ে তৎকালীন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন।

প্রথমতঃ বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তির সময়ে এই কেন্দ্রটিকে "গাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশন ট্রেণিং, মেনেজমেন্ট এণ্ড কেরিয়ার প্লানিং সেন্টার" করার কথা উল্লেখ ছিল। কিন্তু পরে সরকারী সিদ্ধান্তে এটি –"পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশন ট্রেণিং সেন্টার"– এ রূপায়িত হয়। ফলে কেন্দ্রটি প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় যতটা স্বাবলম্বী হবার কথা ছিল, তা হতে পারে নি।

প্রথম দিকে চুক্তি ছিল (আইপিএ)র সঙ্গে যে, প্রশিক্ষণর্থীগণ এই কেন্দ্রে কিছু দিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ওয়াশিংটনে গিয়ে আইপিইতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে এবং পরে ফিরে এসে আবার এইকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। কিন্তু পরে এরূপ চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারের সেরা প্রশাসকদের বেশীর ভাগই এই প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হয়েছেন। এবং কেন্দ্রটিকে শ্রম দিয়ে তাঁরা দ্রুত গড়ে তুলেছেন।

বক্তাঃ জনাব ফজলুল হাসান ইউসুফ
(কেন্দ্রের প্রাক্তন এম, ডি, এস)

তিনি কেন্দ্রের জন্ম লগ্নের ইতিহাস নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন এবং এই কেন্দ্রের সৃষ্টির পেছনে সরকারী অর্থ ব্যয়ের সাশ্রয় সম্পর্কে সুক্ষ্ম কারণ বর্ণনা করেন।

তাঁর মতে এই উপ–মহাদেশে বৃটিশের সৃষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতেই ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কেবল মাত্র বাংলাদেশেই তার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে একত্রীকরণপুর্বক ইংরেজে সৃষ্ট প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়। এর ফলে নিপা, কোটা ও ষ্টাফ কলেজের আলাদা আলাদা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা নষ্ট হয়েছে বটে, তবে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি সমন্বিত ও সুসংহত একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং স্বকীয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

"সেন্টার অব এক্সেলেন্স" হিসেবে এই কেন্দ্রের সাফল্য রক্ষা করতে চাইলে কেবলমাত্র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দিয়ে তা অর্জন করা যাবে না। এর জন্য দুটো বিষয় সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। তা হলোঃ—

(১) প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন, এবং

(২) প্রশিক্ষণোত্তর প্রায়োগিক ফলাফল সম্পর্কে বাস্তব গবষেণা।

তাঁর মতে, যে কোন প্রশিক্ষণ যদি পূর্ণতা পেতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই যুগ ও চাহিদার উপযোগী হতে হবে। তার মধ্যে সর্বদা পরিবর্তনশীলতা থাকতে হবে। আর এই "চাহিদা নিরূপন" কার্যক্রমের জন্য শক্তিমান একটি গবেষণা বিভাগকে সর্বদা তৎপর থাকতে হবে। কেন্দ্রের "এক্সটারন্যাল ইমেজ" যদি বৃদ্ধি করতে হয়, তা হলে সমস্ত বাস্তব গবেষণা সকলের নিকট প্রকাশের জন্য প্রকাশনা বিভাগকে কার্যকর থাকতে হবে।

এখন সময় এসেছে, কেন্দ্র তার প্রকাশনা শক্তিকে সর্বোতোভাবে ব্যবহার করবে। যদি তা না করা হয় তা হলে সকলের নিকট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অজ্ঞাত থেকে যায়। প্রশিক্ষকদের নিজস্ব প্রকাশনা থাকতে হবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কেন্দ্রের অনুষদ ও প্রকাশনা বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

এছাড়া সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পরামর্শ দান ও কেন্দ্রের একটি যথার্থ কাজ বলে বিবেচিত হতে হবে। সংস্থাপন মন্ত্রনালয় যদি প্রশাসনকে গতিশীল করার জন্য কোন প্রকার উপদেশ বা পরামর্শ চায়, কেন্দ্র কর্তৃক যথার্থ পরামর্শ প্রদান করতে হবে। তাহলেই এই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তার সার্থকতা খুঁজে পাবে।

বক্তাঃ এ, এম, এম,বাহাদুর মুন্সী
(কেন্দ্রের প্রাক্তন এম, ডি, এস,)

জনাব মুন্সী কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করেন। অবসর জীবনের শেষ কর্মস্থলে একটি দিনের জন্য আসতে পেরে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে উঠেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তাদের কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া বাঞ্চনীয় সে সম্পর্কে আলোচনা করেন।

তাঁর মতে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবেঃ—

(১) কর্মকর্তাদের মাঝে প্রকৃত ও যথার্থ সেবক ও কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার মানসিকতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে,

(২) নৈতিকতা ও মুল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। যার ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে এবং দুর্নীতির আশ্রয় থেকে মুক্ত থাকে,

(৩) কর্মকর্তাদের মনে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে,

(৪) ন্যায় পরায়নতা ও পক্ষপাতিত্বহীনতা শিক্ষা দিতে হবে। যদিও বলা হয় আইনের চোখে সকলেই সমান, কিন্তু কার্যতঃ তা বাস্তবায়ন করা হয় না। নিরপেক্ষতা বজায় না রাখা হলে প্রশাসন অকার্যকর হয়ে যাবে,

(৫) আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত করে তোলা, যেন একজন কর্মকর্তা সর্বদা নীতিবান থাকেন এবং সত্য কথা বুক ফুলিয়ে বলতে পারেন,

(৬) শিখবার মনোভাব তৈরী করে দেওয়া। কেননা, যে সকল কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে থাকেন তাদেরকে কোন কিছু শেখানো দুস্কর। তাই যেন নিজেরাই কোন বিষয় শিখতে চেষ্টা করেন – সেই মনোভাব তাদের মাঝে তৈরী করতে হবে,

(৭) কর্মকর্তাদের মনে স্বনির্ভরশীলতা সৃষ্টি করা। বর্তমানে একজন কর্মকর্তা আত্মনির্ভরশীল না হয়ে সর্বদা তাদের অধীনস্থদের সহায়তা গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এই বিষয় থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে হবে,

(৮) কর্মকর্তাদের মাঝে জবাবদিহীতার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। তিনিও যে আইনের অধীন এবং খেয়াল খুশীমত কোন কিছু তিনি করতে পারবেন না এই বোধ তার মনে জাগ্রত করতে হবে,

(৯) অহমিকা ও অহংকার দুর করতে হবে। জনগণের সেবক এই মুল বাক্য তারা যেন ভুলে না যান,

(১০) কর্মকর্তাদের মধ্যে মিতব্যয়িতার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে ক্রমাগত বাজার দরের উর্ধগতি এবং আগামী দশকে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেলে তারা দূর্নীতি পরায়ন হয়ে উঠবে। এই বিষয়ে একজন কর্মকর্তা যদি আরেকজন কর্মকর্তার অমিতব্যয়িতা ধরিয়ে দেন, তাহলে দূর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে,

(১১) কেন্দ্রের গবেষণা শাখাকে আগামী দশকে প্রশাসনে কি কি সমস্যা আসতে পারে এবং কিভাবে তার মোকাবেলা করা সম্ভব সে বিষয়ে এখনই গবেষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে,

(১২) প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ করে এবং যাতে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ঐ তিনটি ক্ষেত্রের ঐক্য সাধন সম্ভব পর হয়, এরূপ ভাবে তৈরী করতে হবে,

(১৩) প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে জানার আগ্রহ ও জ্ঞানার্জনের প্রতি সর্বদা ধনাত্মক মনোভাব পোষণের মত প্রশিক্ষণ দিতে হবে,

(১৪) সরকারী কর্মকর্তাগণ যেন দেশীয় সম্পদ ব্যবহারকে প্রধান্য দেন এবং সরকারী ক্ষেত্রে ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে দেশীয় সম্পদ ব্যবহারকে সবার নিকট দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রকাশ করেন, সেই ভাব তাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে, এবং

(১৫) কর্মকর্তাদের "কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট" এর ক্ষেত্রে কেন্দ্র কর্তৃক গবেষণা ও

সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। যাতে সকল কর্মকর্তা তার নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী থাকেন।

বক্তাঃ ডঃ এ,টি,এম,শামসুল হুদা
(কেন্দ্রের প্রাক্তন এম, ডি, এস,)

ডঃ হুদা তাঁর বক্তব্যে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভুমিকা নির্ধারণের বিষটিকে যুগপৎ জটিল ও বিবর্তনসাপেক্ষ বলে অভিহিত করেন। এই কেন্দ্রের লক্ষ্য, আদর্শ ও পদ্ধতি সম্পর্কে কেন্দ্রের মূল উদ্যোক্তাদের একধরনের ধারণা ছিল। সেই ধারণার অনুসরণে বেশ কিছু ভৌত অবকাঠামো ও নির্মাণ করা হয়েছিল। পরে কেন্দ্র চালু হওয়ার পর সেই সমস্ত ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে তাত্বিক ধারণা ও রূঢ় বাস্তবতার সংঘাত পরিস্কার হয়ে উঠে।

উদাহরণ স্বরূপ ডঃ হুদা একই ক্যাফেটারিয়া/ডাইনিং হলে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের খাবার গ্রহণের ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে মূল উদ্যোক্তাদের ধারণা ছিল যে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ স্তরভেদ উপেক্ষা করে নির্বিঘ্নে একে অন্যের সাথে মেলামেশা করতে পারেন।

উপরোক্ত ধারণা যে কতটা ভুল —তা প্রথম সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স শুরু হলেই তীব্রভাবে কেন্দ্র অনুভব করতে পারল। যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কোন ক্রমেই সকলের সাথে একই ধরনের খাবার গ্রহণে সম্মত হননি। মধ্যসোপানের বিষয়টি বাদ দিলেও বয়সের তারতম্যের কারণেও যে খাদ্যের বিভিন্নতা প্রয়োজন এ সত্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে ধরা পড়ে।একইভাবে সর্বস্তরের স্বচ্ছন্দে মেলামেশার ধারণাটিও বাস্তবতা বিবর্জিত। কর্মক্ষেত্রে পদসোপানের বিভিন্নতা বেশ নিগূঢ়ভাবেই প্রতিপালিত হয় শুধু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই কেন এই বিষয়ে ব্যতয় কামনা করা হয়— বোধগম্য নয়। আসলে আমরা সকলেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে বাস্তব কর্মজগত থেকে একটু বিচ্ছিন্ন করে দেখার চেষ্টা করি। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভুমিকা নির্ধারণে এ দৃষ্টিভঙ্গী একটি বিশেষ অন্তরায়।

ডঃ হুদা এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে প্রশাসনের বাস্তব অবস্থা, প্রথা, মুল্যবোধ ও প্রচলিত নিয়ম কানুনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করা উচিত। বিপিএটিসি–র সব ধরনের ক্রিয়াকাণ্ডে হাত লাগাবার লোভ সম্বরণ করতে হবে। যে প্রশিক্ষণ—পরিবার, প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কিংবা অন্যান্য পেশাভিত্তিক

সংগঠনের দায়িত্ব সেসব বিষয়ে বিপিএটিসির বিশেষ কিছু করণীয় নেই বলে তিনি মনে করেন। দেশের কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক ও প্রাত্যহিক কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে – এখানে নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর কিছু করার উদ্যোগ নেওয়ার মত সময় কেন্দ্রকে দেওয়া হয় না। প্রাপ্ত সময় ও সুযোগের মধ্যে কি কি বিষয়ে অগ্রাধিকার যোগ্য সেটি সঠিক ভাবে নির্ধারণ করাই কেন্দ্রের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

ডঃ হুদা মন্তব্য করেন যে, বর্তমানে বিশ্বের সকল দেশে উপযুক্ত উপাত্ত ছাড়া কোন তথ্য পেশ করা হয় না। আগামী দশকে বা একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশেও উপযুক্ত উপাত্ত ছাড়া কোন বক্তব্য গ্রহণীয় হবে না। তিনি কেস ষ্টাডির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, কেন্দ্র কর্তৃক ১০/১২ পৃষ্ঠার তথ্য ভিত্তিক কেস ষ্টাডি প্রণয়ন করে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা বাঞ্চনীয়। এই কর্মসূচী চালু আছে এবং তা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

পূর্বে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ সম্পর্কে ডঃ হুদার মনে বেশ নৈরাশ্য বিদ্যমান ছিল। কিছু দিন অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করে তাঁর সম্মুখে প্রশিক্ষণ থেকে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। এ থেকে তার ধারণা হয় যে ঐ সমস্ত প্রশিক্ষণের তুলনায় বিপিএটিসির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যেহেতু আরও বেশী যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক রয়েছে সেহেতু বিপিএটিসি র বুনিয়াদী কার্যক্রম অবশ্যই ফলপ্রসূ হচ্ছে।

বর্তমনে যে ১১টি প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, সেগুলোর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং মান সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে হবে। প্রয়োজনে, সে সব প্রতিষ্ঠানকে সর্বরকম সাহায্য ও উপদেশনার দায়িত্বও বিপিএটিসিকে গ্রহণ করতে হবে।

অতঃপর তিনি কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রতি ধন্যবাদ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

সভাপতির ভাষণঃ

সভাপতির ভাষণে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে, এম, রব্বানী কেন্দ্রের প্রাক্তন রেক্টর, এমডিএস, ও প্রকল্প পরিচালকবৃন্দকে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমন্ত্রণ জানানো এবং তাঁদের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য বর্তমান রেক্টর মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, শুধুমাত্র আনন্দ উল্লাস ও গান বাজনা দিয়ে দিবসটি

উদ্‌যাপন না করে—প্রাক্তন কর্মকর্তাদের স্মৃতিচারণ ও বি,পি,এ,টি,সি,র ভবিষ্যত সম্ভাব্য কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে দিনটি অতিবাহিত করা একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

তিনি মাঝে মাঝে এরূপ ভাবের আদান প্রদান ও মত বিনিময় তথা খোলাখুলি আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। অতঃপর তাঁকে এই অনুস্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকে এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনঃ

"আগামী দশকে প্রশিক্ষণে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিপিএটিসি'র ভূমিকা" শীর্ষক আলোচনা অধিবেশন শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রের পরিচালন পর্ষদের সদস্য জনাব মুহাম্মাদ আবদুস সোবহান। সর্ব প্রথমে তিনি শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থাপন সচিব জনাব এ,কে, এম, গোলাম রববানীকে যিনি দ্বিতীয় অধিবেশনের আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন। এই ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যোগ নিয়েছেন তার জন্য তিনি অশেষ ধন্যবাদ জানান কেন্দ্রের রেক্টর এ, জেড, এম, শামসুল আলমকে। এছাড়া দ্বিতীয় অধিবেশনে বিপিএটিসির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের প্রেক্ষপটের লক্ষ্যে যে সমস্ত প্রাক্তন রেক্টর ও এম, ডি, এস, গণ তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সর্বশেষ যারা এ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আয়োজন করেছেন তাঁদের সবাইকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

সাংবাদিক ও সুধী সমাবেশ

কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের প্রাককালে ২মে, ১৯৯০ তারিখ কেন্দ্রে এক সাংবাদিক—সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে রেক্টর জনাব এ,জেড, এম, শামসুল আলম এতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। সমাবেশের পূর্ণাঙ্গ বিররণ এখানে উপস্থাপন করা হোল।

রেক্টরের বক্তব্যঃ সম্মানিত সুধীজন ও সাংবাদিকবৃন্দ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর প্রাককালে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আজকের এই সুধী সমাবেশে আপনাদের জানাচ্ছি খোশ আমদেদ। ১৯৮৪ সালের ২৮ এপ্রিল, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ

লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) অধ্যাদেশ (নং XXVI, ১৯৮৪) এর মাধ্যমে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছরই ৩ মে তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কেন্দ্রটি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন।

২ আগামী কাল ৩ মে, ১৯৯০ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব কাজী জাফর আহমদ অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করবেন। গণ্যমান্য অতিথিদের নিয়ে আমাদের ব্যস্ততা বেড়ে যাবার কারণে সাংবাদিকগণের প্রতি পুরোপুরি দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগের অসুবিধার দিক বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর একদিন আগেই আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি, যাতে আপনাদের সংগে ভালভাবে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে, পাশাপাশি এই কেন্দ্রের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটা ধারণা আপনাদেরকে দেওয়া সম্ভব হয়।

৩. বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব ও সম মর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য সাবেক বাংলাদেশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ষ্টাফ কলেজ (বিএএসসি), উপ-সচিব ও সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক এ্যাডমিনিস্টেশন (নিপা), সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী (কোটা) এবং ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ষ্টাফ ট্রেণিং ইনষ্টিটিউট (এস টি আই)—এই ৪টি প্রতিষ্ঠান ছিল। এসব প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার, অডিটরিয়াম ইত্যাদির প্রয়োজনীয় সুবিধাদির অভাব ছিল। আশির দশকের শুরুতে প্রতিষ্ঠান চারটিকে একই ক্যাম্পাসে নিয়ে আসার চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। এই সূত্র ধরে বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ট্রেণিং কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করে সব প্রতিষ্ঠানকে একই ক্যাম্পাসে নিয়ে আসার ভাবনা চলে—যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একই মিলনায়তন, গ্রন্থাগার ইত্যাদি সুবিধা থাকবে। পরবর্তীতে প্রশাসনিক জটিলতা ও সেবা সুবিধাদির সমন্বয় সাধনের অসুবিধার আশংকা করে সব কটি প্রতিষ্ঠানকে একই প্রশাসনিক আওতায় একটি সমন্বিত ও একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ট্রেণিং কমপ্লেক্স থেকে 'কমপ্লেক্স' শব্দটি সেন্টার শব্দটির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

৪. ৫৪ একর এলাকা নিয়ে বিস্তৃত এই সমন্বিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বর্তমানে যুগ্ম সচিব ও সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের জন্য সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স, উপ–সচিব ও সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের জন্য উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের জ-ন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। এছাড়া স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন প্রশিক্ষণও এই কেন্দ্র প্রদান করে থাকে।

৫. ১৯৮০–র দশকে বিকেন্দ্রীকরণের ফলে সরকারের আয়তন অনেক বেড়ে যায়। পূর্বে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে ২৭ থেকে ২৭৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আশির দশকের শুরুতে ১৯৮৩ সালে ৬৫০ জন ১৯৮৪ সালে ৪৫০ জন ১৯৮৯ সালে ২১৮ জনকে নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সকল ক্যাডার মিলিয়ে ২৫০০ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সরকারের এই আয়তন বেড়ে যাবার ফলে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সময় ১৬০ শয্যা বিশিষ্ট ডরমিটরীকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনের জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল। বর্তমানে কেন্দ্র ১৬৮ জন কর্মকর্তার আবাসন সুবিধা দিতে সক্ষম। কেন্দ্রে বছরে ৪ মাস ব্যাপী ২.৫ টি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৪২০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব কিন্তু ব্যাক লগ এর কারণে বুনিয়াদী কোর্সের মেয়াদ কমিয়ে ২ মাস নির্ধারিত হয়েছে। এখন বছরে ৫টি বুনিয়াদী কোর্সে ৮৪০–১০০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

৬. ১৯৮৫ সালের হিসেব মত বাংলাদেশ সরকারের ৩০টি ক্যাডারে মোট নিয়োগ ক্ষমতা হচ্ছে ২৯,৪০০ । এই সংখ্যাকে মোটামুটি ৩০,০০০ ধরা যায়। প্রতিবছর অবসর গ্রহণ, চাকুরী ত্যাগ, মৃত্যু ইত্যাদি কারণে ৫% পদ শূন্য হয় বা পুরণ করার জন্য প্রতিবছর ১,৫০০ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়ার প্রয়োজন হয়। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সব ক্যাডার মিলিয়ে প্রতি বছর ১,৭৪৯ জনকে নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। গত কয়েক বছর ধরে প্রতিবছর গড়ে ২,০০০ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আর এই কেন্দ্রে ২ মাস ব্যাপী ৫টি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে প্রতি বছর ১,০০০ জনের বেশী কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা অর্থাৎ দেশের বৃহত্তম লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্বেও এই কেন্দ্র বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হচ্ছে না।

৭. প্রশাসনে অবক্ষয়ের কথা যা প্রায়শঃই শুনা যাচ্ছে, প্রশিক্ষণের অভাব তার একটা অন্যতম প্রধান কারণ। বর্তমানে যে সমস্যা দাঁড়িয়েছে তা হল সরকারী কর্মকর্তাগণের কাজের গুণগতমান ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। এটা সত্য । কিন্তু একজন লোক যদি তার ওপর অর্পিত নির্দিষ্ট কাজটি সম্পাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকে তাহলে তার পক্ষে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

উদাহরণ হিসেবে স্বাধীনতা পূর্বকালীন লাহোরের সিভিল একাডেমীতে ১৮ মাস মেয়াদী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের কথা বলা যায়। তখন সিভিল সার্ভিসে প্রতিবছর ১০/১২ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হত। কিন্তু বর্তমানে একদিকে ১৮ মাসের বুনিয়াদী কোর্স ২ মাসে নেমেছে আর অন্যদিকে নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থার কারণে সরকারী কর্মকর্তাগণ কার্যকর প্রশিক্ষণের অভাবে দক্ষতার সংগে তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হচ্ছেন না। এ প্রসংগে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ সম্পর্কে একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। একজন ম্যাজিষ্ট্রেট একজন আসামীকে ৩–৫ বছরের কারাদণ্ড ও ১,০০০– টাকা অর্থদণ্ড দিতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁদের আইন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ হচ্ছে ৩ মাস (স্বাধীনতার পূর্বে এর মেয়াদ ছিল ৯ মাস) প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। ফলে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে উর্ধ্বতন আদালেতে আপীলের মাধ্যমে আসামীরা খালাস পেয়ে যায় এবং অপরাধ সংঘটনে তারা আরো অধিক উৎসাহিত হয়।

৮. উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রশিক্ষণের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও কার্যকর ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সৃষ্টি Backlog এর কারণে বিপিএটিসি ছাড়াও ১৩টি বিভিন্ন ক্যাডারের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে বুনিয়াদী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বার্ড, আরডিএ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, নিয়েরার, সার্ডি, ওটিআই, বিএলআরআই রেলওয়ে একাডেমী, টেলিকম স্টাফ কলেজ, নিপোর্ট — ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। গত ৩১ জানুয়ারী ৯০ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, বিপিএটিসির ওপর ২,৮১৪ জন কর্মকর্তাকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ছিল তার মধ্যে ১,৬১০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যে তিনটি

প্রতিষ্ঠানকে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারভুক্ত ৩,৬৫৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা মাত্র ৫০৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানে সমর্থ হয়েছে। বর্তমানে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত ৮,৪৫৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ছাড়াই কর্মরত রয়েছেন। বিপিএটিসি যদি প্রতিবছর ১,০০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাহলে এই অপ্রশিক্ষণের জের (Backlog) শেষ হতে ৮ বছর সময় লাগবে।

৯. সাংবাদিক বন্ধুগণ, আমরা সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে কর্মজীবনের প্রস্তুতিমূলক যে তাত্ত্বিক জ্ঞান আহরিত হয় তার সার্থক প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণের। আপনারা জাপানের কথা জানেন। জাপানে একর প্রতি ধান উৎপাদিত হয় ৮ টন আর বাংলাদেশে ১ টন। যদিও আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা কৃষি সম্পর্কিত তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করেন কিন্তু প্রশিক্ষণের অভাবে তা দক্ষতায় রূপান্তরিত করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রয়োগ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক একটা সমস্যা হচ্ছে যে, এখানে শিক্ষার প্রতি যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয় প্রশিক্ষণকে ততটা নয়। গাড়ী চালনা কিংবা সাঁতারানোর জন্য শ্রেণীকক্ষে তাত্ত্বিক ধারণা নিলেই যেমন গাড়ী চালনা কিংবা সাঁতরানো সম্ভব নয় তেমনি শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তাত্ত্বিক জ্ঞান— বাস্তবে কাজে আসে না। এর জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। আমেরিকাসহ পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ততটা নয়। আমাদের দেশে মেকানিক্স কম ইঞ্জিনিয়ার বেশী, ডাক্তারের তুলনায় নার্সের সংখ্যা কম। তার মানে আমাদের জ্ঞানটা শুধুই তাত্ত্বিক থেকে যাচ্ছে। সীমিত সম্পদ ব্যয় করে যতটুকু তাত্ত্বিক শিক্ষা এখানে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে সেই শিক্ষাকে দক্ষতায় রূপান্তরিত করার জন্য খুব বেশী সচেতনা আমাদের মধ্যে নেই।

১০. কেন্দ্র পরিচালনার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বোর্ড অব গভর্ণরস। সভাপতিসহ মোট ১৩ জন সদস্যকে নিয়ে এই বোর্ড গঠিত। সরকারের মনোনীত একজন মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত বোর্ড অব গভর্ণরসের অন্যান্য সদস্যরা হলেনঃ— (১) মন্ত্রী পরিষদ সচিব, (২) সংস্থাপন সচিব, (৩) অর্থ সচিব, (৪) শিক্ষা সচিব,

(৫) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, (৬) সরকারের মনোনয়ন প্রাপ্ত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য, (৭) কমান্ড্যান্ট, ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজ, (৮) পর্যায়ক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের সভাপতি, (৯) বাংলাদেশ ফেডারেশন অব চেম্বারস এণ্ড কমার্সের সভাপতি, (১০–১১) সরকার মনোনীত একজন মহিলাসহ মোট দুজন সদস্য এবং (১২) রেক্টর, বিপিএটিসি।

১১. বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান হলেন রেক্টর যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। তিনি বোর্ড অব গভর্ণরসের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্ব নির্বাহ করেন। কেন্দ্রটি ৪টি প্রধান বিভাগে সংগঠিত। বিভাগগুলো হোল ঃ (১) ব্যবস্থাপনা ও লোক প্রশাসন, (২) উন্নয়ন অর্থনীতি, (৩) কর্মসূচী ও পাঠ্যক্রম এবং (৪) গবেষণা ও উপদেশনা। বিভাগীয় প্রধানগণ হচ্ছেন— এম, ডি, এস, যারা সরকারের যুগ্ম–সচিব বা তদুর্ধ পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা। প্রতিটি বিভাগকে কয়েকটি অনুবিভাগে এবং প্রতিটি অনুবিভাগকে কয়েকটি অধিশাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। অনুবিভাগের প্রধানগণ হলেন পরিচালক যারা সরকারের উপ–সচিব বা সমপর্যায়ের কর্মকর্তা। অধিশাখা প্রধান হিসেবে উপ–পরিচালকগণ দায়িত্ব পালন করেন। প্রতি অধিশাখাকে আবার একাধিক শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে।

১২. ১৯৮৪ সালে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ৬ বছরে ১২০ টি কোর্সে ৫,৭৫১ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে বুনিয়াদী পর্যায়ের ১৮টি কোর্সে ২,৮৫৯ জন, ১০টি উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সে ২১২ জন এবং ১০টি সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সে ১৮৩ জন, অন্যান্য স্বল্প মেয়াদী ৮২ টি কোর্সে ২,৪৯৭ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। যুগ্ম সচিব ও উপ সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কোর্সগুলোর মেয়াদ হচ্ছে ৩ মাস এবং ১৮ টি বুনিয়াদী কোর্সের মধ্যে প্রথম ৮টি কোর্সের মেয়াদ ছিল ৪ মাস ও বাকী ১০টি কোর্সের মেয়াদ হচ্ছে ২ মাস।

৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ৬১৭ টি বিভিন্ন কোর্সে ১৪,০২৯ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণ সাফল্য বেশ ভাল। কিন্তু ১৯৮৫ সালের হিসেব মতে বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারীর সংখ্যা ৬ লক্ষের উপর। সে হিসেবে এসব কেন্দ্রে মাত্র ২.৫% কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানেও এ ধরনের কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সরকার চাকুরী যতটুকু সম্ভব দিলেও প্রশিক্ষণের অভাবে আশানুরূপ কাজ এসব কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ বি, এ/এম, এ, পাশ করলে প্রবন্ধ লেখা—রচনা লেখা সহজ হয়, কিন্তু ছুটি বিধি, অফিস পরিচালনা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থ্যা না থাকলে সুষ্ঠুভাবে অফিস চালানো সম্ভব হয় না।

১৩. জনগণের কাছে সেবা/সুবিধাদি পৌঁছে দেওয়ার জন্য নতুন নিয়োগের মাধ্যমে সরকারের আয়তন/ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের অভাবে সরকারী সেবা/সুবিধাদি জনগণের কাছে পৌছানো সম্ভব হচ্ছে না। উপরুন্ত অজ্ঞানতার কারণে জনগণের হয়রানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অফিস পরিচালনা একটি টেকনিক্যাল ব্যাপার যার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সুবিধা এদেশে নেই। গত ৬ বছরে আমরা ২% এর বেশী কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হইনি। সরকারের ব্যর্থতা হিসেবে আমি এসব কথা বলছি না বরং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবকে একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে আপনাদের কাছে তুলে ধরার জন্যই কথাগুলো বলা হোল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়েই সাংবাদিক হওয়া যায় না। সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের কৌশল সমূহ আয়ত্ব করার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা সাংবাদিকগণ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন। একারণেই সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার দিকে আমি বারবার গুরুত্বারোপ করার চেষ্টা করেছি।

জনাব তোফাজ্জল হোসেন,
উপ–প্রধান তথ্য কর্মমর্তা, (তথ্য অধিদপ্তর)

আমি একটু সংযোজন করার প্রয়োজন অনুভব করছি। আপনার বক্তব্য থেকে পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে, বিরাট Back log –এর সৃষ্টি হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে তার সমাধানের কোন সুযোগও নেই। এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমরা বিলাসিতা ও নষ্টালজিয়ার কারণে কিছু কিছু বিষয় এড়িয়ে যাচ্ছি। বর্তমানে যারা যুগ্ম–সচিব, উপ–সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা রয়েছেন তারা সাবেক সি এস পি ও ইপিসিএস– এর সদস্য। তাঁরা

আজকের তুলনায় অনেক বেশী প্রশিক্ষণ নিয়েই চাকুরীতে যোগদান করেছেন। এখন যাঁরা মধ্য পর্যায় ও উচ্চতর পর্যায়ে পৌছেছেন তাঁদেরও যথেষ্টপ্রশিক্ষণ রয়েছে। কিন্তু শিক্ষানবীশ কর্মকর্তারা কোন হাতে খড়ি ছাড়াই সরকারী চাকুরীতে যোগদান করছেন। এ অবস্থায় আগামী ২০০০ সাল পর্যন্ত যুগ্ম–সচিব ও উপ–সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো বন্ধ রেখে নবীন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে প্রশাসনের আরো উন্নয়ন ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস। আপনি আপনার বক্তব্যে বলেছেন যে, আমাদের দেশে শিক্ষার প্রতি যতখানি জোর দেওয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণের প্রতি ততখানি জোর দেওয়া হচ্ছে না। এখানে একটা ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে। কারণ শিক্ষা ক্ষেত্রেও আমরা সবদিক সামলে উঠতে পারছি না। বাংলাদেশে স্কুল গমনোপযোগী শিশুদের শতকরা ৪৩ ভাগ স্কুলে যাচ্ছে না। শিক্ষায় আমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি। বরং আমার মনে হয় শিক্ষার চেয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ অনেক বেশী রয়েছে। তদুপরি যেখানে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিরাট একটা Back log রয়েছে সেখানে উচ্চ ও মধ্য পর্যায়ের কোর্সগুলো চালিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা কতটুকু? এ বিষয়ে একটু ব্যাখ্যা করলে আমি এবং আমার সাংবাদিকবন্ধুগণ উপকৃত হবো।

রেক্টরঃ আমরা গত ৬ বছরে যে ৫,৭৫১ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি তারমধ্যে যুগ্ম–সচিব ও উপ–সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তার সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ১৮৩ ও ২১২জন, মোট ৩৯৬ জন। সংখ্যাটা খুব বেশী নয়। এসব কর্মকর্তারা শুধু মন্ত্রণালয় কিংবা বিসিএস ক্যাডারভুক্ত নন। ডাইরেক্টরেট, কর্পোরেশনের ক্যাডারবর্হিভূত কর্মকর্তারাও রয়েছেন। উচ্চ–পর্যায়ের কর্মকর্তারা নীতি নির্ধারণের সংগে জড়িত থাকেন। দেশে যদি ডাক্তারের পাশাপাশি নার্সদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব যুগ্ম–সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের, সহকারী সচিবদের নয়। উচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। উচ্চ পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি হলে নিম্ন পর্যায়ে কাজ আদায় করে নেওয়া সম্ভব। একজন সহকারী সচিবের দক্ষতাহীণতার জন্য যে পরিমাণ ক্ষতি হবে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হবে নীতি নির্ধারণের সংগে জড়িত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতাহীণতার কারণে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে। শুধু বাংলাদেশ নয় প্রতিবেশী ভারতসহ আমেরিকা, বৃটেন ইত্যাদি উন্নত দেশে সিনিয়র কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষানবীশ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে আমি আপনার সংগে একমত। কিন্তু সিনিয়র স্টাফ কোর্স কিংবা এসিএডি কোর্স বাদ দেওয়ার ব্যাপারে আমি একমত নই।

২মে ১৯৯০ তারিখে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক–সুধী সমাবেশে উপস্থিত সাংবাদিক বৃন্দ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম/দুরালাপনী
১।	তপন খান	দৈনিক দিনকাল ৪০৬৫২১
২।	আবু তাহের	দৈনিক নয়া বাংলা, ঢাকা ব্যুরো, ৬৯ নয়াপল্টন ঢাকা। ফোনঃ– ৪১৫৪৯০ ৪১৫৩৫১
৩।	মোঃ মাহবুবুল বাসেত	সিনিয়র রিপোর্টার দৈনিক ইনকিলাব, ২/১ আর,কে, মিশন – রোড, ঢাকা।
৪।	প্রফুল্ল কুমার ভক্ত	সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সংবাদ ৩৬ পুরানা পল্টন, ঢাকা– ১০০০
৫।	শেখ এনামুল হক	সংবাদ দাতা, সাপ্তাহিক রেডিয়্যান্স, নয়া দিল্লী, প্রযত্নেঃ দৈনিক সংগ্রাম।
৬।	এম, ওয়াহিদ উল্লাহ	উপ–প্রধান, ঢাকা ব্যুরো, দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম।
৭।	এইচ, আর, সালাম	সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক জনতা।
৮।	মোখলেসুর রহমান চৌধুরী,	চীফ রিপোর্টার, দৈনিক পত্রিকা।
৯।	মহিউদ্দিন আহমদ	উপ– নিয়ন্ত্রক, বার্তা, রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা।

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম/দূরালাপনী
১০।	মশিউর নেরু	দৈনিক নব অভিযান, ১৯৫/ক, শান্তিনগর, ঢাকা।
১১।	মাসুদ হাসান খান	ইউ, এন, বি,।
১২।	আবদাল আহমদ	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক বাংলা।
১৩।	মোঃ শফিকুল করিম	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা।
১৪।	মোঃ আবদুল মজিদ (ওবি)	রেডিও বাংলাদেশ, আগার গাঁও, ঢাকা।
১৫।	কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ	তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর।
১৬।	মোঃ আশরাফ আলী খান	সিনিয়র উপ-প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর, ২৪২৮৮৬
১৭।	তোফাজ্জল হোসেন	PID
১৮।	লতিফ সিদ্দিকী,	সংবাদ

তোফাজ্জল হোসেন ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ কোথায় কিভাবে হয় এটা আপনিও ভালভাবে অবগত আছেন। বর্তমানে উপ-সচিব, যুগ্ম-সচিব ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের দক্ষতা আরো বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু উচ্চ-পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণকে কিভাবে বগলদাবা করে অবলীলা ক্রমে চলে যান তা আমাদের সবার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। সিনিয়র কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশনের দরকার আছে। আসলে ভুলটাতো তাঁরা ইচ্ছাকৃত ভাবে কিংবা অন্যের প্ররোচনায় করে থাকেন।

কাজেই শিক্ষানবীশ কর্মকর্তারা যাতে প্রাথমিক আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারে সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া এসব নবীন কর্মকর্তারা বুদ্ধি বৃত্তির দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত হওয়া সত্ত্বেও প্রশিক্ষণের অভাবে অফিসে তাদের ভূমিকা আশানুরূপ হয় না। সেক্ষেত্রে ১০ জন যুগ্ম–সচিবকে প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে ব্যবস্থাপনায় যে সমস্যা ও বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয় ১০০ জন নবীন কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে তা হয় না। কাজেই বিলাসিতা যতটা সম্ভব কমানো যায় ততই মংগল। ঢাল তলোয়ারহীন অবস্থায় নবীন কর্মকর্তাদের প্রশাসনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে না পাঠিয়ে কিছু প্রশিক্ষণ দিলে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব।

সফিউর রহমান ঃ এটাকে বিলাসী বললে ভুল হবে। এখানে ৩ মাস মেয়াদী সিনিয়র স্টাফ কোর্স ও এসিএডি কোর্স বছরে ২টির বেশী হয় না এবং উভয় ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তার সংখ্যা ৪০ জনের বেশী নয়। আমাদের কেন্দ্রে ইনসার্ভিস ট্রেনিং এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক অভিজ্ঞতার বিনিময় এখানে প্রশিক্ষক যাঁরা থাকেন তাঁরা শুধু অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।

জনৈক সাংবাদিক

প্রশ্ন ঃ–১ জনাব শামসুল আলম, আপনি বলেছেন যে-৮,৪৫৫ জন সরকারী কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয় নি। কিন্তু এই সংখ্যাটা কত বছরের তা উল্লেখ করেন নি। দ্বিতীয়তঃ আমরা মনে করি সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যে ৮,৪৫৫ জন কর্মকর্তার বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ হয় নি তাঁদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা কিংবা বিষয়টি সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন কিনা?

জনৈক সাংবাদিক

প্রশ্ন ঃ–২ আমি এটার সংগে আরেকটু যোগ করতে চাই। ভিন্ন প্রশাসনের লোকদের সচিব বানানো এবং সামরিক বাহিনী থেকে বেসামরিক প্রশাসনে যোগদান করার ফলে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হচ্ছে কি না এবং ভিন্ন প্রশাসন থেকে সচিব বানানোর ফলে উন্নয়ন কতটুকু হয়েছে?

রেক্টর ঃ প্রথমতঃ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ বিহীন ৮,৪৫৫ জন কর্মকর্তার যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা এবছরের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত এবং তাদের সবার বয়স ৪৫ এর নীচে।

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ না হলে চাকুরী নিশ্চিত হয় না, পদোন্নতি হচ্ছে পরবর্তী পর্যায়। ৪৫ বছরের নীচে যাদের বয়স তাঁদেরকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু যাদের বয়স ৪৫-এর উর্ধ্বে কিংবা যাঁরা ২য় শ্রেণী থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে ১ম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছেন তাঁদের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এপর্যন্ত ৮২টি স্বল্প মেয়াদী কোর্সের মাধ্যমে এসব কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ স্বাভাবিক নিয়মে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে অবশ্য জুনিয়র স্টাফ কর্মকর্তাদের কেউ কেউ পদোন্নতি পেয়ে যান। অন্য প্রশ্নের উত্তর এখানে এভাবে দেওয়া সম্ভব নয়।

জনৈক সাংবাদিক

প্রশ্নঃ-৩ সম্মানিত রেক্টর সাহেব, আপনি বুনিয়াদী পর্যায়ে সৃষ্টি Backlog দূর করার জন্য প্রশিক্ষণ ক্ষমতা দ্বিগুণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন যে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহল অবগত আছেন কিনা এবং এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

রেক্টর ঃ কেন্দ্রে বর্তমানে ১৬৮ জন কর্মকর্তাকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আবাসিক সুবিধা রয়েছে। ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এক্ষমতা আরো ২৩২ জন বাড়িয়ে ৪০০ জনে উন্নীত করার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে আগামী বছরের মধ্যে কাজ শুরু করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আমরা নতুন শ্রেণী কক্ষ ও ডরমিটরী তৈরীর প্রস্তাব রেখেছি এবং নীতিগতভাবে তা স্বীকৃত হয়েছে।

জনৈক সাংবাদিক

প্রশ্নঃ-৪ পরিবেশ উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী একটা সচেনততা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই কেন্দ্রের বিস্তৃত এলাকায় গাছ পালার সংখ্যা খুবই কম দেখা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনাদের কি ধরনের কর্মসূচী রয়েছে?

রেক্টর ঃ ১৯৮৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রে গাছের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৬,২৫৬ টি। ১৯৯০ সালের জানুয়ারী হতে এপ্রিল পর্যন্ত আরো ৪০১৭ টি গাছ লাগানো হয়েছে। এ থেকে পরিবেশ উন্নয়ন সম্পর্কে আমাদের সচেতনতার একটা চিত্র পাওয়া যাবে। তাছাড়া আমাদের মালীর সংখ্যা ১২ জন। কেন্দ্রে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণও যাতে গাছ লাগানোর কর্মসূচীতে অংশ নিতে পারেন সেজন্য ২০০ কোদাল কেনা হয়েছে। তদুপরি শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবছর থেকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে কায়িক শ্রম অন্তর্ভূক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

জনৈক সাংবাদিক

প্রশ্নঃ–৫ বিপিএটিসি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত আপনাদের ব্যয়ের হিসাবটা জানালে খুশী হব।

রেক্টর ঃ আমরা রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থ পেয়ে থাকি। রাজস্ব বাজেটে গত বছর প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। এ বছরের সংশোধিত বাজেটে ৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে যার সবটুকু হয়তো পাওয়া নাও যেতে পারে। উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়ের হিসাব দেওয়ার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের প্রকল্প প্রকৌশলী জনাব মোশারফ হোসেনকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোশারফ হোসেন ঃ প্রকলপ বাস্তবায়ন অফিস ১৯৮০–৮১ সাল থেকে কাজ শুরু করেছে এবং এ বছর জুন মাসে কাজ শেষ হয়ে যাবে। এ পর্যন্ত আমাদের সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৪,১১১.৪৭ লক্ষ টাকা। এবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ ছিল ২১৮ লক্ষ টাকা। সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে ৯৮ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। গত বছরে এর পরিমাণ ছিল প্রায় ৩ কোটি টাকা। প্রকল্প শেষ পর্যায়ে এসে যাওয়ায় খরচ কমে এসেছে।

জনৈক সাংবাদিক

প্রশ্ন ঃ–৬ আগামী কালের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আপনারা কি কি কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন?

রেক্টর ঃ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সাধারণতঃ গান, বাজনা, আনন্দ, ভোজ ইত্যাদির আয়োজন করা হয়ে থাকে। আমরা আগামী কাল একটি ব্যতিক্রম ধর্মী

আলোচনা সভার আয়োজন করেছি। এই আলোচনায় কেন্দ্রের প্রাক্তন রেক্টর, এমডিএস ও প্রকল্প পরিচালকগণকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাঁরা কেন্দ্র সম্পর্কে তাদের স্বপ্ন, আশা, আকাঙখা, প্রত্যাশা, ব্যর্থতা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদেরকে বলবেন এবং আগামী দিনে কেন্দ্র বিশেষতঃ প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে দিক নির্দেশনা দেবেন। আমরা সবাই থাকবো শ্রোতা।

জনৈক সাংবাদিক

প্রশ্নঃ-৭ আপনাদের প্রাক্তণ রেক্টরের সংখ্যা কজন?

রেক্টর ঃ ৫ জন।

জনৈক সাংবাদিক

প্রশ্নঃ-৮ কাজী জাফর সাহেব কি করবেন?

রেক্টরঃ তিনি আলোচনা অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করবেন। যাঁরা আসবেন তাঁদের মধ্যে সচিব পর্যায়ের ৫জন রেক্টর, এমডিএস ৩জন, প্রকল্প পরিচালক ৩/৪ জন। আলোচনানুষ্ঠান উচ্চ-পর্যায়ের হবে। আমরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি।

জনৈক সাংবাদিক

প্রশ্নঃ-৯ প্রশাসনে দুর্ণীতির কথা সর্বত্র শোনা যায় এবং এটি আমাদের জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নতির পথে বড় অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত। প্রশাসনের লোকদেরকে আপনারাই প্রশিক্ষণ দেন এবং প্রশাসনে দুর্ণীতি সম্পর্কে আপনারাও অবহিত আছেন। এই সমস্যাটি সমাধানের ব্যাপারে আপনারা কি ভাবছেন? এক্ষেত্রে আপনাদের নৈতিক প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা তা বলবেন।

রেক্টর ঃ হ্যাঁ আছে। বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশাসনে নৈতিকতা শীর্ষক একটি মডিউলে ১৩টি অধিবেশন রয়েছে। ভাল কর্মকর্তা হিসেবে যাঁদের সুনাম রয়েছে তাঁদেরকে এসব অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ প্রসংগে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। জনাব শাহজাহান নামে একজন ডি, আই, জি,

সাহেব এখানে একটি কোর্সে অংশ নিয়েছিলেন। এখান থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর তিনি তাঁরই পুলিশের গুলীতে আহত জনৈক ব্যক্তিকে হাসপাতালে গিয়ে রক্তদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, এখানে এ ধরনের আলোচনা না হলে তিনি হয়তো এ কাজটা করতেন না। কাজেই ওয়াজের মাধ্যমে যতটুকু করা যায় তার চেষ্টা আমরা করি। 'প্রশাসনে নৈতিকতা' শীর্ষক মডিউলে যেসব বিষয় রয়েছে তার মধ্যে প্রশাসনে শিষ্টাচার, সামজিক মুল্যাবোধ ও প্রশাসন, ধর্ম ও নৈতিকতার উৎস, সুশীল সেবকের ভূমিকার উপর ৫ টি বক্তৃতা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত। আমরা সিভিল সার্ভেন্ট এর বাংলা করেছি—সুশীল সেবক। আমলাদের সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা ভাল নয়। আমরা সার্ভেন্টের বাংলা করেছি 'সেবক'। 'সিভিল' এর বাংলা 'সুশীল' যার মানে ভদ্র। ভদ্র ব্যবহার করতে কোন অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। সেজন্য এ বিষয়টির উপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকি। তাছাড়া দূর্নীতি ও তার কারণ ও প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা রয়েছে। এসব অনুষ্ঠানে প্রশাসকগণ বক্তৃতা প্রদান করেন যাঁদের নৈতিকতার একটি সুন্দর ও সার্থক অতীত রয়েছে। এ প্রসংগে প্রাক্তন সংস্থাপন সচিব জনাব শামসুল হক চিশতী সাহেবের নাম উল্লেখ করা যায় । চিশতী সাহেবের উপজেলার এক অধিবাসী তাঁর বাসায় গিয়েছিলেন তদবীর করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু চিশতী সাহেবের মত একজন সচিবের পায়ে টায়ারের স্যাণ্ডেল দেখে তিনি তদবীরের বিষয়ে কোন কথা না বলে চলে এসেছিলেন। আমার পরিচিত উক্ত ভদ্র লোক চিশতী সাহেবের কাছে না গিয়ে আমার কাছে আসার কারণ জানতে চাইলে ভদ্রলোক এ কথা জানিয়েছিলেন। সরকারের মধ্যে এধরনের কিছু ভাল কর্মকর্তা আছেন যাঁদেরকে আমরা বক্তৃতার জন্য আহবান করে থাকি।

আপনাদের যদি আর কোন প্রশ্ন না থাকে তবে আমরা আমাদের আলোচনা এখানে শেষ করতে পারি। সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দকে কেন্দ্রে আসার জন্য আবারো ধন্যবাদও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং ভবিষ্যতে কেন্দ্রে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানের এখানেই সমাপ্তি টানছি। ধন্যবাদ।

(ক) প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠান সূচী

প্রথম অধিবেশন (সকাল ১০ঃ৩০ মিনিট)

তেলাওয়াতে কোরানে পাক ঃ মাওলানা আশরাফুজ্জামান।

১ মিনিট নীরবতা পালন ঃ কেন্দ্রের মরহুম কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

স্বাগত ভাষণ ঃ জনাব এ, জেড, এম, শামসুল আলম, রেক্টর, বিপিএটিসি।

উপহার বিতরণ ঃ (প্রাক্তন রেক্টর, প্রকল্প পরিচালক, এম, ডি, এস, বৃন্দ ও প্রধান অতিথিকে)।

প্রধান অতিথির ভাষণ ঃ জনাব কাজী জাফর আহমদ,প্রধান মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন ঃ ডঃ ইকরামুল আহসান, সদস্য পরিচালন পর্ষদ, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

স্থানঃ কেন্দ্র মিলানায়তন।

দ্বিতীয় অধিবেশন (দুপুর ১২ঃ০০ মিঃ—৫ঃ০০ মিঃ পর্যন্ত)

আলোচনা ঃ আগামী দশকে প্রশিক্ষণে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমিকা।

আলোচক ঃ জনাব এ, এক, এম,হেদায়েতুল হক
প্রাক্তন রেক্টর, বিপিএটিসি,

ডঃ শেখ মাকসুদ আলী,
প্রাক্তন রেক্টর, বিপিএটিসি,

জনাব এইচ, টি, ইমাম,
প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, বিপিএটিসি,

ফজলুল হাসান জনাব ইউসুফ,
প্রাক্তন সদস্য, পরিচালন পর্ষদ, বিপিএটিসি,

জনাব এ, এম, এম, বাহাদুর মুন্সী,
প্রাক্তন সদস্য পরিচালন পর্ষদ, বিপিএটিসি, এবং

ডঃ এ, টি, এম, শামসুল হুদা,
প্রাক্তন সদস্য, পরিচালন পর্ষদ, বিপিএটিসি।

সভাপতির ভাষণ ঃ জনাব কে, এম, গোলাম রব্বানী, সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রাণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন ঃ জনাব মুহাম্মাদ আবদুস সোবহান, সদস্য, পরিচালন পর্ষদ, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

(খ) কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তালিকাঃ

প্রধান অতিথিঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ,

– জনাব কে, এম, গোলাম রব্বানী, সংস্থাপন সচিব,

– জনাব মোঃ শাহাজান, সংসদ সদস্য, সাভার, ঢাকা,

– ডঃ শেখ মাকসুদ আলী, (প্রাক্তন রেক্টর, বিপিএটিসি) সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন,

– জনাব, এ, কে, এম, হেদায়েতুল হক, (প্রাক্তন রেক্টর, বিপিএটিসি) রাষ্ট্রদুত, জাপান,

– জনাব, এ, এম, আনিসুজ্জামান,(প্রাক্তন রেক্টর), বিপিএটিসি,

– জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান (প্রাক্তন রেক্টর), সচিব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়,

– কাজী ছালেহ আহমেদ, ভিসি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা,

– জনাব এইচ, টি, ইমাম, প্রথম প্রকল্প পরিচালক,

– বিগ্রডিয়ার মোশায়েদ চৌধুরী, দ্বিতীয় প্রকল্প পরিচালক,

– ডঃ ফজলুল হাসান ইউসুফ, প্রাক্তন এম, ডি, এস,

– ডঃ হারুনুর রশীদ, প্রাক্তন এম, ডি, এস,

– ডঃ এ, টি, এম, শামসুল হুদা প্রাক্তন এম, ডি, এস,

– জনাব এ, এম, এম, বাহাদুর মুন্সী, প্রাক্তন এম, ডি, এস,

বিপিএটিসির কর্মকর্তা এবং ও কর্মচারীবৃন্দ।

তথ্য সংগ্রাহক ঃ (ক) জনাব মোঃ সাইফুল্লাহ, (খ) বেগম আইশা আজিম, (গ) জনাব আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান, এবং (ঘ) জনাব রফিকুল হক

'অনুপম প্রতিষ্ঠান হোক বিপিএটিসি' শীর্ষক কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশমালা

এস, এম, আলী আক্কাস

"বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে কিভাবে একটি অনুপম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়"— শীর্ষক চারদিন ব্যাপী এক কর্মশালা সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ২৮–৩১ মে' ৯০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মান বিচারে বিপিএটিসির অবস্থান নিরূপন এবং 'অনুপম' স্তরে উত্তরণের জন্য যে সব সমস্যার সমাধান এবং নতুন পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে সেগুলি চিহ্নিত করণ।

কর্মশালার প্রথমদিনে দু'টি মুখবন্ধ প্রবন্ধ (Key-note paper) উপস্থাপন করেন কেন্দ্রের অন্যতম সদস্য পরিচালন পর্ষদ ডঃ এম, আনিসুজ্জামান ও সহকারী পরিচালক (অর্থনীতি) জনাব এস, এম, আলী আক্কাস। প্রথম প্রবন্ধে প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিপিএটিসির দায়িত্বের পরিসর বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধে একটি অনুপম প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত আলোচনায় বিবেচ্য বিষয় সমূহ উত্থাপন করে সেসবের আলোকে বিপিএটিসির অবস্থান নির্ণয় এবং তাকে একটি উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠার জন্য করনীয় সুপারিশ করা হয়।

কর্মশালার পরবর্তী দিনগুলোতে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠান, সাধারণ অধিবেশনে দলীয় সুপারিশ উপস্থাপন এবং পরিশেষে সেগুলি

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়। এসব বিষয় বিপিএটিসিকে অনুপম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। নিম্নে আলোচিত বিষয়গুলির শিরোণাম ও গৃহীত সুপারিশমালা পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত হলো ঃ-

ক. প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে যেসব বার্তা পৌঁছাতে হবে।

	বার্তাসমূহ		কার্যকরী করারউপায়
১।	প্রভু নয় সেবক মনোভাব	১।	দৃষ্টান্ত স্থাপন
২।	সময় সচেতনতা	২।	উদাহরণ সৃষ্টির মাধ্যমে অনুষদ সদস্যগণ এটা করবেন।
৩।	বিবেক বোধ	৩।	আনুষ্ঠানিক অধিবেশন সমূহের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধকরণ।
৪।	শৃংখলা ও আনুগত্যবোধ	৪।	অনুষদ সদস্যদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, ডান দিকে চলা, আস্তে কথা বলা, শ্রদ্ধা সম্মান, স্নেহ, শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ইত্যাদি গুণাবলীর নিজে অনুসরণ ও প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বলা।
৫।	মিতব্যয়িতা ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার	৫।	বিদ্যুৎ পানি ইত্যাদি সহ অন্যান্য সরকারী সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা। অনুষদ সদস্যগণ নিজেরা করবেন ও প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উপদেশ দিবেন।
৬।	জাতীয় সমস্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা	৬।	শ্রেণীকক্ষও অধিবেশনে আলোচনাও মিথস্ক্রিয়া গ্রুপে মত বিনিময়।

৭।	সংশ্লিষ্ট আইন কানুন সম্পর্কে জ্ঞান	৭।	সম্প্রসারণ বক্তৃতা।
৮।	সার্বিক কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু সমন্বয়	৮।	বিপিএটিসিতে সকল তৎপরতা সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের উদাহরণ সৃষ্টি এবং মিথস্ক্রিয়ার সময় এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।
৯।	পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধ	৯।	অনুষদ সদস্যগণ তাদের মধ্যে এটির প্রচলন করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদেরকে এব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।
১০।	শ্রমের মর্যাদা	১০।	স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুশীলন ও উদ্বুদ্ধকরণ।
১১।	স্বাস্থ্য সচেতনতা	১১।	শ্রেণীকক্ষে আলোচনা ও কেন্দ্র শরীরচর্চা কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

খ. পাঠ্যক্রম ব্যবস্থাপনা দুর্বলতা ও প্রতিকারের উপায়

দুর্বলতা সমূহ	প্রতিকারের উপায়
১। পাঠ্যক্রম ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতার অভাব	পাঠ্যক্রম ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ।
২। দৈনন্দিন অধিবেশন সূচী পরিবর্তন (মুলতঃ অতিথি বক্তার কারণে)	বিকল্প বক্তা/ জরুরীব্যবস্থা
৩। সেবা সুবিধাদির অপ্রতুলতা	প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ মুদ্রাক্ষরিক। কোর্সের জন্য গাড়ী নির্ধারণ করে দেয়া।
৪। আন্তঃ পাঠ্যক্রম ও আন্তঃবিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব	পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন সময় সূচী নির্ধারণের পূর্বে অন্যান্য কর্মসূচী বিবেচনা, সাপ্তাহিক সমন্বয় সভার আয়োজন।

৫।	কোর্স পরিচালক ও সমন্বয়ক নির্ধারণে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের অভাব	প্রশিক্ষণ সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত।
৬।	অনুষদ সদস্যদের সময় মত অধিবেশনে উপস্থিত না হওয়া এবং নির্ধারিত অধিবেশন পরিবর্তনের আপত্তি	প্রশিক্ষণ সমন্বয় সভায় সণাক্তকরণ।
৭।	প্রশিক্ষণ ফলাফল চাকরির জ্যেষ্ঠতা পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা না রাখা।	প্রশিক্ষণ ফলাফল চাকুরীতে জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতির সাথে সংশ্লিষ্টকরণ।
৮।	কোর্স সমন্বয়ের সামগ্রিক মূলায়ন না হওয়া এবং ফলাবর্ত না হওয়া।	সামগ্রিক মূল্যায়ন ও ফলাবর্ত।

গ. বিপিএটিসিতে উন্নয়ন প্রশাসনের তত্ব ও তার প্রয়োগের মধ্যকার অসঙ্গতি চিহ্নিতকরণ ও উত্তরণ ঃ–

	অসঙ্গতি সমূহ		উত্তরণের উপায়
১।	উন্নয়ন প্রশাসনের আধুনিক ধারণাসমূহের বিপিএটিসি প্রয়োগের বেলায় পরিবেশগত প্রতিকূলতা উত্তরণে প্রচেষ্টার অপ্রতুলতা।	–	বিপিএটিসিকে উন্নয়ন প্রশাসন চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে হবে। পরিবেশকে যথাযথভাবে বুঝে তাকে প্রভাবিত করে এগুতে হবে।
২।	উন্নয়ন প্রশাসন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বিপিএটিসিতে ঐকমত্য না থাকা।	–	সাধারণ ঐক্যমতের ভিত্তিতে বিপিএটিসির লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করতে হবে। তার ভিত্তিতেই পাঠ্যক্রম প্রণীত হবে।
৩।	উন্নয়ন প্রশাসন সংক্রান্ত ধারণা প্রশিক্ষনার্থীদের মধ্যে প্রদানের ক্ষেত্রে বিদেশী বই পুস্তকের আশ্রয় নেওয়া।	–	উন্নয়ন প্রশাসন সংক্রান্ত নতুন নতুন ধারণা পর্যায়ক্রমে বিপিএটিসি প্রশাসনে পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করা যেতে

	অথচ এসব বই পুস্তক উন্নয়ন প্রশাসনের বৈদেশিক প্রেক্ষাপটে লেখা। এ সংক্রান্ত নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও তার প্রয়োগজাত অভিজ্ঞতার অভাব।		পারে। বিপিএটিসির পার্শ্ববর্তী কিছু গ্রামে এরূপ ধারণার (বিশেষ করে বিকেন্দ্রীকরণ) পরীক্ষামূলক ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পাঠ্যসূচী উন্নয়নের জন্য ঘটনা সমীক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।
৪।	সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উন্নয়ন প্রশাসন সম্পর্কিত ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব।	–	সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের উন্নয়ন প্রশাসন সম্পর্কিত ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্তি।
৫।	উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণার সঙ্গে বিপিএটিসির ব্যবস্থাপনার অসঙ্গতি (যেমন–প্রশিক্ষণার্থীদের রিলিজ প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা)।	–	বিপিএটিসির সংগে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যকর সংযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রশাসন সম্পর্কিত ধ্যান–ধারণার আদান প্রদান।
		–	অনুষদ সদস্যদেরকে স্ব–স্ব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ।

ঘ. বিষয় ঃ অনুষদ উন্নয়নের সমস্যা ও সমাধান

	সমস্যা	সমাধানে গ্রহণযোগ্য কৌশল
১।	কনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের অধিবেশন গ্রহণের সুযোগ সীমিত।	'সহযোগী অনুষদ' হিসাবে বর্তমানে চালুকৃত পদ্ধতি সংশোধন করে প্রতিটি অধিবেশনে দুইজন অনুষদ সদস্য পূর্বেই নির্ধারণ করে কোর্সের ব্রোসিউরে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে। জ্যেষ্ঠ অনুষদ অধিবেশন আরম্ভ করে কনিষ্ঠ অনুষদকে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিবেন। যৌথভাবে অধিবেশন পরিচালতি হবে।

	সিনিয়র স্টাফ ও এসিএডি কোর্সেও সহযোগী অনুষদ হিসাবে কনিষ্ঠ সদস্যগণ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবেন। তবে পর্যালোচনা বা পারস্পরিক আলোচনামূলক অধিবেশনে কনিষ্ঠ সদস্য প্রেরণ করা যাবে না।
২। বিশেষায়িত বিষয় অনুসারে অধিবেশন বন্টিত হচ্ছে না।	কেন্দ্রের গবেষণা শাখা অনতিবিলম্বে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে কেন্দ্রর অনুষদ সদস্য বর্গের বিশেষায়িত বিষয় অনুসারে এবং একটি বিষয়ে যতজন বিশেষজ্ঞ পরাদর্শী অনুষদ রয়েছেন, তা সনাক্ত করে তালিকা প্রস্তুত করবে। সকল কোর্সের পরিচালক এ তালিকা অনুসারে অধিবেষন বন্টন করবেন।
৩। পাঠ্যসূচী নির্বাচনে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব	পাঠ্যসূচী সর্বদাই পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে নির্ধারণ করতে হবে। পাঠ্যসূচী /নির্ধারণ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন পাঠ্যক্রম সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
৪। ক্ষেত্র বিশেষ অধিবেশনের বিষয় বস্তুর সঙ্গে উপস্থাপিত বিষয় সামঞ্জস্য থাকেনা।	অতিথি বক্তাদের ক্ষেত্রে পূর্বেই বিষয় বস্তু সঠিক ভাবে জানিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে কিছুটা অসামঞ্জস্য গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে অনুষদ সদস্যদের ক্ষেত্রে এরূপ অসামঞ্জস্য কখনই গ্রহণ করা যাবে না।
৫। বিশেষায়নের চাহিদা নিরূপন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব	যে যে বিষয়ে বিশেষায়ন প্রয়োজন এবং অনুষদ সদস্যগণ যে যে বিষয়ে বিশেষায়নে ইচ্ছুক, তার একটি তালিকা গবেষণা শাখা

	প্রণয়ন করবে। বিষয় অনুসারে ৩জন করে সদস্যকে বিশেষজ্ঞে পরিণত করতে হবে। এবিষয়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
৬। ষ্টাফ উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ, জাতীয় এবং আন্তজার্তিক প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার অভাব	(ক) অনুষদ সদস্যবর্গের জন্য টিওটি ও গবেষণা পদ্ধতি ও কম্পিউটার ব্যবহার কোর্স এবং সকল ষ্টাফ এর জন্য অফিস ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার ব্যবহার কোর্স অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাধ্যতামুলক করতে হবে। (খ) দেশের অভ্যন্তরে এম, ফিল, ও পি, এইচ, ডি, কোর্সে অনুষদ প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ/সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অনুষদ সদস্যদের যোগদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৭। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সুবিধা বন্টনে যোগ্যতা, আগ্রহ ও বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সুবিধা বন্টনে অনুষদ সদস্যদের প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণগত যোগ্যতা, কেন্দ্রের ভাবমূর্ত্তি রক্ষা ও গড়ে তোলার উদ্যম ও আগ্রহ, প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রতি আনুগত্য, প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।
৮। গবেষণা, অধিবেশন পরিচালনা সেমিনার ও প্রকাশনার মধ্যে আন্তসংযোগের অভাব	কিভাবে বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় ও আন্তসংযোগ গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে এম, ডি, এস, (গবেঃ ও উপদেশনা) একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
৯। জার্নাল, সাময়িকী প্রভৃতির	এ বিষয়ে পারদর্শী জ্যেষ্ঠ অনুষদ সদস্যগণ

জন্য প্রবন্ধ প্রণয়নে জ্যেষ্ঠ অনুষদ সদস্যদের নির্দেশনার অভাব	প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করে প্রবন্ধ রচনার কলা কৌশল অনুশীলন করাবেন। বিভিন্ন প্রকার নির্দেশ-নির্দেশনা এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে প্রবন্ধকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
১০। পদোন্নতি জনিত ইনসেন্টিভের অভাব	প্রকাশনা, গবেষণা, অধিবেশন পরিচালনা ও এসি আর বিবেচনা করে ৪ বছর চাকরি পূর্তির পর উর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি বিষয়টি বিপিএটিসির সকল বিভাগে কার্যকরীকরণ।
১১। কর্মচারীদের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা গ্রহণের অভাব	এ বিষয়ে একটি চাহিদা নিরূপন সমীক্ষা পরিচালনা করে পরিকল্পনা গ্রহণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১২। প্রশিক্ষণ ভাতা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এম, ডি, এস, (এম এণ্ড পি এ) প্রস্তুত করতঃ বোর্ড অব গভর্ণরস ও মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১৩। নিয়োগকালে প্রাপ্ত ডিগ্রী, যোগ্যতা পরীক্ষার ফলাফল বাড়তি ইনক্রিমেন্ট প্রদানের অভাব	এ বিষয়ে বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা না চালিয়ে একটি ও ট্রেণিং ক্যাডার সৃষ্টি, ইনক্রিমেন্ট (বিশ্ববিদ্যালয়ের মত) ও গ্রেড প্রাপ্তির জন্য উপযোগী একটি কার্যপত্র এম, ডি, এস, (এম, এন্ড,পিএ) প্রণয়ন করতঃ বোর্ড অব গভর্ণরসে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১৪। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতি–	দেশীয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং

ষ্ঠানের সঙ্গে অনুষদ বিনিময় পদ্ধতির প্রচলন নেই।	আন্তজার্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের (যেমন INTAN, মালয়েশিয়া) সঙ্গে অনুষদ বিনিময় কার্যক্রম গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে কেন্দ্রের পিপিআর অনুবিভাগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১৫। কেন্দ্রের নিজস্ব অনুষদ সদস্য–দের মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা অর্জনে সুযোগের অভাব।	মাঠ পর্যায়ে (উপজেলা বা জেলায়) সংযুক্তি কাযক্রম চালু করার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
১৬। বক্তৃতা পদ্ধতি ও অডিও – ভিজুয়েল সরঞ্জাম ব্যবহারে পারদর্শিতা অর্জনে অনুশীলন কার্যক্রম চালু নেই	এ বিষয়ে প্রতি সপ্তাহে সেমিনার/বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বক্তার হ্যান্ড আউট বক্তৃতার কৌশল ও অডিও ভিজুয়্যাল সরঞ্জাম ব্যবহারে উৎকর্ষতা সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টি গবেষণা ও এভিআর শাখা যুগ্মভাবে পরিচালনা করবে।

ঙ. বিষয় ঃ বিপিএটিসি'র উন্নয়নে জরুরী প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ

সমস্যা	সমাধানের গ্রহণযোগ্য কৌশল
১। কেন্দ্রের গবেষণা নীতিমালায় Action research Evaluative research পরিচালনা নীতি বিদ্যমান নেই	কেন্দ্রের গবেষণা কমিটি কর্তৃক 'গবেষণা নীতিমালা' ও পর্যালোচনা পূর্বক আলোচ্য দুই প্রকার গবেষণা কার্যক্রম সংযোজন এবং তদানুসারে গবেষণা সংক্রান্ত পরিবর্তন আনতে হবে। গবেষণা কমিটির সদস্য সচিব এ বিষয়ে কার্যপত্র প্রণয়ন করবেন।
২। সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রে প্রচলিত পাঠ্যক্রম	পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিটি পাঠ্যক্রমের পাঠ্যসূচী সরকারের লক্ষ্য ও

সমূহের পাঠ্যসূচী বিশ্লেষণ ও নিরূপনের অভাব	উদ্দেশ্যের সংগে চাহিদা/সংগতিপূর্ণ কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা করতে হবে। পাঠ্য ক্রম গুলো চাহিদা ভিত্তিক করে গড়ে তুলতে রাজস্ব বাজেটের অর্থদ্বারা গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।
৩। প্রশিক্ষণ পরবর্তী ফলো-আপ ফিডব্যাক পদ্ধতির অভাব	রিফ্রেশার্স কোর্সের পরিবর্তে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের চাকরিস্থলে গমন, অবস্থান, তথ্য সংগ্রহ ও কাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতঃ 'Participatory Observation' পদ্ধতিতে গবেষণা পরিচালনা করে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের মান, উপযোগিতা ও কার্যকারিতা যাচাই করণ।
৪। কেন্দ্রে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের মানোন্নয়ন।	ইতিপূর্বে পরিচালিত গবেষণা প্রকল্পের প্রতিবেদন সমূহের মান যাচাই করতঃ ত্রুটি – বিচ্যুতি ও তার কারণ নির্ণয় পুর্বক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।
৫। বর্তমান গবেষণা প্রকল্পের মূল্যায়নে প্রচলিত পদ্ধতির উন্নয়ন	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগে পরামর্শ করতঃ মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করতে হবে। গবেষণা কমিটির সদস্য সচিব এ বিষয়ে কার্যক্রম প্রণয়ন করবেন।
৬। গবেষণা প্রকল্প বরাদ্দকরণে প্রচলিত পদ্ধতির পরিমার্জন	কেন্দ্রের গবেষণা কমিটি কর্তৃক প্রকল্প বরাদ্দ করণের পুর্বে প্রস্তাবনা সমূহের মান পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে। প্রয়োজনে সেমিনার আয়োজন করতঃ প্রস্তাবনা বাছাই করতে হবে।
৭। কনিষ্ঠ অনুষদবর্গের গবেষণা পরিচালনার সুযোগের অভাব	কেন্দ্রের রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে কনিষ্ঠ অনুষদবর্গের অধিকহারে গবেষণা

	কর্মের সুযোগ প্রদান করতে হবে। প্রতিটি প্রকল্পে (রাজস্ব বাজেটে) ১ জন জ্যেষ্ঠ ও ১ জন কনিষ্ঠ অনুষদ সদস্যকে নিয়োগের নীতি গ্রহণ করতে হবে।
৮। কেন্দ্রের প্রকাশনা কর্মের মানোন্নয়ন	পর্যায়ক্রমিক (Rotation saystem) পদ্ধতিতে বাংলা ও ইংরেজী জার্ণালের সম্পাদনা পরিষদ আগ্রহী সদস্যদের সমন্বয়ে গঠন করতে হবে। প্রকাশনার মানউন্নয়নে ত্রুটি সমূহ গবেষণার মাধ্যমে সনাক্ত করে তা পরিহারের উপায় খুঁজে বের করতে হবে।
৯। প্রকাশনার সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর	প্রকাশনা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
১০। প্রকাশনার মাধ্যমে কেন্দ্রের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলকরণ	কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রকাশনার মাধ্যমে কেন্দ্রের সুনাম ও ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে, তা সনাক্তকরণ এবং অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
১১। কেন্দ্রের এম, আই, এস, (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিষ্টেম) অত্যন্ত দুর্বল	কেন্দ্রের এম, আই, এস ,এর দায়িত্ব প্রধানতঃ পি, পি, আর, প্রশাসন, কম্পিউটার ও অর্থশাখা অনুবিভাগ পালন করে থাকে। এই ৪টি শাখা অনুবিভাগের এম, আই, এস, পর্যালোচনা করনে সমীক্ষা পরিচালনা করতে হবে।
১২। কেন্দ্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা–পনার মানোন্নয়ন	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি, সার্ভিস বুক, এসিআর প্রভৃতি সংরক্ষণ ও পরিচালনা বিষয়ে গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হতে পারে এবং ত্রুটি /বিচ্যুতি দূরীকরণ পূর্বক মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে।

LIBRARY
Bangladesh Public Administratio
Training Centre
Savar, Dhaka

১৩। কেন্দ্রের আর্থিক ব্যবস্থাপনার (ক্রয় টেণ্ডার,এনলিষ্টমেন্ট, ভাণ্ডার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি) মানোন্নয়ন	এ বিষয়ে গবেষণা কর্ম পরিচালনা পূর্বক মানোন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১৯৯০ –৯১ অর্থবছরে এক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে।
১৪। কোর্স ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন	প্রতিটি কোর্সের বাজেট, ব্যয়, পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে কোর্স চলাকালীন সময়ে ও সমাপ্তির পরে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচিত হলে মানোন্নয়ন ঘটবে। একাদশ বিশেষ বুনিয়াদী কোর্সের পর্যলোচনায় একটি কমিটি গঠিত হতে পারে।
১৫। গবেষণা কর্ম ও নিবন্ধ/প্রবন্ধ প্রণয়নের জন্য অনুষদবর্গের অবকাশ প্রদানের অভাব	যে সকল অনুষদবর্গ গবেষণা/ নিবন্ধ প্রণয়ন কর্মে রত থাকেন, তাঁদেরকে কোর্স, অবকাশ সেমিনার, কর্মশালা বা অনুরূপ কাজের ভার না দিয়ে কিছুটা অবকাশ প্রদান করতে হবে। প্রতিমাসে কেন্দ্রের গবেষণা শাখা এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অনুষদ সদস্যদের তালিকা প্রণয়ন করে পি,পি, আর, অনুবিভাগে প্রেরণ করবে।
১৬। বহিরাগত বিশেষজ্ঞদের সংগে গবেষণা কর্মে অনুষদ সদস্যদের মতামত বিনিময়ের সুযোগ এর অভাব	দেশের প্রখ্যাত গবেষক বৃন্দ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকর্তাদেরকে বিভিন্ন সেমিনার/সম্প্রসারণ বক্তৃতায় আমন্ত্রণ জানিয়ে কেন্দ্রের অনুষদ বর্গের গবেষণা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বি, আই, ডি, এস, এর ২ জন গবেষককে সম্প্রসারণ বক্তৃতায় আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
প্রকাশনা শাখা

বিক্রয়ের জন্য মওজুদ কেন্দ্রের
প্রকাশনাবলীর মূল্য তালিকা

প্রকাশনার নাম	প্রতি কপির মূল্য
১। প্রশাসন সমীক্ষা (ষান্মাসিক বাংলা জার্ণাল) ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা	টাঃ ২০/-
২। Bangladesh Journal of Public Administration Vol-1, No. 1 & 2 Vol-2, No. 1 & 2 Vol-3, No. 1 & 2	টাঃ ২০/-
৩। Post Entry Training in Bangladesh Civil Service	টাঃ ৪০/-
৪। Career Planning in Bangladesh	টাঃ ১২০/-
৫। Sustainability of Higher Agricultural Education in Bangladesh: A Case Study of Bangladesh Agricultural University	টাঃ ৪০/-
৬। Approaches to Rural Health Care : A Case Study of Gonoshasthaya Kendra	টাঃ ৪০/-
৭। Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of RD-1 Project in Bangladesh	টাঃ ৪০/-
৮। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা (ঘটনা সমীক্ষা প্রতিবেদন)	টাঃ ১২০/-
৯। Sustainability of Primary Education Projects: A Case Study of Universal Primary Education Project in Bangladesh	টাঃ ৪০/-
১০। Co-ordination in Public Administration in Bangladesh	টাঃ ১০০/-
১১। (ক) Decentralization & People's Participation in Bangladesh	টাঃ ১৫০/-
(খ) Decentralization & People's Participation in Bangladesh	টাঃ ১২৫/-
১২। প্রবীন প্রশাসকের অভিজ্ঞতা	টাঃ ৭০/-
১৩। Social And Administrative Research in Bangladesh	টাঃ ১৬/-
১৪। Problems of Municipal Administration	টাঃ ২৮/-
১৫। Bangladesh Public Administration and Senior Civil Servants	টাঃ ৫০/-
১৬। প্রশাসনের মুলনীতি	টাঃ ১৮ ⊢
১৭। অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশ্লেষণ	টাঃ ৬.৫
১৮। গণকল্যাণ রাষ্ট্র ও জনশাসন	টাঃ ৬.৫০
১৯। প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি	টাঃ ৬.৫০
২০। Famine Manual	টাঃ ৭/-
২১। The Deputy Commissioner in East Pakistan	টাঃ ১৬/-
২২। Social Change and Development Administration in South Asia	টাঃ ৪৫/-
২৩। Hospital Administration	টাঃ ১৮/-
২৪। District Administration in Bangladesh	টাঃ ২২/-

অধিক তথ্য এবং ক্রয়ের অর্ডার দেওয়ার জন্য প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা- এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মোঃ ইমামুল হক
প্রকাশনা কর্মকর্তা